সমুদ্র-হৃদয়

প্রতিভা বসু

নাভানা
৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলকাতা ১৩

প্রকাশক : শ্রী সৌরেন্দ্রনাথ বসু
নাভানা
৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলকাতা ১৩

প্রচ্ছদশিল্পী : শ্রী বিনয় সাহা

প্রথম প্রকাশ : ভাদ্র ১৩৬৬, আগস্ট ১৯৫৯

দাম : চার টাকা

মুদ্রক : শ্রী গোপালচন্দ্র রায়
নাভানা প্রিন্টিং ওআর্কস্ প্রাইভেট লিমিটেড
৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলকাতা ১৩

উৎসর্গ

শ্রী পরিতোষ সোম

প্রথম খণ্ড

এক ।

গ্রীষ্মের লম্বা দুপুরটি উদাস আলস্যে গড়িয়ে-গড়িয়ে এতোক্ষণে এসে মধ্যাহ্নে পৌঁছলো। সূর্যের প্রচণ্ড যৌবন দাবদাহে পরিপূর্ণ হ'য়ে বিকীর্ণ হ'লো পৃথিবীতে। অনেকখানি সময় যেন ঝলসে গেলো সেই অসহ্য উত্তপ্ত ক্ষুধিত যৌবনস্রোতে। তারপরেই ঝিমিয়ে এলো রোদ, শুধু যাবার আগের যাই-যাই বেলাটি গভীর মমতায় থমকে রইলো অনেকক্ষণ; হীরের দ্যুতির মতো প্রখর শাদা রং সূর্যাস্তের আবিরে রঙিন হ'য়ে উঠলো।

সিংহমুখ ফটক থেকে আসান মঞ্জিল পর্যন্ত সিকি মাইল জুড়ে সোজা টানা বাঁধানো রাস্তাটির দু-পাশের কৃষ্ণচূড়ার মাথায় হঠাৎ যেন আগুন জ্ব'লে উঠলো দপ ক'রে। মঞ্জিলের মিনে-করা গোল গম্বুজের লাল নীল হলদে সবুজ কাচে সেই আগুন প্রতিভাত হ'য়ে চোখে ধাঁধা লাগালো। গুলবাগিচার কৃত্রিম পাহাড় আর ঝরনার জলে স্নানরত অপূর্ব সুন্দরী নগ্ন রমণীর মারবেল মূর্তিটি সূর্যাস্তের লালে লাল হ'য়ে মনে হ'লো লজ্জা পেয়েছে।

বাঁধানো রাস্তা থেকে প্রশস্ত সবুজ লনের বুক চিরে রক্তের মতো টুকটুকে সুরকি-ঢালা যে অন্য রাস্তাটি ডান দিকে এলিয়ে, বাঁ দিকে বেঁকে সাপের গতিতে এসে নতুন হল-ঘর সবুজ-মহলে ঠেকেছে সেখানকার সোনালি-লতা-কাটা পেতলের কাজ-করা বর্মা টিকের বিশাল দরজাটি এবার খুলে গেলো আস্তে-আস্তে। জানালা থেকে চন্দনগন্ধী খসখসগুলো উঠে গেলো উপরে, বন্ধ খড়খড়ি দু-পাশে স'রে গিয়ে দেখা গেলো পদ্ম-কাটা নকশি গ্রিলের বাহার; তার ফাঁক দিয়ে হলের ভেতরকার দুধের মতো শাদা মারবেল মেঝেতে আর রঙিন কার্পেটে একটি চিকরি-কাটা

আলোর বুনোট নকশা এঁকেছে। পড়ন্ত রোদ্দুরের মিঠে ঝলক। পলকের জন্য চোখ তুলে সেই আলপনার দিকে তাকালো সুলেখা।

আশ্চর্য! বেলা তা হ'লে গেলো? সুদীর্ঘ আয়ুর কৃপণ কবল থেকে আর একটি দিন তবে খসলো? আশ্চর্য! আশ্চর্য! এর চেয়ে আশ্চর্য আর কী আছে সুলেখার জীবনে যে দিনগুলো তবু অবসান হয়। ফিরে-ফিরে রাত আসে, ঘন অন্ধকার-কালো রাত। আর সেই কালো রাত ফিকে হ'য়ে ঘনিয়ে আসে আবার সূর্যের আলো। আবার দিন। আবার রাত। একটু হাসলো সে। ঠোঁটের কোণে অনেকক্ষণ ধ'রে লেগে রইলো সেই হাসি।

এইমাত্র স্নান ক'রে এসেছে। কালো কুচকুচে পাথরের দেড়শো পিলারের উপর বসানো দেড়তলা সমান উঁচু হালকা চেহারার এই সবুজ মহলের বাথরুমটি অতিশয় শৌখিন। তিন সিঁড়ি নেমে বিশাল চৌবাচ্চা, প্রায় একটি ছোটোখাটো পুকুরের মতোই গভীর। তীরে-তীরে চওড়া চত্বর। উপরে কাচের ঘর দিয়ে রোদ্দুরের ঝিলিক লেগে চকচক করে। মাটির নিচ দিয়ে সুকৌশলে জলনিকাশের নালী আছে; দু-বেলাই ছেড়ে দেয়া হয় সে-জল, স্নানের আগে আবার ভ'রে ওঠে। গোলাপ-গন্ধ সন্টের সেই টলটলে জলে অবগাহনে এখন শরীর শীতল। ঘরের মধ্যে ভাসমান তার মৃদু সৌরভ বাতাসে মদির।

মস্ত হলের ঠিক মাঝখানটিতে ঘাস-রং নরম পুরু পারস্য গালিচার উপর লাল টুকটুকে মখমল-মোড়া গোল আর নিচু একটি আসনে ব'সে আছে সে; মুখ নিচু ক'রে। পাশে জালি-কাটা সোনার ঝালিতে চুল বাঁধার সরঞ্জাম। রুপোর ঝুমকো-ঝোলানো সিল্কের ফিতে, ঢাকাই কাজ-করা ঘুণ্টি-দেয়া সোনার কাঁটা, সোনার চিরুনি, কদম ফুল আর বকুল ফুলের নকশায় রুপোর ছিটকাঁটা, বেণী জড়াবার সোনালি পাত। জয়পুরী

মিনে-করা ছোট্টো বাটিতে সুগন্ধ তেল আছে পাশে। সুলেখার ঘন চুলে এ-বাড়ির খাশ বাঁদি জবেদান্নেসা আস্তে-আস্তে নরম হাতে আঙুল ঘ'ষে বুলিয়ে দিচ্ছে সেই তেল। সোনা-বাঁধানো চিরুনির মসৃণ হাড়ের নরম দাঁত দিয়ে ধীরে-ধীরে আঁচড়ে দিচ্ছে সেই ঘনকৃষ্ণ চুলের পুঞ্জ-পুঞ্জ মেঘ। শেষে বত্রিশ গুছির বেণী পাকিয়ে তার তলায় ঝুলিয়ে দিলো রুপোর ঘুন্টি। কালো বেণীর ফাঁকে-ফাঁকে বকুল ফুল আর কদম ফুলের নকশার ছিটকাঁটাগুলো গেঁথে দিলো কৌশলে। আজ খোঁপা না, আজ অমনি চওড়া চ্যাটালো বেণী লুটিয়ে থাকুক পিঠের উপর। আজ আগুন রঙের শাড়ি পরানো হবে সুলেখাকে। তার উপরে এই কালো আকাশের মতো বেণী অসংখ্য তারকা নিয়ে জ্বলতে থাকবে চোখ ধাঁধিয়ে।

চুল বাঁধায় নাম আছে জবেদান্নেসার। এ-কাজে সে বহুকাল ধ'রে হাত পাকিয়েছে। চুল বাঁধার জন্য তার ডাক পড়েছে ঘরে-ঘরে। অল্প-বয়সী বউ-ঝিরা কে কার আগে মাথা দেবে হুড়োহুড়ি প'ড়ে গেছে তাই নিয়ে। সে-সব কথা মনে প'ড়ে গেলো আজ। সুলেখার মাথার সামনেটা ঠিক ক'রে দিতে-দিতে তার ভাবলেশহীন নিস্পন্দ মুখের দিকে তাকিয়ে সহসা জবেদার চোখে যেন অতীত ঘনিয়ে এলো। নরম গলায় বললো, 'আমার চুল বাঁধা তোমার পছন্দ হয় না ?'

সুলেখার স্থির চোখের পল্লবে ছোট্টো একটি কম্পন উঠলো শুধু, জবাব দিলো না।

'আমিও তোমার মতো বয়সেই এ-বাড়িতে এসেছিলাম। আমি তোমার মনের কথা বুঝি।'

সুলেখা ঢোঁক গিললো।

'ভারি সুন্দর চুল তোমার। পুরুষরা মেয়েদের চুল ভালোবাসে।'

অপরপক্ষ যতোই নীরব থাকুক না কেন, কথা না-ব'লে পারে না জবেদা, 'তোমার এই চুলের অরণ্যেই পথ হারিয়েছে সে।'

সুলেখা দাঁত দিয়ে ঠোঁটের একটা কোণ কামড়ে ধরলো জোরে, নরম ঠোঁটে ছোট্টো একটু মাংসখণ্ড উঁচু হ'য়ে উঠলো তৎক্ষণাৎ।

এর পরে ডাবের জলে মুখ ধুইয়ে, চন্দন মাখিয়ে, সেই চন্দন সিল্কের টুকরোয় আবার মুছে দিয়ে, স্নেহপদার্থ বুলিয়ে দামি পাউডারের প্রলেপে উজ্জ্বল করা হ'লো দেহের রং। সাহেরবানু রুপোর থালায় বসন-ভূষণ সাজিয়ে নিয়ে এলো কাছে। হাতে লাল পাথরের চুড়ি, কানে চুনি-পান্নার ঝুমকো, গলায় তিনলহরী প্রবালের মালা পরিয়ে এদিক-ওদিক ঘুরে তাকিয়ে দেখলো জবেদান্নেসা, তারপর সেই গয়নার সঙ্গে মিলিয়ে শাড়ি-ব্লাউজ বাছা হ'লো।

সুলতানের আসবার সময় হয়েছে। আর দেরি না। অন্ধকার নামবার আগেই তেত্রিশটা ঝাড়-বাতির ফোকরে-ফোকরে অগুনতি মোম জ্বালিয়ে দেয়া হবে মাথার উপর। কাটগ্লাশের তীক্ষ্ণ কোনাচে কোণগুলোতে তীব্র জ্যোতি প্রতিভাত হ'য়ে ঝলসে দেবে ঘর। বেশিক্ষণ নয়, মাত্র দু-ঘণ্টা জ্বলবে এই চর্বির বাতি, তারপরেই নিবিয়ে দিয়ে ইলেকট্রিক স্যুইচ টেপা হবে ঘরে।

এই দু-ঘণ্টা সুলতানের। সারা দিনে রাত্রে মাত্র এ দু-ঘণ্টাই তিনি কাটান এখানে, এ-ঘরে। মোমের আলো তাঁর পরম প্রিয়, সুলেখাকে তিনি সেই আলোতেই দেখেন, দেখতে ভালোবাসেন। আজ তিন মাস ধ'রে তাই দেখছেন।

ঘরের ঐ-প্রান্তে দক্ষিণ কোণ ঘেঁষে মস্ত হাস্নুহানার ঝাড়ে আবডাল-করা জানালার কাছে মকরমুখ রুপোর পায়ার প্রায় এক-বুক-উঁচু

মেহেগনি খাট। খাটের চারধারে এক বিঘৎ উঁচু কাশ্মীরী কাজ-করা আখরোট কাঠের কার্নিশ, মাথার কাছে চুড়োর মতো জাফরি-কাটা জালি। লম্বা বাজুগুলোতে রক্তবর্ণ লাক্ষার প্রলেপ, তার ভেতরে সোনার জলের সরু রেখায় আঙুরলতা আঁকা। সিল্ক সাটিনের ধবধবে মসৃণ বালিশে চাদরে গদিতে একরাশি ফুলের মতো নিভাঁজ বিছানা। খাটের এদিকে পুব প্রান্ত ঘেঁষে, যে-দিকটায় দরজা দিয়ে ঢোকে, সেখানকার জানালার তলায় মোটা নরম গালিচার উপর কোনাচে ক'রে ছোটোখাটো বসবার আয়োজন, বিলিতি প্রথায়। একটি ডবল স্প্রিং-এর তিন খণ্ড নিচু-নিচু মখমল-মোড়া সেট। খাটের পায়ের দিকে রঙিন কাঠের কাজ-করা পাঁচ ধাপ সিঁড়ি। খাটে ওঠার সোপান। কাঁচা-আম রঙের চার দেয়ালে, বড়ো-বড়ো খড়খড়ির ফাঁকে-ফাঁকে চারটি ফ্রেসকো ছবি। মোগল দরবারের দৃশ্য। কোণে-কোণে উঁচু তিনপায়া চৌকো পাথরের টেবিলের উপর বেঁটে পাম গাছ। পশ্চিম প্রান্তে ড্রেসিং-টেবিলের আট ফুট লম্বা বেলজিয়ান আয়না কোনাচে ক'রে বসানো, পাশে ঠিক সেই আকৃতিরই দু-পাটে দুখানা আয়নাযুক্ত কাপড়ের আলমারি। আয়নাগুলো এমন-ভাবে স্থাপিত, যাতে একজন মানুষ তার সমস্ত অবয়ব সামনে-পিছনে দু-দিকেই পরিপূর্ণভাবে দেখতে পারে। বাঁ হাতে মস্ত জানালা ঘেঁষে মারবেল পাথরের ছোট্টো লেখার টেবিল, গদি-আঁটা চেয়ার, তলায় কার্পেটহীন ঠাণ্ডা মেঝে।

এইমাত্র একগুচ্ছ টাটকা গোলাপ রেখে গেছে পিতলের টবে, মিষ্টি গন্ধ। ঝাড়গুলো জ্বেলে দেবার আগে প্রসাধন শেষ হ'লে, স্থলেখা এখানে এসে দাঁড়ালো পিছন ফিরে। যতোদূর চোখ যায় ধুধু মাঠ, নবাববাড়ির কার্পেটের মতো সবুজ ছাঁটা ঘাস। মাঝে-মাঝে শৌখিন ফুলের কেয়ারি। লাল নীল সবুজ হলদে। যতো রং পৃথিবীতে সম্ভব সব রঙের ফুল ওরা

ফুটিয়েছে যত্ন ক'রে। হোস্‌পাইপে জল ঢেলে এইমাত্র শীতল করা হয়েছে মাঠের তপ্ত বুক। সোঁদা গন্ধ উঠে আসছে মাটি থেকে। সূর্য হেলে গেছে পশ্চিমে, ডোববার আগে জানালা গলিয়ে খানিকটা কাঁচা লাল রক্ত ছড়িয়ে দিয়ে গেলো স্বলেখার টেবিলে, চেয়ারে, শাদা মারবেল মেঝেতে। তাকিয়ে দেখতে-দেখতে চোখ দুটো বড়ো হ'য়ে উঠলো স্বলেখার।

ইশ! কী লাল! আগুন? না রক্ত? কী? যেন ভয় পেয়ে শিহরিত আবেগে দু-হাতের পাতায় মুখ ঢাকলো। সিঁদুর-রং শাড়ির উপর বেণী— সোনার চুমকি নিয়ে ঝকঝক ক'রে উঠলো। ঝকঝক ক'রে উঠলো কানের সাচ্চা চুনি-পান্না, সারা শরীরে কম্পিত স্বলেখা দেয়ালের ঠেসানে ন্যস্ত করলো নিজেকে, তারপর হাঁপাতে লাগলো রৌদ্রদগ্ধ কুকুরের মতো।

জবেদান্নেসা ছুটে এসে ধ'রে ফেললো তাকে, ঈষৎ ভর্ৎসনা মেশানো গলায় বললো, 'হয়েছে কী বলো তো? আজ সকাল থেকেই অমন করছো কেন? হাত নামাও মুখ থেকে, এসো, ঠাণ্ডা হ'য়ে বসবে এসো।'

ঘরের মাঝামাঝি হেঁটে এলো স্বলেখাকে নিয়ে। একটু চুপ ক'রে থেকে বললো, 'এবার আমি যাই, কেমন?'

রুদ্ধস্বরে স্বলেখা বললো, 'যাও।'

'তুমি শান্ত মনে খাটে এসে বোসো।'

'বসবো।'

'তোমার কি শরীর খারাপ হয়েছে?'

'না।'

'তবে কী হয়েছে?'

'কিছু না।'

'মুখ গোমড়া ক'রে আছো কেন?'

'কই— না—'

'একটু হাসতে পারো না?'

সুলেখার হাসিই পেলো।

যেতে গিয়েও ফিরে দাঁড়িয়ে জবেদা বললো, 'তোমার বরাত ভালো।'

সুলেখার চোখের কোলে টোল খেলো, মাথা নেড়ে বললো, 'তাই তো।'

'ছাখো বাছা, যতোই কাঁদো আর যতোই গর্জাও, মনে-মনে জেনো, এ শুধু সুলতানের নেক-নজর নয়, এর নাম প্রণয়। প্রেম। তোমার উপর তাঁর লোভের চেয়ে প্রেম বেশি, প্রেমে আসক্ত তিনি।'

'হুঁ।'

'এই প্রেমই জীবন। প্রেমই প্রাণ। প্রেমই একমাত্র সত্য।'

'হুঁ।'

'প্রেম মানুষকে ধুয়ে-মুছে পবিত্র ক'রে দেয়। যার হৃদয়ে সেই প্রেম জাগে সে-ও ধন্য, যার জন্য জাগে সে-ও ধন্য। চায় সবাই, পায় ক'জন?'

'হুঁ।'

'তুমি পেয়েছো। নাও। মন-খারাপ ক'রে থেকো না।'

'না।'

'বনের বাঘে খায় না, মনের বাঘেই খায়। সেই মনকে তুমি পোষ মানাতে চেষ্টা করো, সেই মনকে তুমি বলো— আর কেন দাপাদাপি, ঝড়-ঝাপটা যা হবার তা তো হয়েছে, এখন ভেবে নাও না এ-ঘরই তোমার, এ-ঘরই তুমি আপন ক'রে নাও। অসম্মান তো নেই।'

'তাই ভাবছি।' এখানে সত্যি হাসি ফুটলো সুলেখার মুখে। সে-হাসি যেমন কঠিন, তেমনি কুটিল।

'শোনো লেড়কি,' তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখে চোখ তেরচা করলো জবেদান্নেসা, 'বেইমানি কোরো না। বেইমানি ক'রে লাভ হবে না। নিজেই জ্বলবে। ভালো ক'রে ভেবে দেখো, সুলতান ইচ্ছে করলে তোমাকে আজ কী না করতে পারেন। সবই তাঁর মর্জি।'

সুলেখা অন্যদিকে তাকিয়ে রইলো।

'আর তা ছাড়া তিনি যদি তোমাকে সেদিন না নিয়ে আসতেন এখানে, তা হ'লে কী হ'তো?'

'কী হ'তো?' বড়ো-বড়ো সুর্মা-আঁকা কাজল-কালো দুটি চোখ সুলেখা জিজ্ঞাসায় স্থির করলো বাঁদির মুখের উপর।

না, খুব সুন্দরী নয় সে। ওই চোখ দুটোই শুধু দেখবার। তা নইলে সাধারণ।

রং শ্যামল, মুখশ্রীও তেমন-কিছু উল্লেখযোগ্য নয়। ছিপছিপে। আঁটোসাঁটো। স্বাস্থ্যের জলুস আছে। আর আছে সতেজ আর সহজ একটি ভঙ্গি। তার চেয়ে এই বাঁদি গতযৌবনা হ'য়েও অনেক বেশি সুন্দরী। রূপসী। তিলফুল-নাসা, কঠিন চিবুক, মৎস্যাকৃতি চোখ, লম্বা দোহারা গড়ন, টকটকে গায়ের রং। আঁটো রঙিন দেহাতি ব্লাউজে, পেঁচিয়ে শক্ত ক'রে পরা রঙিন শাড়িতে, এক হাত কাচের চুড়িতে, মেহেদি-রাঙা নখে প্রায় যুবতী দেখায়। মুক্তোর মতো সুন্দর সুসংবদ্ধ শাদা দাঁত দেখিয়ে যখন হাসে, তাকিয়ে অবাক হ'য়ে যায় সুলেখা। শোনা যায় সুলতানের বাবার কীর্তি ইনি। অল্পবয়সেই পত্নী-বিয়োগ হয়েছিলো, তারপর আর বিবাহ করেননি। এর জন্যই হয়তো দরকার হয়নি। একবার শিকারে গিয়ে শ্রান্ত হ'য়ে কোনো গরিব প্রজার বাড়িতে পায়ের ধুলো দিতে বাধ্য হয়েছিলেন, সেবা-যত্ন-জল-ফল সব-কিছুকেই ভালো লাগার সঙ্গে এটিকেও মনে ধ'রে গিয়েছিলো।

গল্পটা সাহেরবানুর। সবুজ-মহলের কনিষ্ঠতম বাঁদি। জবেদার সহকারী। চতুর চোখে এদিক-ওদিক তাকিয়ে ঘর পরিষ্কার করতে-করতে খসখসে গলায় বলেছিলো সে। চোখে-মুখে আক্রোশের তরঙ্গ তুলে বলেছিলো, 'ও কি সোজা মানুষ ভাবছো তুমি? ওর কেবল মুখ মিষ্টি, মিছরির পানা। দিলটা গরলে ভরা। কর্তাসাহেব একটু পেয়ার করতেন বইলা দিন-দুনিয়া চোখে দেখতো না। অতো ফষ্টিনষ্টি করলে সব পুরুষেরই মন টলে। আরে বাপু, তোর কথা আর কে না জানে? মতি মিঞার মাইয়া তুই, বাপের আছিলোটা কী? ছনের ছাউনির তলায় ঘাড় গুঁইজা থাকতি আর হেউলি পাতার মান্দুর বানাইয়া হাটে-হাটে বিক্রি করতি। বাপ অইলো কিষাণ, অথচ না ছিলো জমি, না ছিলো হাল। না কি হাল-চাষের হিম্মৎই আছিলো মতি মিঞার? বুকের মধ্যে তো কয়েকটা পাঁজরা আর হাড্ডির উপর একটা চামড়া। বারোটা মাস খালি খকর-খকর, আর হাঁপির টান। জানি না? সব জানি। মাইয়া তো এক গাওয়েরই? হ, সে-কথা যদি কও তো আমার বাপরে দ্যাখো। বয়স অইলে হইবে কী, সাত ব্যাটার শক্তি একটা শরীলে। তারপর তোমার গিয়া হাঁস বলো, মোরগ বলো, গাই-গোরু জমা-জমি— কী না করছিলো। আর আমার বিয়াও দিছিলো ভালো ঘরে—'

খুট ক'রে আওয়াজ হয় কোথায়, চমকে থেমে যায় সাহেরবানু। তার সতর্ক দৃষ্টি ঘরের আনাচে-কানাচে ফিরতে থাকে, হাতের কাজ দ্রুত হ'য়ে ওঠে। মাথা নেড়ে কপাল চাপড়ে বলে, 'নসিব, নসিব। সকলই নসিবের খেলা দিদি, আর খোদাতাল্লার চাতুরি। নইলে এই দেহেও কম রূপ আছিলো না। সেই নচ্ছারটা তো তাতেই মজলো। ঐ তোমার গিয়া গোলাবাড়ির নায়েবটার কথা কইতাছি।'

কোথায় গোলাবাড়ি আর কোথায় তার নায়েব জানবার কথা নয়

সুলেখার, তবু সে শোনে, শুনতেই হয়। বলছে বলুক, বারণ করবার ইচ্ছেটুকুও কাজ করে না মনের মধ্যে। চুপচাপ শ্রোতা পেয়ে সাহস বেড়ে যায় সাহেরবানুর। কাজকর্ম ফেলে মুখের কাছে এগিয়ে আসে সে, দুই চোখে রাগ ফুটিয়ে বলে, 'তখন কতো ভালো-ভালো কথা, কতো রঙ্গ, কতো রস। রসিদ কামে বাইর অইলো কি বজ্জাতটা আইয়া উপস্থিত। কয় কিনা, তোমার মতন মাইয়া কি রসিদের যোগ্য? ও অইলো একটা চাষা। আমার লগে চলো, এক্কেবারে পাটের বিবি কইরা থুমু, পাওখানা মাটিতে লামাইলে বুক পাইতা দিমু। পোলাপান আছিলাম, ভুললাম। আর ভুলাইয়া-ভালাইয়া শেষে কী দশাই করলো হারহাবাতের পুত। রসিদ ওদিকে তালাক দিতে চায় না, কতো কাণ্ড কইরা তালাকনামা আদায় কইরা আইসা দেখি, ও মা! কোথায় ওড়না গায়ে সুর্মা চোখে বেহেস্তের হুরী হইয়া দিন কাটামু, তা তো নয়ই— দুই মাস যাইতে না যাইতেই কয় কিনা অতো শুইয়া-বইসা সাইজা-গুইজা দিন কাটাইলেই চলবো না। খেতখামার আছে, উঠানে ধান-পান আইছে, এইসব দেখতে অইবো, শুনতে অইবো, কুটতে অইবো, ভানতে অইবো— শুনছো কথা? তার উপরে জনমজুর খাটছে কতো, তাদের ভাত সিদ্ধ করতে অইবো না? ধুত্তোরি তোর ধান-ভানা, ঢেঁকি-কোটা আর পাতিল-পাতিল পান্থা আর গরম। অতো খানা-খিদমৎ আমার দ্বারা অইবো না। এক কথায় দুই কথায় শেষে ঝগড়া, তারপর মারামারি। আর তারপর তো দেখছোই। এই পুরীতে আইয়া পৌঁছাইছি। না, বেইমানি করুম না, আছি ভালোই।' সুলেখার নীরব মুখের দিকে তাকিয়ে চোখ মটকায় সাহেরবানু, 'বুড়ো নাসের আলির বিবি যেইবার তিনদিনের ওলাওঠায় কবর লইলো, আমিও আইসা বহাল অইলাম। এই বাড়ির খাইয়া-পইরাই তো নাসেরআলি মানুষ অইছে, দুই-চার

ফোঁটা রক্তও গায়ে আছে এইখানকার, মিথ্যা কমু না, মানুষটা ভালোই আছিলো। বুড়া অইলেও অশক্ত আছিলো না। রাখছিলো সুখেই। ঐ যে দূরে হাইলাকান্দির গম্বুজ দেখা যায়, ঐখানে আছিলাম, মাইজা-বিবির দাসী আছিলাম আগে, জবেদার তখন দিনের মতো দিল। কী দেমাক! এদিকে তাকাইলে ফাইটা যায়, ওদিকে তাকাইলে ফাইটা যায়। আরে বাপু, এটা কেন বোঝছো না যে, দাসী দাসীই। আমিও দাসী তুইও দাসী। তুই না-হয় সুলতানের বাপের দাসী, আর আমি না-হয়—।'

দাসী ঠিকই। জবেদা এখানকার খাশ দাসী। কিন্তু প্রতাপে তার রানীর দখল। সাহেরবানু যা-ই বলুক, জবেদার সঙ্গে তার কোনো দিক থেকেই কোনো তুলনা হয় না। না চরিত্রে, না চেহারায়। সুলতানের বাবা একে বিবাহের মর্যাদা দেননি বটে, কিন্তু নিজের মাতৃহীন সন্তানকে সঁ'পে দিয়ে মাতৃত্বের মর্যাদা দিয়েছিলেন। ছ' বছর বয়স থেকে এই সুলতানকে জবেদা নিজের বুকের ক্ষুধিত মাতৃত্বের সমস্ত স্নেহ দিয়ে মানুষ করেছে। সুলতানের বিপত্নীক পিতার প্রতিও একদিনের তরে এতোটুকু অবিশ্বস্ত হয়নি সে। গরিবের ঘর থেকে এলেও মনের কোনোখানে দারিদ্র্য ছিলো না, সুলতানের পিতার প্রণয়ের অযোগ্য ছিলো না। আখতার-সাহেব সম্মান করতেন তাকে, সুখে রাখতেন। সেই সুখভোগের জন্য সে-ও কৃতজ্ঞ ছিলো। ছেলে মানুষ করার দাসী হিসেবেই এসেছিলো, আখতার আমেদ জবেদার দরিদ্র পিতাকে তার মেয়ের বিনিময়ে পাকা কোঠা করিয়ে দিয়েছিলেন, প্রচুর টাকাও ইনাম দিয়েছিলেন। বলতে গেলে মতি মিঞা নবাবের কাছে বিক্রিই করেছিলো মেয়েকে। কিন্তু আখতার-সাহেব জুলুমবাজ ছিলেন না, লোভী ছিলেন না— বরং ধর্ম-ভীরু মানুষ ব'লেই খ্যাতি ছিলো তাঁর। জবেদাকে দেখে যতোই মজুন,

জোর-জবরদস্তি কখনোই করতেন না, যদি মতি মিঞার অমত থাকতো। প্রকৃতপক্ষে মতি মিঞাই টাকার লোভে ঠেলে পাঠিয়ে দিলো মেয়েকে। ক্রীতদাসী বললেই বা ভুল হয় কী? কাজেই কুড়ি বছরের জবেদান্নেসার বুকের কলিজা তখন যার জন্যই ছিঁড়ে থাক না কেন, সমস্ত বেদনাকে নিঃশব্দে মেনে নিয়ে এদের ভালো ব্যবহারের বিনিময়ে, বাপকে বড়োলোক ক'রে দেবার কৃতজ্ঞতায় বিকিয়ে দিয়েছিলো নিজেকে। শুধু একবার, একবার সমস্ত অন্ত্রীতন্ত্রী কাঁপিয়ে প্রচণ্ড কান্নায় ডুকরে উঠেছিলো রাত্রির অন্ধকারে দেয়ালে মাথা ঠুকে। নবাববাড়ির দু-মাইল-জোড়া ঘেরাও-করা সাড়ে-সাত ফুট দেয়াল ডিঙিয়ে যেদিন সাহাবুদ্দীনের মৃত্যু-খবরটা এসে পৌঁছেছিলো এখানে, সেদিন আত্মসংবরণ করতে পারেনি সে। সাহাবুদ্দীন তার চাচাতো ভাই, তার আশৈশবের বুক-ভরা বুক-জোড়া দেহ-মন-প্রাণের একমাত্র অধিকারী। সাহাবুদ্দীন আত্মহত্যা করেছিলো। তার জন্যই করেছিলো। জবেদার বিচ্ছেদ সইতে পারেনি সে। এই কথা লিখে রেখে গিয়েছিলো চিঠিতে।

কিন্তু সে-সব কবেকার কথা। কোন অন্ধকারে বিলীন হ'য়ে গেছে। জোয়ার ছিলো না, না থাকুক, তবু আখতার আমেদকে ভালোবেসেছে বৈকি, গভীরভাবেই ভালোবেসেছে। অসুখের সময় মন-প্রাণ দিয়ে সেবা করেছে, খোদার কাছে জীবন ভিক্ষা করেছে, মারা গেলে কতোদিন কেটে গেছে কেঁদে-কেঁদে। শিশু সুলতানকে মাতৃত্ব দিয়ে সব কথা ভুলতে পেরেছে সে। এ-ও সাহেরবানুর খবর। সাহেরবানু অবশ্য অন্য-ভাবে বলেছে, শুনতে-শুনতে অন্তরের দরদ দিয়ে এভাবে গ্রহণ করেছে সুলেখা।

॥ দুই ॥

'কী হ'তো!' সুলেখার প্রশ্নের জবাবে চোখে একটু আবেশ ফোটালো জবেদান্নেসা। একটু হাসলো। মুখের দিকে চোখ স্থির ক'রে বল্‌লো, 'কী না হ'তো বাছা? আল্লার মর্জিতে এই মেয়ে-দেহ নিয়ে জন্মেছো। পাপ—পাপ এই দেহ। অনেক পাপ না-করলে এই খোলসে আত্মা ঢোকে না। এই দেহের যন্ত্রণায় কতো মেয়ের জীবন জ'লে-পুড়ে ছারখার হ'য়ে গেলো, আর তুমি!'

'দেহ?'

একুশ বছরের মেয়ে পঞ্চান্ন বছরের দাসীর মুখে এই দেহের উচ্চারণ শুনে আবার শিহরিত হ'য়ে মুখ ঢাকলো।

'দেহই তো!' দুই চোখে কতোদিনের কতো বেদনা ঘনিয়ে আনলো জবেদা, 'তা ছাড়া আর কী বলো? এই দেহেরই লোভ। দেহেরই মোহ। পুরুষ-পতঙ্গ তাইতেই জলে আর জ্বালায়।'

সুলেখা তেমনি মুখ ঢেকে রইলো।

দু-হাত উপরে তুলে সর্পিল ভঙ্গিতে আড়মোড়া ভাঙলো জবেদা; চুপ ক'রে থেকে বললো, 'সময় হয়েছে, আমি যাই। যাই?'

মিষ্টি গলা। মুখ থেকে হাত সরিয়ে কম্পিত গলায় সুলেখা বললো, 'যাও।'

'শোনো, আমি তোমার চেয়ে বয়সে অনেক বড়ো, অনেক মাঠ-ঘাট বন-বাদাড় ডিঙিয়ে তবে জীবন এখানে এসে ঠাঁই পেয়েছে, আমার কথা শোনো তুমি। বুনোপনা কোরো না। পুরুষের মন, জলের মতন। আজ স্রোত এইখানে, কাল ঐখানে। যতোক্ষণ জোয়ার আছে খোদার নামে ডুব দাও।'

যেন বই পড়ছে। জবেদার কথা শুনতে-শুনতে সুলেখার তাই

মনে হ'লো। সর্বদাই তাই মনে হয়। জবেদান্নেসার কথাবার্তা এই ধরনেরই।

যেতে গিয়েও জবেদান্নেসা ফিরে দাঁড়ালো, কাছে এলো, তারপর সহসা দুই হাতের আলিঙ্গনে বুকের কাছে টেনে এনে নরম গলায় বললো, 'ধরা দাও। আর তো গতি নেই কোনো।' তারপর আস্তে ছেড়ে দিলো, আস্তে-আস্তে পা ফেলে বেরিয়ে গেলো লম্বা হল-ঘর পার হ'য়ে।

কয়েকটা মুহূর্ত। কয়েকটা মুহূর্তের জন্য সব ভুলে এই অযাচিত স্নেহে অভিভূত হ'য়ে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলো স্থলেখা। তারপরই হঠাৎ দৌড়ে ছুটে এলো এদিকে বাথরুমের দরজার কাছে। রুদ্ধ আক্রোশে টেনে ছিঁড়ে তছনছ ক'রে ফেললো সাজ-পোশাক প্রসাধন সব। খুলে ফেললো যত্নে-বাঁধা চুল, শাড়িটা খুলে লাথি দিয়ে ঠেলে দিলো ঐ কোণে, পটাপট ছিঁড়ে ফেললো ব্রোকেড ব্লাউজের দামি বোতাম, ছুটে ঢুকে গেলো বাথরুমে, ঝাঁপিয়ে পড়লো চৌবাচ্চায়, ধুয়ে মুছে ঘ'ষে যেন সব ক্লেদ মুছে ফেলতে চাইলো শরীর থেকে। তারপর সেই শাড়ি-ব্লাউজ, সেই আটপৌরে আধ-ময়লা কালো-পাড় তাঁতের শাড়ি আর নীল ভয়েলের হাতে এমব্রয়ডারি-করা শস্তা ব্লাউজ, যা প'রে সে ঢুকেছিলো এইখানে, এই বাড়িতে, এই মহাশ্মশানে, সেইসব প'রে বেরিয়ে এলো হাঁপাতে-হাঁপাতে। মুখের রং, চোখের সুর্মা ধুয়ে-মুছে একাকার। গয়নাগুলো ছিটকে রইলো এখানে ওখানে সেখানে, চুলগুলো এলোমেলো হ'য়ে যেন অসহায়ের মতো ঝুলে রইলো মুখে বুকে পিঠে কোমর ছাপিয়ে। একটা সদ্য-ধরা-পড়া বুনো জন্তুর মতো সারা ঘরময় হেঁটে বেড়াতে লাগলো অস্থির বেগে।

অল্প পরেই বিরাট-পাল্লা দরজার গাঢ় নাবিক-নীল পরদাটাতে একটু দোলা লাগলো। একটা ব'য়ে-যাওয়া বাতাসের নরম ঢেউ। সেদিকে

তাকিয়ে সুলেখার নিশ্বাস ঘন হ'য়ে উঠলো, জিবে ঠোঁট বুলোলো, চোখটা বড়ো দেখালো, নিস্তেজ হ'য়ে খাটের বাজুটা ধ'রে ধুঁকতে লাগলো মুমূর্ষু রোগীর মতো।

নীলের উপর প্রথমে চারটি গোলাপি আঙুলের লালচে ছাপ, তারপরই ধীর পদক্ষেপে ঘরে ঢুকলেন সুলতান-সাহেব। কাজি সুলতান আমেদ। নবাব আমিরআলি-সাহেবের নাতি, নবাব আখতার আমেদের একমাত্র উত্তরাধিকারী। শুধু নামে না, সুলতানের মতোই তাঁর হাব-ভাব চেহারা চলন-বলন। নড়াচড়ার ভঙ্গি দৃঢ় এবং ধীর। হাঁটবার ভঙ্গি সিংহের মতো। দ্রুত লয়ের গান নয়, মালকোষ রাগের গাম্ভীর্যে মন্থর। গলার আওয়াজ মখমলের মতো গভীর আর নরম। তিনি যখন আসেন, যেন আসেন না, আবির্ভূত হন। সুলেখার সঙ্গে সারা দিনে এই তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ, এই তাঁর দেখা করার নির্দিষ্ট সময়। দিনের সমস্ত সময়টাকে তিনি গড়িয়ে যেতে দেন অপেক্ষার আলাপে, তারপর আসল গানটা শুরু করেন এখানে। সূর্যাস্ত আর সন্ধ্যার সন্ধিক্ষণে। দিন আর রাত্রির মিলনাকাঙ্ক্ষার কোটিতম ভগ্নাংশের মধ্যেই বিকশিত হন তিনি।

এই সময়টুকু তাঁর। একান্তভাবে তাঁর। এই সময়ে কোনো কাজ তিনি রাখেন না, হাজার পিছু-ডাক তিনি শোনেন না। এই সময়ে হাজার প্রয়োজনেও তাঁকে ডাকবার অনুমতি নেই কারো।

ক্ষ'য়ে-ক্ষ'য়েও পিতা-পিতামহর যা-কিছু পেয়েছেন সুলতান-সাহেব তা-ও কিছু কম নয়। এই শহরটি বর্ধিষ্ণু। এখানে শিক্ষা-সংস্কৃতির অভাব নেই, ভদ্র ব্যক্তিরও অভাব নেই। বড়ো-বড়ো স্কুল আছে, কলেজ আছে, আছে আপিস-আদালত। আপিস-আদালতের বড়ো-বড়ো বাবুরা আছেন, উকিল মোক্তার ব্যারিস্টার আছেন, সাহেব-সুবো, ব্যবসায়ী,

হিন্দু, মুসলমান, মারোয়াড়ি সব আছে। আর শহরের প্রান্ত ঘেঁষে শুকিয়ে-যাওয়া নদী। নদীর ধারে কামান বসানো আছে একটি, নবাবি গৌরবের শেষ ভগ্নাংশ। গাঁয়ের লোকেরা দেখতে আসে দূর থেকে, কামানটি ঘিরে নানা ঐতিহাসিক গল্প রচনা করে, তারপর ভক্তিভরে পুজো দিয়ে চ'লে যায়।

শহরের এক-তৃতীয়াংশ জুড়ে নবাবদের বিশাল ঐশ্বর্যের অগণিত স্মৃতি। নদীর ধার ঘেঁষে ইসলামবাজারের বিরাট কাশ্মীরী ফটকের ভেতরে দু-মাইল-জোড়া বাজার আর বস্তি আছে। তা ছাড়া নবাবকান্দি, বংশীপুর, সর্দারপাড়া, হুসনি দালান ইত্যাদির একচ্ছত্র মালিক এই সুলতান আমেদ। গোরার মাঠের পশ্চিম প্রান্ত জুড়ে বিরাট নবাব-বাড়িটি এখনো বিদেশী লোকের বিস্ময় উদ্রেক ক'রে দাঁড়িয়ে আছে তার পুরাকালের ভাস্কর্য দেহে নিয়ে। এখানকার গুলবাগিচা, জলপ্রপাত, গরমকালে শীতল থাকবার জন্য চিকন পাটির বাড়ি, পাথর-বসানো ময়ূর-সিংহাসন, আম-দরবার, খাশ-দরবার সবই দেখবার যোগ্য। আসান মঞ্জিলের কারুকার্য দেখে কতো লোক এখনো হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে। বাইরে থেকে কেউ এই শহরে বেড়াতে এলে গেট-পাশ জোগাড় ক'রে নবাব-বাড়ি দেখতে আসে। বলতে গেলে নবাব সুলতান আমেদ এই জেলার প্রভু, শহরের অর্ধেক অধিবাসী তাঁর অঙ্গুলিহেলনের দাস। এই-সব কর্তৃত্ব নিয়ে সমস্ত দিন তিনি ব্যস্ত, ব্যাকুল, অস্থির। শুধু এই সময়টুকুতে তিনি কারো নন, শুধু নিজের। এই তাঁর অবকাশ।

তিনি যখন আসেন, তাঁর সুগন্ধিজলে স্নাত সুদীর্ঘ শরীরের পায়ের পাতা পর্যন্ত ঢাকা লম্বা রেশম গাত্রবাস থেকে অদ্ভুত একটি মৃদু আর মধুর সৌরভ ভাসতে থাকে ঘরের মধ্যে। গাঢ় সবুজ কচি পাতায় ঘেরা তক্ষুনি-ছেঁড়া একটি রক্তগোলাপ থাকে তাঁর বাঁ হাতের তিনটি আঙুলের

ফাঁকে। এসেই জালি-কাটা আখরোট কাঠের গোল টেবিলের উপর সেটি আস্তে শুইয়ে দেন। মাঝে-মাঝে তোলেন, গন্ধ নেন, আবার রেখে দেন, তারপর যাবার সময় ফেলে যান সেটি। আরো একটা জিনিস ফেলে যান। অভিনব উপায়ে গাঁথা ছোট্টো একটি বকুল ফুলের মোটা মালা। যতোক্ষণ থাকেন, হাতের মণিবন্ধে বালার মতো জড়িয়ে রাখেন, যখন চ'লে যান প'ড়ে থাকে গোলাপটির পাশে। তাঁর গন্ধর্বের মতো অস্বাভাবিক সুন্দর চেহারায় থাকে গভীর ক্লান্তির পরে মধুর অবসাদের একটি সূক্ষ্ম শিথিলতা। বড়ো-বড়ো কালো দুই চোখে আত্মসমর্পণের নম্রতা। পাশে মোমের হলদেটে আলোর তলায় যখন এসে তিনি নরম সোফার নরম আরামে রাজকীয় ভঙ্গিতে শরীরটাকে ঈষৎ এলিয়ে দিয়ে বসেন, তখন তাঁর দিকে তাকিয়ে তাঁকে নরপিশাচ ভাবতে অবাক লাগে। এমনকি কখনো-কখনো সন্দেহ পর্যন্ত হয় যে, এই লোকই সেই লোক কিনা যাঁর সীমাহীন নিষ্ঠুরতায়, অধৈর্যহীন কুচক্রে কতোবার এই শহর রক্তবন্যায় ভাসলো, কতো সংসার ধ্বংস হ'য়ে গেলো, কতো প্রাণ বলি হ'লো, আর কতো মেয়ের পবিত্র জীবন নরকের কর্দমে কর্দমাক্ত হ'লো।

॥ তিন ॥

খুব ছেলেবেলাকার একটা ধুধু স্মৃতি আজ মনে পড়ছে স্বলেখার। মুছে-যাওয়া ছবি, তবু মোছেনি, একটি বালক স্পষ্ট হ'য়ে উঠে আসছে সেই ছবিতে। বৃদ্ধ নবাব আমিরআলি-সাহেবের সঙ্গে মাঝে-মাঝেই যে-বালক রঙিন জামা গায়ে দিয়ে, লাল টুকটুকে জরির নাগরা পায়ে প'রে বেড়াতে আসতো তাদের বাড়ি। টানা-টানা স্বপ্নের মতো দুই চোখ তুলে সে তাকাতো ; তার কুচকুচে কালো পশমের মতো লম্বা চুলের গুচ্ছ

কপাল বেয়ে চোখের পলক ছুঁয়ে নুয়ে আসতো। শুধু সেই বালকটিই নয়, বৃদ্ধ নবাব আমিরআলি-সাহেবকেও আজ মনে পড়ছে সুলেখার। কোনো ক্রিয়াকর্ম উৎসব হ'লেই নবাব-সাহেব নিজে ফিটন হাঁকিয়ে তাদের কমল্লাপুরের বাড়ির দরজায় এসে থামতেন। রাস্তায় ভিড় জ'মে যেতো তাঁকে দেখবার জন্য। দাদু ছুটে যেতেন গেটের কাছে, একটু নামবার জন্য অনুরোধ করতেন। গাড়ি থেকে ঝুড়ি-ঝুড়ি ফল নামতো, ফুল নামতো, নামতো হাঁড়ি-হাঁড়ি মিষ্টি, ঝি-চাকরেরা ব'য়ে নিয়ে যেতো। নবাব-সাহেবের ভাতিজা মেহেরআলি থাকতো সঙ্গে, ফর্শা আর রোগা একটি ছেলে। তার হাতে গোলাপি-রং মখমলের থলি-ভর্তি টাকা থাকতো, তা থেকে প্রত্যেক ঝি-চাকরকে দশটা ক'রে রুপোর টাকা বখশিশ দেওয়া হ'তো। নবাব-সাহেব কখনো নামতেন, কখনো নামতেন না। পুরোনো চাকর গোবিন্দদা ঐখানেই ছুটে যেতো রুপোর হুঁকোয় মিষ্টি তামাক ভ'রে নিয়ে, গাড়িতে ব'সেই নবাব-সাহেব লম্বা নলটা মুখে ছোঁওয়াতেন। বুড়ি দাই সত্তুর-মা কাচের প্লেটে ফল-মিষ্টি নিয়ে গিয়ে খাবার জন্য সাধাসাধি করতো বালকটিকে, লজ্জায় সে নবাব-সাহেবের বুকের মধ্যে মুখ লুকিয়ে থাকতো, কিছুতেই খেতো না। নবাব-সাহেব হাসতেন, আর বলতেন, 'ভারি শরম, খানাপিনা নিয়ে ভাইয়ার আমার বহুৎ শরম আছে।'

যে-উৎসব উপলক্ষেই তিনি আসুন না কেন, তাঁর আসাটাই সেদিনকার মতো বড়ো উৎসব হ'য়ে উঠতো। সুলেখার বাবা এসে দাঁড়াতেন লাজুক মুখে। সুলেখার জ্যাঠামশায় এসে দাঁড়াতেন, চাকর-বাকর, আমলাফয়লা, ছেলেপুলে সব এসে ঘিরে দাঁড়াতো। বাড়ির ভেতরে ফিশফিশ উঠতো, 'নবাব-সাহেব। নবাব-সাহেব।' উঁকিঝুঁকির ধুম লেগে যেতো। ভালো ফ্রক গায়ে দিয়ে, বাবার গা ঘেঁষে সুলেখাও

এসে দাঁড়াতো বৈকি। মন্ত্রমুগ্ধের মতো অপলক তাকিয়ে থাকতো, ভীষণ ভালো লাগতো সেই বৃদ্ধ আর তাঁর নাতিকে। বইয়ের পাতায় দেখা কোনো ছবির কথা মনে প'ড়ে যেতো। হাত বাড়িয়ে নবাব-সাহেব তাকে গাড়ির মধ্যে তুলে নিতেন, দেবদূতের মতো শাদা আর লম্বা রেশমি-কোমল সুগন্ধ দাড়িভরা গালে গাল ঠেকিয়ে আদর করতেন। পাশে ব'সে-থাকা বালকটির চোখ টলটল করতো খুশিতে। কথা না-বললেও দুটি শিশুর মধ্যে একটা সম্বন্ধ স্থাপিত হ'য়ে যেতো।

সব ভুলে-যাওয়া দিন, ভুলে-থাকা ছবি। একটি ছোট্টো মেয়ের অবোধ হৃদয়ের আঁকিবুঁকি। কালের প্রলেপে কবি-মনের সেই দাগ কখন যে মুছে গিয়েছিলো, তা পর্যন্ত মনে নেই। বড়ো হ'তে-হ'তে আরো কতো দাগ রেখা ফেললো; কতো দাগ নিশ্চিহ্ন হ'লো, তাই কি মনে আছে? তবু কী আশ্চর্য—! এখানে আসার পর থেকে এই লোকটার মুখের দিকে চোখ পড়লেই হৃদয়ের কোন গভীর স্তর থেকে ধীরে-ধীরে উঠে আসে সেই ছবি, সেইসব দিন। ভুলে-যাওয়া, ভুলে-থাকা সেই বালকের অস্পষ্ট মুখ। সুলেখা স্তব্ধ হ'য়ে যায়। মনে-মনে মিল খোঁজে। মিল! এর সঙ্গে তার মিল!

অবশ্য বড়ো হ'তে-হ'তে কিসের সঙ্গেই বা কী মিল সে খুঁজে পেয়েছে? শুধু চলার রাস্তাটা ক্রমেই কঠিন হ'য়ে উঠেছে। কাঁটা বিঁধেছে পায়ে, কাঁকর ফুটেছে। কেবলই একটার পর একটা ঘ'টে-যাওয়া ঘটনা মাত্র। দাদুর মৃত্যুটাও কি সেই ঘটনারই একটা তুচ্ছ অংশ মাত্র নয়? তা ছাড়া আর কী! স্পষ্ট মনে আছে ছ' ফুট লম্বা মস্ত মানুষটিকে। গায়ের রং কালো, দেহ বলিষ্ঠ, মুখশ্রী অতি সুন্দর। অন্তত সুলেখার চোখে। হৃদয় যতো কোমল, ততো দরাজ। এই ঐশ্বর্য নিয়ে নবাবগঞ্জের

বিখ্যাত উকিল ভুবনমোহন তালুকদার একদিন তো চোখ বুজলেন। রাতদিন যিনি মাথার জোরে হয়কে নয় করেছেন, মৃত্যুর সঙ্গে পারলেন কি পাঞ্জা কষতে? স্থলেখা তখন কতোটুকু? মনে পড়ে না। দাছুর হাঁটুর একটু উপরে তার মাথা, কোকিল-কালো পাড়ের নম্বরি ধুতির পরিপাটি কোঁচার খুঁটটা ধ'রে সে দাছুর মুখের দিকে তাকাতো।

প্রত্যেকদিন বিকেলে নদীর ধারে হাঁটতে যেতেন তিনি। তাদের কমলাপুরের বাড়ি থেকে নদীর ধার বড়ো কম রাস্তা নয়। গোরার মাঠ পার হ'য়ে, রেললাইন পার হ'য়ে, নবাবকান্দি ইসলামবাজারের মধ্য দিয়ে তবে নদীর ঘাটে পৌঁছনো যেতো। আবদার ক'রে মাঝে-মাঝে সে-ও যেতো দাছুর সঙ্গে, সেদিন দাছু ঘোড়ার গাড়ি নিতেন। স্থলেখা কি অতো হাঁটতে পারে? আর ঘোড়ার গাড়ি নেয়া মানেই সব্বাইকে নেয়া। না, সে-বেড়ানো ভালো লাগতো না স্থলেখার। তার গাড়ি ইচ্ছে করতো না, সব্বাইয়ের সঙ্গ ইচ্ছে করতো না, ইচ্ছে করতো দাছুর আঙুল ধ'রে হেঁটে-হেঁটে সারা শহর পেরিয়ে নদীর ধারে যেতে। শুধু কামানটার কাছেই নয়, নদীর ঘাটের নৌকো-বাঁধা ঢালু পাড়িতে দাঁড়িয়ে থাকতে ইচ্ছে করতো তার। বিকেলের ঠাণ্ডা জলে কুলকুল শব্দ উঠতো বাতাসে, নৌকোগুলো হাঁসের হাঁটার মতো একটু-একটু ছুলতো বাঁধা অবস্থায়, ইচ্ছে করতো সারাক্ষণ সেখানে ব'সে থাকতে। সে-ইচ্ছে পূরণ করা শক্ত ছিলো। তারই না-হয় একটা দাছু, কিন্তু দাছুর তো আরো নাতি-নাতনি আছে? ভালোবাসা আছে? কর্তব্য আছে? তবু সে জানে দাছু তাকেই ভালোবাসতেন বেশি, এই একচোখোমিতে বাড়ির আর সবাই থমথম করলে দাছু বলতেন, 'আহা, ও তো সবচেয়ে ছোটো। আর স্থপ্রকাশের কি দশটা না পাঁচটা? এই তো সবে একটা মেয়ে।' আর সেই অছিলায় আদরের মাত্রাটা অনেক সময়ই মাত্রা ছাড়িয়ে যেতো। তাই ব'লে

দাদু গাড়ি ভাড়া ক'রে নদীর ঘাটে বেড়াতে গেলে অন্য নাতি-নাতনি ফেলে শুধু তাকে নিয়েই যাবেন এ কখনো হয়? অন্যদের প্রতি তাঁর উগ্র না হোক, স্বাভাবিক টানটা তো নিশ্চয়ই আছে? শুধু মাঝে-মাঝে যখন জ্যাঠাইমা বাপের-বাড়ি যেতেন তখন এক-আধদিন এই সাধ পূরণ হ'তো তার। তখন সে দাদুর ধুতির লম্বা কোঁচা ধ'রে সভয়ে জলের ধারে যেতো। ঝাপটা বাতাসে ফ্রকটা পালের মতো ফুলে উঠতো, চুলগুলো নাকেমুখে এসে সুড়সুড়ি দিতো, বুক ভ'রে যেতো সোঁদা গন্ধে।

জ্যাঠাইমার মতো মা কোনোদিন বাপের-বাড়ি যেতেন না। মা-র মা মারা গিয়েছিলেন সুলেখার জন্মের আগে, মা-র বাবাও মারা গিয়েছিলেন সে যখন মাত্র তিন বছরের শিশু। মা-ই দাদামশায়ের একমাত্র সন্তান, কাজেই ভাইয়ের বাড়ি যাবারও কোনো প্রশ্ন ছিলো না। কেবল দাদামশায়ের সুরি লেনের বাড়িটায় মাঝে-মাঝে বেড়াতে যেতেন এক কাকিমার কাছে। বাড়িটা উত্তরাধিকারসূত্রে মা-ই পেয়েছিলেন, মা-ই তাঁর এই কাকাকে অন্য বাড়িতে ভাড়া না-গুনে এই বাড়িতে এসে থাকতে অনুরোধ করেছিলেন। তবু তো বাড়িটাতে একটা বাপের-বাড়ির লোক থাকবে। শৈশবের শতস্মৃতিবিজড়িত ঘরগুলোতে নিঃস্ব পরেরা ঘুরে বেড়াবে না। মা-রও একটা যাবার জায়গা হবে। সেই কাকা-কাকিমাকে মনে আছে সুলেখার। মা-র বাবার দূরসম্পর্কের ভাই, শিক্ষিত, মার্জিত চমৎকার ভদ্রলোক। সুলেখার মা-র সঙ্গে ঠিক নিজের কাকার মতোই ব্যবহার করতেন, জামাইকে যথারীতি আদর-আপ্যায়ন করতেন, আর নাতনিকে, মানে তাকে বউ ব'লে ডেকে দারুণ জ্বালাতেন। ভদ্রলোকের বয়স কম ছিলো, বাবার চেয়ে সামান্য বড়ো, সম্পর্ক মধুর, প্রায় বন্ধু ছিলেন জামাই আর খুড়শ্বশুর।

মা-র কোনো বাপের-বাড়ি না থাকায়, জন্মাবধি একদিনও সুলেখাকে

ঠাকুমা-দাদুকে ছেড়ে কোথাও যেতে হয়নি। জ্যাঠাইমা যখন সব ছেলে-মেয়ে নিয়ে তিন-চার মাস ক'রে বাপের-বাড়ি থাকতেন গিয়ে, সে তখন দাদু-ঠাকুমার শূন্য কোল দখল ক'রে একলা একেশ্বরী। তাই হয়তো সকলের চেয়ে বেশি নিবিড় হ'য়ে উঠেছিলো দাদু-নাতনির সম্বন্ধটা। কে জানে। একদিন সন্ধ্যাবেলা বেড়িয়ে ফিরে এসে হাত-মুখ ধুয়ে সন্ধ্যা-আহ্নিক করতে বসলেন দাদু। রোজের মতো স্বলেখাও তার ঠাকুমার তৈরি মস্ত ন্যাকড়ার পুতুল-মেয়েটাকে নিয়ে পা ছড়িয়ে ঘুম পাড়াতে বসলো। বাড়িটা একেবারে নির্জন ছিলো সেদিন, শুধু সে নিজে, ঠাকুমা আর মা। জ্যাঠামশায় দেশে গিয়েছিলেন দাদুর সংভাই আর ভাইপোদের সঙ্গে সম্পত্তি নিয়ে ঝগড়া করতে। জ্যাঠামশায় বিষয়ী লোক। দাদুর মতোও নন, বাবার মতোও নন। দাদু উকিল হ'লে হবে কী, বিবেক তাঁর সোজা, পেশাটা যা-ই হোক মানুষটি সোনা। কোনো লোভ ছিলো না তাঁর, এক-জীবনে বিত্ত তিনি কম করেননি কিন্তু তাই ব'লে আসক্তি ছিলো না। বাবাও ঠিক তেমনিই ছিলেন। উদাস মানুষ, একটু লাজুক, স্বল্পভাষী, শান্তিপ্রিয়। জ্যাঠামশায়ের স্বভাব আবার তেমনি উগ্র আর স্বার্থপর। কোথায় ভাগে একরত্তি কম পড়লো এই চিন্তাতেই তিনি অধীর। ক'দিন থেকেই দেশে গিয়ে সম্পত্তি বণ্টন করবেন এই তালে ছিলেন। সম্পত্তির মধ্যে অবিশ্যি একখানা ভাঙা পাকা দালান, কিছু বাসন আর কিছু কাঁঠাল কাঠের পিঁড়ি। কোথা থেকে শুনে এসেছেন অভাবে প'ড়ে ওঁরা নাকি বিক্রি ক'রে দিচ্ছেন সে-সব। আর যাবে কোথায়, অমনি জ্যাঠামশায়ের বুকটা ফেটে গেলো। চাদর কাঁধে ছুটলেন তিনি ফয়সালা করতে।

ভ্রূকুটি ক'রে দাদু বললেন, 'এ-সব আমি পছন্দ করি না। তোমার কাকা অভাবগ্রস্ত, তাঁর ছেলেরাও কেউ তেমন উপযুক্ত হয়নি, তাদের

সঙ্গে সামান্য কয়েকটা ইট আর কাঠ নিয়ে ভাগাভাগি করতে যাওয়া অত্যন্ত গর্হিত।'

ঠাকুমার মুখের কাছে আস্ফালন ক'রে ঘরের ভেতর দাঁড়িয়ে অস্পষ্ট স্বরে জ্যাঠামশায় বললেন, 'ভাগাভাগি না-করাটাই গর্হিত। এই কাকা আর কাকার মা-ই একদিন বাবাকে বার ক'রে দিয়েছিলেন বাড়ি থেকে।' এ-কথাটা অবিশ্যি দাদু শুনতে পেলেন না, বারান্দায় ব'সে ছিলেন তিনি।

ঠাকুমা বললেন, 'সে কোন জন্মেকার কথা। ও-রকম ঝগড়াঝাঁটি অনেকই হয়। তাই ব'লে তোর ঠাকুমাকে কি তোর বাবা কোনোদিন অসম্মান করেছেন। বুড়ো হ'য়ে তো এই ছেলের হাতেই গেলেন। এই সৎছেলেই সংসারটা টানলো। আজই না-হয় তার ছেলে তিনটে টুকটাক কিছু করছে, কিন্তু ঠাকুরপো তো একেবারে ঘরধরা মানুষ। সারাটা জীবন শুয়ে-ব'সে কাটিয়ে দিলো।'

বাবা ছিলেন ঘরে, কাজের থেকে মুখ তুলে বললেন, 'তা-ও অবস্থা ওদের নিতান্ত খারাপ, কী নিয়ে তুমি ঝগড়া করবে। সে ভারি লজ্জার।'

'নে নে থাম, বেশি ইয়ে দেখাসনে।' চ'টে উঠলেন জ্যাঠামশায়।

ঠাকুমা বললেন, 'থামবে কেন? দুটো কাঁঠাল কাঠের পিঁড়ি আর কয়েকটা ঘটি-বাটি টেনে এনে তোর কী মোক্ষ লাভ হবে শুনি? ভগবানের ইচ্ছায় তোদের কি কিছু কম আছে?'

জ্যাঠামশায় বললেন, 'ত্মাখো মা, কম-বেশির কথা নয়, ন্যায্য পাওনার কথা। সম্পত্তি আমার ঠাকুর্দার, ওদেরও যতোটুকু, আমাদেরও তার চেয়ে এক চুল কম নয়। ভাগের একটা খড়কুটোও আমি ছাড়বো না।' এই ব'লে তিনি রাগে গরগর করতে-করতে নদীর ঘাটে গিয়ে গহনার নৌকোয় চ'ড়ে বসলেন। আর জ্যাঠামশায় যাবার পরের দিনই বাবার একটা চাকরির চিঠি এলো কলকাতা থেকে। ঠাকুমা কপালে দইয়ের

ফোঁটা দিয়ে শুভযাত্রা করালেন ছেলেকে। জ্যাঠাইমা অনেক আগেই শরীর খারাপ ব'লে বাপের-বাড়ি গিয়েছিলেন। পিসি দু-জনও যাঁর-যাঁর শ্বশুরবাড়ি ছিলেন। সুতরাং সেই সন্ধ্যায় যেদিন আহ্নিক করতে-করতে হঠাৎ কেমন ক'রে উঠলেন দাদু, নিজের সন্তানরা কেউ ছিলো না বাড়িতে। সুলেখা কাছে ব'সে ছিলো ব'লে প্রথমটায় সুলেখাই টের পেয়ে আঁৎকে উঠেছিলো। মৃত্যু কী, কেমন বস্তু, মৃত্যু নামে আদৌ কোনো অস্তিত্ব জগৎ-সংসারে বিরাজমান কিনা এটা একটা ছ'-সাত বছরের নতুন মানুষের জানবার বিষয় নয়। তবু সে কেঁদে উঠেছিলো জোরে। কী ভেবে কেঁদেছিলো, কেন কেঁদেছিলো এখন আর মনে পড়ে না তেমন ক'রে। কিন্তু তার স্মৃতিটা জ্বলন্ত রেখায় আঁকা হ'য়ে আছে বুকের মধ্যে।

তার চীৎকারে আকৃষ্ট হ'য়েই মা আর ঠাকুমা দৌড়ে এসেছিলেন। এসেই তাঁদের অভিজ্ঞ মন নিয়ে বুঝে ফেলেছিলেন ব্যাপারটা। ঠাকুমা আছাড় খেয়ে পড়লেন, মা ডুকরে উঠলেন শাড়ির আঁচলে মুখ ঢেকে। দাদুকে জড়িয়ে ধ'রে কাঁদছিলো সুলেখা, থেকে-থেকে কেঁপে উঠছিলেন দাদু। পরে শুনেছে, এটাই মৃত্যুর আগের শেষ পরোয়ানা। চোখ দুটো এতো বড়ো হ'য়ে বেরিয়ে আসছিলো। যেন কী বলতে চেয়েছিলেন, পারেননি। প্রদীপ জ্বলছিলো ঘরে, তার স্বল্পালোকে কোলের পুতুলটাকে চাপড়ে-চাপড়ে ঘুম পাড়াতে-পাড়াতে সুলেখা তাকিয়ে বলেছিলো, 'আজ তুমি কতো পুজো করবে দাদু?' দাদু জবাব দেননি। দিতে পারেননি, দাদুর দেহ এলিয়ে পড়ছিলো আস্তে-আস্তে। সুলেখার বুকটা যেন হঠাৎ ঝাঁকানি খেয়ে বন্ধ হ'য়ে যাবার মতো হ'লো। চমকে উঠলো একটা অদ্ভুত যন্ত্রণার অনুভূতিতে। তখনো হেঁচকি টানেননি দাদু, শুধু ঘুমের মতো ঝিমিয়ে যাচ্ছিলেন, হালকা হ'য়ে যাচ্ছিলেন। ভয়ে সারা শরীরে হিম-বিদ্যুৎ খেলে গেলো। কেন ভয় কে জানে। মনে হ'লো সে দেখতে পাচ্ছে

না বটে তবু যেন কেউ এসেছে ঘরে, যেন কার উপস্থিতিতে থমথম করছে ঘরটা। কে ? কে এসেছে ? সামনে পিছনে পাশে— কোথায় ! কোথায় ! চারদিক তাকিয়ে ভয়ার্ত বিকৃত গলায় কেঁদে উঠলো সে। তার অবোধ মন তাকে ব'লে দিলো, আর রক্ষা নেই। সে এসে গেছে। এই অস্তিত্বহীন অদৃশ্য মানুষই এখন দাদুর কাছে একমাত্র সত্য। এইরকমই হয়। এমনি ক'রেই নিতে আসে সবাইকে। দাদুকে শক্ত ক'রে জড়িয়ে ধরলো সে, তার ছোট্টো শরীরের উপর ঢ'লে পড়লো দাদুর মৃতদেহ।

॥ চার ॥

জীবনের প্রথম আঘাত। প্রথম চৈতন্য। মর্মান্তিক বেদনায় সুলেখা স্তব্ধ হ'য়ে গিয়েছিলো। বৈরাগ্য এসেছিলো জীবনে। কতোদিন পর্যন্ত কারো সঙ্গে কথা বলতে পারেনি সে, কারো সঙ্গে খেলতে পারেনি, হাসতে পারেনি। কতোদিন খায়নি, কতোদিন ঘুমোয়নি। কতোদিন সেই অলৌকিক ভয়ের চেতনায় মাকে আঁকড়ে, বাবাকে আঁকড়ে, মুখ ঢেকে রাত কাটিয়েছে। যেন কেউ তাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলো উঁচু থেকে। মাথা ফেটে গেলো, দেহ ছিঁড়ে গেলো, বুক ভেঙে গেলো, ছিন্নভিন্ন হ'য়ে গেলো সব অন্ত্রীতন্ত্রী, হৃৎপিণ্ড।

সুলেখা জানলো, যারা আছে, হেঁটে-চ'লে বেড়াচ্ছে, খাচ্ছে-দাচ্ছে, ঘুমুচ্ছে, ভালোবাসছে, বকছে, তারা কেউ থাকবে না। তারা সব না-থাকার জন্যই এসেছে সংসারে। ঠিক দাদুর মতো ক'রেই একদিন চ'লে যাবে তারা। নিতান্ত অপরিচিতের মতো চ'লে যাবে। যাবার সময় একবার মুখ ফিরিয়েও দেখবে না, একটা বিদায় পর্যন্ত নেবে না। কারো সুখ দুঃখ বেদনা আনন্দ, আর-কিছুতেই কিছু এসে যাবে না তার।

দাদু যে কী পরিমাণ হৃদয়হীনের মতো ব্যবহার করেছিলেন, তার কোনো তুলনা খুঁজে পায়নি সুলেখা। কতো অভিমান করলো, প্রাণপণ আর্তনাদে কতোবার ডাকলো, তবু দাদু ফিরে তাকালেন না, ছোট্টো হাতে গলা জড়িয়ে ধ'রে বুকের মধ্যে কতো মুখ ঘষলো, জামাটাই শুধু ভিজে গেলো চোখের জলে, এতোটুকু নড়লেন না দাদু। কেবল কতকগুলো লোক জোর ক'রে তুলে দিলো তাকে, তারপর দাদুকে সাজিয়ে-গুছিয়ে খাটে শুইয়ে, কাঁধে ক'রে নিয়ে গেলো কোথায়।

নিষ্ঠুর। নিষ্ঠুর।

খাট ধ'রে ঝুলে পড়েছিলো সে। শক্ত হাতে নামিয়ে দিলো একজন। আর তারপর! কী হ'লো তারপর? কিছুই হ'লো না, একটা ঝড় ব'য়ে গেলো শুধু, আর এক পশলা বৃষ্টি। আবার হেসে উঠলো রোদ। আবার জীবনযাপনের তাগিদ, বেঁচে থাকার প্রয়াস। সংসারের চাকা তেমনি ঘুরতে লাগলো আপন বেগে।

টেলিগ্রাম পেয়ে বাবা ছুটে এলেন, জ্যাঠামশায় এলেন, জ্যাঠাইমা এলেন, এলেন পিসিরা, আরো যে কতো কেউ এলো শোক দেখাতে, শোক জানাতে, ইয়ত্তা নেই তার। বড়ো খাটটায়, যেখানে দাদু ঘুমুতেন, দাদুর বালিশে মাথা রেখে মড়ার মতো প'ড়ে রইলেন ঠাকুমা, দোতলার ছাদের উপর, ছোট্টো চিলেকুঠির গায়ে ঠেসান দিয়ে আকাশে তাকিয়ে রইলো সুলেখা, সুলেখার মা সুষমা দেবী কপাল অবধি ঘোমটা টেনে দিনরাত ব্যস্ত হ'য়ে রইলেন অতোগুলো অভ্যাগতের পরিচর্যায়, জ্যাঠাইমা সময়-অসময়ে লোক দেখলেই গলা ফাটিয়ে কান্নার রোল তুলতে লাগলেন, পিসিরা দু-দিন ব'সে রইলেন ঠাকুমার মাথার কাছে। জ্যাঠামশায় হিসাব-নিকাশে ব্যস্ত হ'য়ে উঠলেন, জ্যাঠামশায়ের ছেলেমেয়েরা কে

কোথায় রইলো কে জানে। বাবা নিজেকে নিজের ঘরে আবদ্ধ করলেন, হাতে একটি বই রইলো, মনটার খবর কেউ জানলো না।

যেন একটা উৎসব লেগেছে বাড়িতে। কেন এরা এসেছে? কী চায়? কী দরকার এদের। মনে-মনে ভাবে সুলেখা। মনে-মনে নির্জনতা খোঁজে। খাওয়া-দাওয়া, হাঁক-ডাক, হাসি-গল্প, কিছুরই তো অভাব নেই। বরং দাদু থাকতে যেটুকু আড়াল ছিলো সেটুকু ভেঙেছে। তবে কি এরা সেই সুখভোগ করতেই এসেছে এখানে? দাদুর অভাবে যে পৃথিবীটা অন্ধকার লাগছে, বিস্বাদ লাগছে, ম'রে যেতে ইচ্ছে করছে, তা কি ওরা একটুও বুঝতে পারছে না?

সুমসাম দুপুরে ব'সে-ব'সে শুধু এই কথা ভাবে সুলেখা। নিঃঝুম রাত্তিরে, ঝিঁঝি পোকার ডাক শুনতে-শুনতে চোখের জলে তার বালিশ ভিজে যায়। মুখ চেপে সে ছোটো-ছোটো ক'রে ডাকে, 'দাদু। দাদু।' হঠাৎ একটা ভয়ংকর ভয়ে শরীরটা কাঠ হ'য়ে যায়।

এর পরেই কলকাতা চ'লে এসেছিলো সুলেখারা। সুলেখা নিজে, তার মা, তার বাবা। কলকাতার কোনো-এক সওদাগরি আপিসে ভালো চাকরি পেয়েছিলেন সুপ্রকাশবাবু।

ঠাকুমা ভীষণ কাঁদলেন আসবার সময়। আর ঠাকুমার জন্য সে-ও কাঁদলো ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে। সুপ্রকাশবাবু চেয়েছিলেন ঠাকুমাকে নিয়ে আসতে, ঠাকুমার সদ্যশোকার্ত হৃদয় সায় দিলো না ঐ-বাড়ি ছেড়ে আসতে।

কাঁদলো একটু-আধটু সকলেই। ভাইবোনেরা দাঁড়িয়ে রইলো সজল নয়নে, জ্যাঠাইমা চোখ ঘষলেন, পিসিরা আদর করলো, আত্মীয়-পরিজনরা ঘিরে দাঁড়ালো, জিনিসপত্র দেখে-শুনে তুলে দিতে-দিতে জ্যাঠামশায়ও মুখ ফিরিয়ে সকলের অলক্ষ্যে চোখ মুছে নিলেন একবার।

ছবি আসে, ছবি যায়। কে দেখায় কেউ জানে না। যে-ছবি চ'লে

যায় তারও যেমন কোনো পুনরাবৃত্তি নেই জীবনে, যে-ছবি আসে তা-ও তেমনি অলঙ্ঘ্য, কোনো প্রতিবন্ধক নেই তার। ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোনো মূল্য নেই সেখানে। একেবারে একনায়কত্বের অধীন, যদিও নাটকটি অলক্ষ্য অদৃশ্য ; ভালো হোক মন্দ হোক তাই মাথা পেতে মেনে নিতে হবে তোমাকে। তা নইলে সুলেখার এই জীবনের ছবিটাই কি ভাবতে পেরেছিলো সে, না নিতে চেয়েছিলো ? না কি তার বাবা সুপ্রকাশবাবুর মৃত্যুর ছবিটাই কেউ ভাবতে পেরেছিলো আগের মুহূর্ত পর্যন্ত।

ঠিক দাদুর মতো ক'রেই হঠাৎ একদিন মারা গেলেন তিনি, ঠিক দাদুর মতোই চুপে-চুপে, স্বার্থপরের মতো, কারো কাছে বিদায় না-নিয়ে, না-দিয়ে।

সেদিন সুলেখার জন্মদিন ছিলো। বারো বছরের জন্মদিন। সারা দিন হৈচৈ তাই নিয়ে। কলকাতা আসবার পরে দুটি ভাই জন্মেছিলো সুলেখার। তিন ছেলেমেয়ে আর স্ত্রীকে নিয়ে বেরিয়ে দরাজ হাতে জিনিসপত্র কিনলেন সেদিন। ফ্রক-পরা সুলেখার শাড়ি হ'লো। তার সঙ্গে মিলিয়ে ব্লাউজ, পেটিকোট, আরো কতো কী। ভাইদের ধুতি হ'লো। দিদির জন্মদিনে কি তারা প্যাণ্ট পরবে ? ছি ! আর যিনি মা, তিনিই তো সব। তাঁর জন্য নতুন শাড়ি তো সর্বাগ্রে। আটান্ন টাকা দিয়ে লাল-পাড় কড়িয়াল শাড়ি কেনা হ'লো। মা তো লজ্জায় লাল। লজ্জায় অবশ্য তিনি সব সময়েই লাল। মুখ তুলে কথা বলতেও সাতবার দ্বিধা। কে কী মনে করবে, কার কী অসুবিধে হবে এই তাঁর সারা দিনের চিন্তা। নিজের জন্য মনে-মনেও কিছু ভাবেন না তিনি। তাঁর আবার আলাদা অস্তিত্ব কী ? সকলের সব মিটলেই তবে তো তাঁর নিজের কথা ?

মা-র এই স্বভাব। এই স্বভাবের জন্য কষ্টও পেয়েছেন তিনি।

বউ-দশা তো কোনোদিন ঘোচেনি শ্বশুরবাড়িতে। নিঃশব্দে সকলের মন জুগিয়েছেন, সারা দিন খেটেছেন, সারা দিন তটস্থ হ'য়ে থেকেছেন—কোথায় কার ডাক পড়লো। আত্মীয়স্বজন সবাই খাটিয়েছে তাঁকে, জ্যাঠাইমা ব'সে থেকেছেন পায়ে পা দিয়ে, ঠাকুমা অবশ্য মাঝে-মাঝে রাগ করেছেন তাই নিয়ে, কিন্তু রাগ করলে কী হবে, মা নিজেই তো সব করেন সেধে যেচে। আর এইজন্যেই চাকরি হওয়ামাত্র বাবা মাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে এলেন, রেখে এলেন না। তা নইলে পারিবারিক কর্তব্যের দিক থেকে তখনকার নিয়ম অনুযায়ী দাদুর মৃত্যুর পর অন্তত মাস দুয়েক ওখানে থাকা উচিত ছিলো মা-র। ঠাকুমা নিজেও সে-ইচ্ছেই প্রকাশ করেছিলেন, বাবা চোখ বুজে পিঠ ফিরিয়ে এড়িয়ে গেছেন সব মন্তব্য। তিনি জানেন তাঁর স্ত্রী বড়ো অসহায়, বড়ো দুর্বল, বড়ো ভীরু। আর বড়ো ভালোমানুষ। তিনি চাননি নিজের কাছ ছাড়া আর কোথাও রাখতে। সব সময় সস্নেহে আগলে রেখেছেন তাঁকে।

দুপুরে খাওয়া-দাওয়া হ'লো। মাংস হ'লো, পায়েস হ'লো, সুগন্ধি চালের পোলাও হ'লো। সবাই নতুন কাপড় প'রে খেতে বসলো পরম আনন্দে। সুলেখার হাত দিয়ে সুলেখার মা একখানা জরিপাড় ধুতি কিনিয়ে এনে দিলেন স্বামীকে। মহা-খুশি সুপ্রকাশবাবু। একেবারে সারা দিনের প্রোগ্রাম ক'রে ফেললেন খুশির চোটে। সিনেমার টিকিট কেটে আনলেন সকলের। বিকেলের শো-তে সিনেমা দেখে, রাত্তিরে কোনো রেস্তোরাঁয় খেয়ে তবে বাড়ি ফেরা।

অতিশয় একটি সুখের দিন। সবচেয়ে সুখের দিন। রাত ক'রে বাড়ি ফিরে সেই সুখের জাবর কাটতে লাগলো সবাই। বারোটা বাজলো তবু ঘুম নেই কারো চোখে। আলো নিবিয়ে শুয়ে-শুয়ে গল্প। এদিকে দক্ষিণের জানালা ঘেঁষে সুপ্রকাশবাবু শুয়েছেন, পাশে সুলেখা। গল্প করবার লোভে

সেদিন বাবার সঙ্গে শুয়েছে সে। উল্টো দিকের খাটে মা শুয়েছেন দুই ছেলে নিয়ে। বাবু আর ছোটু। দুই খাটে কথা বলাবলি চলছে। প্রথমে ঘন-ঘন, তারপর ধীর লয়ে, তন্দ্রার ঝোঁকে-ঝোঁকে। রাত্তিরের টুপটাপ শিশিরের শব্দের মতো একটা কথার পৃষ্ঠে আর-একটা কথা। তারপর কখন ঝিমিয়ে এসেছে, কখন কে ঘুমিয়ে পড়েছে। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেলো সুলেখার। আর ঘুম ভেঙেই একটা অশরীরী ভয়ে ঘাম ছুটে গেলো। আবার। আবার এসেছে। আবার টের পেলো সুলেখা সেই অদৃশ্য মানুষের অস্তিত্বহীন উপস্থিতি। সামনে পিছনে ডাইনে বাঁয়ে কোনো-দিকে ফাঁক নেই, কোনোদিকে পালাবার রাস্তা নেই। একটা সর্ষে পরিমাণ রন্ধ্র পর্যন্ত নেই তার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার। অন্ধকার ঘরে একা জেগে শরীরের লোমগুলো তার খাড়া হ'য়ে উঠলো। দাদুর মৃত্যু-দিনে অনভিজ্ঞ ছিলো সে, এখন তো সে সব জানে, সব বোঝে। এই অদৃশ্য শক্তির টান তো সে মর্মে-মর্মে উপলব্ধি করতে পারে। ঠিক সেই অনুভূতি, সেই সন্ধ্যার সেই যন্ত্রণাময় চেতনা। কেঁপে উঠে ভয়ে দু-হাতে গলা জড়িয়ে ধরলো বাবার, বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো মুহূর্তে ছিটকে স'রে এলো হাত। ঠাণ্ডা। ভীষণ ঠাণ্ডা। ভয়ংকর ঠাণ্ডা। পৃথিবীতে সেই ঠাণ্ডার কোনো ব্যাখ্যা জানে না কেউ। হাতটা টনটন ক'রে উঠলো। বুকের হাড়-পাঁজরা গুঁড়ো হ'য়ে গেলো। অস্ফুটে বাবা ব'লে ডেকে উঠলো এবার, তারপর আর মনে নেই। বছর দুই আগে ঠাকুমা মারা গিয়েছিলেন, জ্ঞান হারাবার আগে যেন ঠাকুমাকে জানালায় দাঁড়িয়ে বাবাকে ছোটো ছেলের মতো কোলে তুলে নিতে দেখলো।

আর তারপর! তারপর আবার নবাবগঞ্জ। আবার আর-এক ছবি। শৈশবের স্মৃতিঘেরা আম জাম কাঁঠাল কলা বাগানের ছায়ায়

দাদুর বাড়ির সবুজ শ্যাওলা। পুরোনো দিনের গন্ধ-ছড়ানো, গন্ধ-জড়ানো মমতা। নির্জন, নীরব। কলকাতার কোলাহলময় জীবনের পরে প্রায় নিষ্প্রাণ নির্জীব। তা হোক। এই ভালো। বাবা যেখানে নেই সেখানে কোলাহলের কোনো মানে হয় না। চোখ জ্বালা করে। সুলেখার জীবনের অতো বড়ো একটা অংশ যেখানে খ'সে গেলো সেখানে আবার কলরোল কিসের ?

কলকাতা থেকে আসবার সময়ে যতো কষ্ট হয়েছিলো, একের পর এক জিনিসপত্রগুলো বিক্রি ক'রে ফেলতে দেখে যতো যন্ত্রণা হয়েছিলো নবাবগঞ্জের শান্ত পরিবেশে এসে তেমনি ঠাণ্ডা হ'য়ে গিয়েছিলো মনটা। জ্যাঠামশায় ভালো ব্যবহার করেছিলেন, জ্যাঠাইমা আদর করেছিলেন, ভাইবোনেরা খুশি হয়েছিলো। শোকের আগুনটা প্রশমিত হয়েছিলো একটু।

ক্ষণিক। একেবারেই ক্ষণিক। তারপরেই সুলেখা টের পেলো পুরোনো দিনের সঙ্গে নতুন দিনের কোনো মিল নেই, পুরোনো ছবি পোকায় কেটেছে, নতুন ছবিতে রং নেই। দাদু ছিলেন দাদু নেই, ঠাকুমা ছিলেন ঠাকুমা নেই, এমনকি আজন্মের পুরোনো চাকর গোবিন্দদা পর্যন্ত নেই। ভুলু কুকুরটা বুড়ো হ'য়ে ঘেয়ো হ'য়ে গেছে, সবাই দূর-দূর করে। মতি গাড়োয়ানের ছোটো ছেলেটা ঘাস কাটতে এসে গান করতো, খেলা করতো, পুকুরের জলে ভাঙা হাঁড়ির টুকরো দিয়ে ব্যাং ভাসাতো, সে ম'রে গেছে। বুড়ো মালি বনমালীদা কাজ ছেড়ে দিয়ে কোথায় চ'লে গেছে। তার কালো পাথরের মতো আট মাসের মোটা ছেলেটাকে কতো কোলে নিতো সুলেখা।

আরো যে কতো-কিছু ছিলো কতো-কিছু নেই তার হিসেবও নেই। ছোট্টো সুলেখার যতো-কিছু মনোমতো ছিলো কিছুই তার অবশিষ্ট নেই

এই বাড়িতে। এমনকি ঘরগুলো পর্যন্ত ওলটপালট করা হ'য়ে গেছে। পুবের বড়ো ঘরে, যে-ঘরে দাদু-ঠাকুমা থাকতেন, সেখানে এখন জ্যাঠা-মশায়-জ্যাঠাইমা থাকেন, কিন্তু দাদু-ঠাকুমার মতো ক'রে সাজানো নেই সে-ঘর। মস্ত একটা খাটে ঘুমুতেন তাঁরা, সে-খাটটা নেই। পৃথিবীর সব-চেয়ে সুন্দর খাট, সুন্দর শয্যা। কতো ভালোবাসা, ভালো লাগার উজ্জ্বল প্রতীক। সে-খাটে দাদু আর ঠাকুমার মাঝখানে শুয়ে কতোদিন ঘুমিয়েছে সুলেখা। কতো সুখস্বপ্ন দেখেছে। কতো গল্প শুনেছে ঠাকুমার মুখে, কতো গল্প বুনেছে মনে-মনে। গরমের দিনে দাদু তালপাতার পাখার বাতাসে ঠাণ্ডা রেখেছেন তাকে, শীতের দিনে বুকের উত্তাপে উষ্ণ রেখেছেন। ঠাকুমা পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে-দিতে গুনগুন করেছেন, 'কৃষ্ণ ভজিবার তরে সংসারেতে আইনু, বৃথা মায়ায় বদ্ধ হ'য়ে বৃক্ষ সম হইনু—'

টান-টান ক'রে বিছানা পাততেন ঠাকুমা। মা পেতে দিতে চাইতেন, ঠাকুমা দিতেন না। ওটা তাঁর নিজের হাতে করা চাই। সুলেখা ছোটো-ছোটো হাতে সাহায্য করতো, এদিকে ধরতো তো ওদিকে সরতো, ওদিকে ধরতো তো এদিকে সরতো। তার অপটু অক্ষম চেষ্টা দেখে ঠাকুমার কী হাসি। যেন এর চেয়ে আহ্লাদের কিছু আর নেই বিশ্ব-সংসারে। আর খাটটা কী প্রকাণ্ড ছিলো! কী শক্ত আর কী বলিষ্ঠ! পায়া এতো মোটা যে দু-হাতে জড়ানো যেতো না। অনেক দিন চেষ্টা ক'রে দেখেছে সুলেখা। গোল-গোল থাম ছিলো চারদিকে, তার ভেতর থেকে চারটে ডাণ্ডা কর্ক-স্ক্রুর মতো পাকিয়ে-পাকিয়ে চারটে ছ' ফুট লম্বা সৈনিকের মতো উঠে গেছে উপরে। সেখানে বুড়ো নখের ভর দিয়ে উঁচু হ'য়ে মশারি টাঙাতেন ঠাকুমা। মাঝ-রাত্তিরে উঠে আবার লণ্ঠন ভেতরে নিয়ে কোনো-কোনো দিন মশা মারতেন দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে। দুই হাতে চটপট শব্দ হ'তো, সুলেখার ভালো লাগতো দেখতে। সে-ও উড়ন্ত মশাকে

বাগে আনবার চেষ্টায় ছুটোছুটি করতো বিছানাময়, বালিশ-টালিশ মাড়িয়ে একাকার। দাদু ছোট্টো স্থলেখাকে কোলে ক'রে তুলে নিতেন খাটে, তা নইলে সে উঠতে পারতো না এতো উঁচু ছিলো খাটটা। খাটের তলায় একটা প্রমাণ-মানুষ বোধ হয় ব'সে থাকতে পারতো মাথা উঁচু ক'রে। ভুড়ুক-ভুড়ুক তামাক টানতে-টানতে দাদু অরুণবরন কিরণমালার গল্প বলতেন, নয়তো সাত রাজার ধন এক মানিকের।

॥ পাঁচ ॥

জ্যাঠাইমার বড়ো-মেয়ে পুনিদি বললেন, 'বাব্বা, তুই আবার সেই বিকট আলিসান খাটটার কথা জিজ্ঞেস করছিস? জঘন্য একটা পদার্থ। মা ওটাকে কবে বেচে দিয়েছেন। এখন ওটাতে দয়াল ভুঁইমালি শুচ্ছে তার বউ-ছেলে নিয়ে।'

'বেচে দিয়েছেন!' দুই চোখে যেন মেঘ ঘনিয়ে এলো স্থলেখার।

পুনি ঠোঁট বাঁকিয়ে বললো, 'বেঁচেছি। ঘরটা একেবারে জুড়ে ছিলো। কী পছন্দই ছিলো বাপু আগেকার দিনের লোকদের। মাগ্‌গো। ওটা নাকি আবার দাদুর বিয়ের খাট ছিলো।'

হতাশায় ডুবে গেলো স্থলেখা। চোখ ছলছলে হ'য়ে উঠলো। দাদু-ঠাকুমাকে তবে এ-বাড়ি থেকে নিশ্চিহ্ন ক'রে দিয়েছে ওরা?

তা দিয়েছে। শুধু দাদু-ঠাকুমাকে কেন, তার বাবাকেও। কয়েক দিনের মধ্যেই স্থলেখা বুঝতে পারলো, স্থপ্রকাশ তালুকদার নামক কোনো মানুষ কোনোদিন যে জীবিত ছিলেন, এ-বাড়িতে তাঁরও যে সমান দখল ছিলো, এ-কথাটাই মানতে চাইছে না কেউ। মানলেই বিপদ। তিনি না-থাকুন, তাঁর স্ত্রী তো আছেন। সন্তানরা তো আছে। স্থলেখা

ভালো ক'রেই জানলো, সেই সুপ্রকাশ তালুকদারের অতীত অস্তিত্বের চিহ্নস্বরূপ তাদের চারটি প্রাণীর বর্তমান অস্তিত্বটাও এ-বাড়িতে অত্যন্ত অবাঞ্ছিত।

বাবার জন্য নতুন ক'রে শোক উথলে উঠলো তার। সারাটা রাত সেদিন কাঁদলো সে। সারাটা দিন গুম হ'য়ে রইলো। তার তেরো বছরের কিশোরী হৃদয় আবার অনুভব করলো, নিষ্ঠুর— নিষ্ঠুর এই পৃথিবী। আসলে সুখে থাকাটা আকস্মিক, দুঃখটাই সব।

বাড়িটা পুরোনো ধরনের। বুক-সমান-উঁচু প্লিন্থ। একতলাতেই সব, দোতলায় মাত্র একখানা ঘর। ঘরখানা সামনের দিকে, পেছনে কার্নিশ-তোলা বিরাট ছাদ। এক কোণে ছোট্টো একটি চিলেকুঠিতে ঠাকুর-ঘর। কোণের দিকে বড়ো বাঁধানো চৌবাচ্চা একটি, সারা বছরের ঘুঁটে-কয়লা জমা থাকে। বর্ষার দিনে ঢাকা থাকে তক্তা দিয়ে।

দোতলার এই ঘরটা বলতে গেলে বাবার জন্যেই তৈরি করিয়েছিলেন দাদু। সারা বাড়ির গোলমাল থেকে আলাদা হ'য়ে নির্জনে পড়াশুনো করতেন তিনি। চার ভাইবোনের মধ্যে বাবাই সবচেয়ে ছোটো, হয়তো বা ছোটো ব'লেই দাদুর কাছে সবচেয়ে প্রিয় ছিলেন। অবিশ্যি প্রিয় হবার যোগ্যতাও ছিলো তাঁর। দাদুর সব সন্তানের সেরা সন্তান। বিদ্যায়, বিনয়ে, ভদ্রতায়, ভব্যতায় দশজনের একজন। এক ডাকে সবাই চিনতো তাঁকে, সবাই ভালোবাসতো, শ্রদ্ধা করতো। দাদুর কতো গৌরব ছিলো তাতে। কতো আনন্দ ছিলো। বড়ো ছেলেকে দিয়ে যতো হতাশ হয়েছিলেন, সব হতাশা বাবা একাই সার্থক করেছিলেন।

ইস্কুল-কলেজেও যেমন সম্মান বজায় রেখেছেন, চাকুরিক্ষেত্রেও সেই সম্মান তাঁর অক্ষুণ্ণ ছিলো। একজন সাধারণ বাঙালি ভদ্রলোকের তুলনায় বেশ বড়ো চাকরিই তিনি করতেন। জীবনযাপনের ধারণা স্পষ্ট ছিলো

তাঁর। তিনি ভালোভাবে থাকতে জানতেন, ভালো পোশাক পরতেন, ভালো খেতেন। ছেলেমেয়েদের সেভাবেই মানুষ করছিলেন তিনি।

জ্যাঠামশায়ের শৈশব কেটেছিলো গ্রামে। ছাত্র অবস্থাতেই দাদু বিয়ে করেছিলেন, ওকালতি পাশ করবার আগেই জ্যাঠামশায়ের জন্ম। গ্রাম থেকে শহরে এসে ওকালতিতে বসবার পরের বছর বড়ো পিসি জন্মালেন। একটু পসার হ'তে-হ'তে এলেন ছোটো পিসি। আর বাবা জন্মালেন বাসাবাড়ি ক'রে ঠাকুমাকে শহরে নিয়ে আসবার পরে। ততোদিনে জ্যাঠামশায়ের বয়স দশ পেরিয়ে গেছে, পিসিরাও কিছু শিশু নয়। লেখা-পড়ায় একেবারে মন ছিলো না জ্যাঠামশায়ের, দেশের দশটা বছর তো রোদে ঘুরে ঘুড়ি উড়িয়ে এর-ওর সঙ্গে খোঁচাখুঁচি ক'রে পরের বাগানের ফল চুরি ক'রে পরের পুকুরে মাছ ধ'রে কাটিয়েছেন, শহরের ধরাবাঁধা জীবনে এসেই মুশকিলে প'ড়ে গেলেন। দাদু ইস্কুলে ভর্তি ক'রে দিলেন, মাস্টার রেখে দিলেন, আর জ্যাঠামশায় বছর-বছর একই ক্লাশে থেকে বয়স বাড়াতে লাগলেন। তাই নিয়ে দাদু মাঝে-মাঝে রেগে যেতেন, কান ম'লে দিতেন, খেলাধুলো বন্ধ ক'রে দিতেন, তারপর আবার যে-কে-সেই।

ঠাকুমার মনে ভীষণ দুর্বলতা ছিলো তাই নিয়ে। ছেলে যে তাঁর ভালো নয়, বিদ্বান নয়, অনুপযুক্ত, সে-বিষয়ে কথা উঠলেই হয় চ'টে উঠতেন, নয় কৈফিয়ৎ দিতেন। ছোটো ছেলে নিয়ে দাদুর তৃপ্তিতেও তাঁর যেন কোথায় আঘাত লাগতো। বলতেন, 'ছেলেবেলাটা ও-রকম গ্রামে প'ড়ে না-থাকলে নিবুও কিছু খারাপ ছাত্র হ'তো না।' নিবু মানে নিবারণ। জ্যাঠামশায়ের নাম। দাদু বলতেন, 'সে-কথা ভেবেই শান্তি পাও মনে-মনে।'

'ঠাট্টার কথা নয়—' ঠাকুমা গম্ভীর মুখ ক'রে যে-কোনো একটা কাজ নিয়ে বসতেন মেঝেতে ; বোঝা যেতো, ছেড়ে কথা কইবেন না। হয়তো

অসমাপ্ত কাঁথায় ফুলের ফোঁড় তুলতেন, নয়তো তালপাতার পাখায় পাড় বাঁধাতেন, কিংবা সুপুরি কাটতেন।

দাদু কোমর-সমান-উঁচু খাটের বাজুতে হেলান দিয়ে পায়ের উপর পা তুলে ব'সে, ভুড়ুক-ভুড়ুক তামাক খেতে-খেতে উদাস গলায় জবাব দিতেন, 'আমার তো যতোদূর মনে পড়ে আমিও ঐ গ্রামেই শৈশব কাটিয়েছিলাম। ওখানকার ইস্কুল থেকেই এনট্রান্স পাশ করেছিলাম—'

ঠাকুমার হাতের কাজ দ্রুত হ'য়ে উঠতো, তর্কের গলায় বলতেন, 'ছিলো তো সৎমা, লেখাপড়া না-শিখলে বাপ তো আর খেতে দিতো না।'

স্ত্রীর এ-কথা শুনে দাদুর গোঁফের ফাঁকে হাসি উঁকি মারতো, অনেক-ক্ষণ তামাক টেনে আলগা ক'রে বলতেন, 'তা হ'লে দেখছি মা না-থাকাটা একরকম মন্দ নয়, আর-কিছু না হোক, ছেলেটা তো মানুষ হ'য়ে ওঠে?'

'তা তো ঠিকই। তা তো ঠিকই।' ভারি মুখ আরো ভারি হ'য়ে উঠতো ঠাকুমার, 'আমি মরলেই তো তোমার সুবিধে হ'তো বেশি তা আর জানিনে! কিন্তু যে-ছেলেটি নিয়ে এতো গর্ব, সে-ছেলেটিও আমারই। আমি না-থাকলে সে জন্মাতো না, এটা যেন মনে রাখে একজন।'

'তা ঠিক। তা ঠিক।' দাদু তৎক্ষণাৎ মাথা নেড়ে ন'ড়ে-চ'ড়ে বসেছেন, 'সেটা একটা মস্ত ক্ষতি হ'তো বটে। তবে আমার মনে হয়,' এই ব'লে চোখ ছোটো ক'রে যেন দারুণ একটা আবিষ্কার করেছেন, এ-রকম মুখের ভাব নিয়ে বলতেন, 'আমার মনে হয় কি জানো? আমি বেঁচে থাকলেই এই ছেলের জন্ম হওয়ার পক্ষে যথেষ্ট ছিলো। তার কারণ, বুদ্ধিটাতে তো ওর মাতৃকুলের কোনো দান নেই, সেটা নেহাৎই পৈতৃক—'

বাস্। আর বলতে হ'তো না। কাজকর্ম ঠেলে উঠে দাঁড়ালেন ঠাকুমা। বাপের-বাড়ি যাবার জন্য ঝপাঝপ গুছিয়ে ফেললেন ট্রাঙ্ক-বাক্স; নাকের জলে চোখের জলে অন্ধকার দেখলেন পৃথিবী।

'জানি, জানি, কথায় বলে ভাগ্যবানের বউ মরে, অভাগার ঘোড়া মরে। বাপের মতো আর-একটা কাঁচা মেয়েকে বিয়ে করতে না-পেরে যে মনে বড়ো দাগা লেগেছে, তা আর বলতে হবে না। আগে বলোনি কেন ? না-হয় বিষ খেয়ে মরতাম, গাবগাছে গলায় দড়ি দিতাম।'

'সেটা কি ভালো হ'তো ?' স্ত্রীর রাগ দেখে মুখ টিপে হাসতেন দাদু, 'পেত্নি-টেত্নি হ'য়ে থাকলে শেষটায় আমার ঘাড়েই তো ভর করতে ?'

আসলে দাদুর ভয়ানক খ্যাপানো স্বভাব ছিলো। একুশ বছর বয়সে একাদশী-ঠাকুমাকে বিয়ে করেছিলেন তিনি, তারপর থেকে সুখে-দুঃখে মিলনে-বিরহে নিরবচ্ছিন্ন প্রেমে জড়ানো জীবন। এ-ধরনের ঝগড়া তাঁদের চিরদিনের। স্বলেখার কিন্তু ভালো লাগতো এই দাম্পত্য কলহ। অযোগ্য ছেলেকে নিয়ে মায়ের মনের এই অদ্ভুত রক্ষণবৃত্তিটাও তার মনকে আলোড়িত করতো। খুবই ছোটো ছিলো সে তখন, প্রায় অবোধ, তবু মনে আছে দিনগুলো, ঘটনাগুলো। কেমন ক'রে যেন আটকে গেছে স্মৃতির কোঠায়।

দাদু সত্যিই পছন্দ করতেন না জ্যাঠামশায়কে। নেহাৎ সন্তান ব'লেই যেটুকু মমতা, তার বাইরে আর কিছু ছিলো না। আসলে সেটাই ছিলো ঠাকুমার এতো ক্ষোভের কারণ। তাঁর মায়ের প্রাণ, তিনি তো ভালো ব'লে ভালোবাসেন না, ছেলে ব'লেই ভালোবাসেন। স্বামীর এই অনাদর-অবহেলা তাঁর প্রাণে দাগা দিতো।

জ্যাঠামশায়ও অবশ্য পছন্দ করতেন না দাদুকে। পারতপক্ষে দাদুর সঙ্গে মুখোমুখি হতেন না। অল্প বয়সে বিয়ে হয়েছিলো, দাদুর অমতেই হয়েছিলো। ঠাকুমা নিজে দেখে-শুনে ঠিক করেছিলেন সব। বলেছিলেন, 'ঈশ্বরের দয়ায় টাকার তো তোমার অভাব নেই ? অমন মেয়ে-ধ'রে

লেখাপড়া করিয়ে লাভ কী? তার চেয়ে বিয়ে ক'রে ঘরসংসার করুক, দায়িত্বজ্ঞান হবে।'

তাই হোক। দাদু আর কথা বলেননি। শরীরের রক্ত-জল-করা অনেক অর্থ তিনি ঢেলেছিলেন ছেলের বিদ্যাশিক্ষার খাতে, এবার থামলেন। আর সেকালে কে-ই বা অতো মাথা ঘামিয়েছে পড়াশুনো নিয়ে। এন্ট্রান্স পাশ করলে ঢের, বি. এ. পাশ করলে তো দেখতে আসতো। কেবল দাদুরই কেমন একটা লেখাপড়া-লেখাপড়া বাই। তাই নিয়ে রাগ করতেন ঠাকুমা। অবশ্য নিজের স্বামী বিদ্বান ব'লে অহংকার তাঁর ষোল আনার জায়গায় আঠারো আনাই ছিলো।

ছেলের বিষয়ে বিফল হ'য়ে শেষে দাদু মেয়েদের নিয়ে পড়লেন। ভর্তি ক'রে দিলেন হাই স্কুলে, মাস্টার রেখে দিলেন ভালো দেখে, কিন্তু সে-সাধও তাঁর মিটলো না। চোদ্দ না-পুরতেই ঠাকুমা বিয়ে দিয়ে দিলেন। এ-সবই সুলেখার জন্মের বহু আগের ঘটনা, এ-সব গল্প শুনেছে সে। কিছু ঠাকুমার কাছে, কিছু পিসিদের কাছে, কিছু জ্যাঠাইমার কাছে, কিছু মা-র কাছে। যে যার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আলোচনা করেছে কথাগুলো, দল বেঁধে নিন্দে করেছে, আক্ষেপ করেছে, আবার শুধুমাত্র ঘটনা হিসেবেই বলেছে কেউ, আর সকলের সব বলা থেকে গল্পগুলো মনে-মনে সাজিয়ে নিয়েছে সুলেখা। সুলেখা যখন জন্মালো জ্যাঠামশায়ের চুলে তখন পাক ধরেছে, পাঁচ ছেলেমেয়ের বাপ, পিসিরা আধবয়সী, দাদু বৃদ্ধ হয়েছেন, আর ঠাকুমার পাকা মাথায় রাঙা সিঁথি। সুলেখা যে-বছর জন্মালো, ভুবন তালুকদারের সবচেয়ে সুসময় তখন। তাঁর পেশায় তখন তিনিই চরম। মা-বাবার কাছে কতোদিন সে-সব গল্প শুনেছে। সেই বছরই মস্ত এক মামলায় জিতিয়ে দিয়ে নবাব আমিরআলি-সাহেবের কাছ থেকে কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ কমলাপুরের এই আম জাম কাঁঠালের তিন-

বিঘা-জোড়া বাগানটি উপহার পেলেন। সেই প্রথম নবাব আমিরআলি তাদের বাড়িতে এলেন একদিন। তখন দাদু লক্ষ্মীবাজারে ভাড়া-বাড়িতে ছিলেন।

এই বাগান প্রথমে নবাব সাহাবুদ্দীনের ছিলো। আমিরআলি-সাহেবের বাবা। এইসব গাছ তাঁর নিজের হাতে পোঁতা। পুকুরটিও তিনিই কাটিয়েছিলেন। ভেবেছিলেন, নির্জনে একটি শ্বেতপাথরের মসজিদ বানিয়ে অবসর সময়ে এসে ধর্মচিন্তা করবেন, সংসারের জটিল আবর্ত থেকে নিজেকে ছিনিয়ে এনে এই শান্তিতে গা ঢেলে দেবেন। শেষ পর্যন্ত কিছু ইটপাটকেল গেঁথেই ছেড়ে দিয়েছিলেন, ইটালিয়ন মারবেল পর্যন্ত আর পৌঁছতে পারেননি। পর-পর কতগুলো দুর্ঘটনায় বিপর্যস্ত হ'য়ে মনের আশা-আকাঙ্ক্ষা তাঁর নিবে গিয়েছিলো। তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর উপযুক্ত পুত্র নবাব আমিরআলি যখন অধিকারী হলেন এই বাগানের, তাঁর মনেও পিতার অসমাপ্ত ইচ্ছেটিকে রূপ দেবার একটা অস্ফুট বাসনা ছিলো। তিনিও পারেননি। নবাবদের অবস্থা প'ড়ে এসেছে তখন, কাজে হাত দিলেই টাকা। আর তাঁরা হলেন খাশ নবাবের বংশধর, তাঁদের দিলই আলাদা। কোনো-কিছুতেই তাঁরা টানাটানি ভালোবাসেন না, অতএব একটি উৎকৃষ্ট মসজিদ বানাতে তার শিল্পচাতুর্যে যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে হয় তার হিসেবটি যতোবার চোখের সামনে তুলে ধরলেন, ততোবার থমকাতে হ'লো। শেষে এইভাবে সদ্গতি করলেন তার। বুক-সমান-উঁচু ভিৎটা ওদেরই তৈরি, কেবল দেয়াল তুলে ঘরগুলো দাদু করিয়ে নিলেন।

জ্যাঠামশায় লেখাপড়ায় অসফল হ'লেও বিষয়বুদ্ধিতে কিছু খাটো ছিলেন না। যতোদিন দাদু বেঁচে ছিলেন, ততোদিন খাওয়া-পরার ভাবনা ছিলো না কোনো, কোনো কর্ম না-ক'রেও ভালোই চলছিলো, কিন্তু

দাদু মারা যাবার পরেই মুশকিলে পড়লেন একটু। তারপরেই ঘাট-বাঁধানো মরা পুকুরটাকে ঠিকঠাক ক'রে মাছ ছেড়ে দিলেন, ফল-ফলারির গাছগুলো ইজারা দিয়ে দিলেন মণ্ডলদের কাছে। কিছু বুড়ো গাছ কেটে কাঠ বিক্রি ক'রে দু-পয়সা রোজগার হ'লো। পিছন দিকের জমিটা ফুল-বাগান উপড়ে দিয়ে খেত ক'রে দিলেন। জমি থেকেই প্রায় তাঁর খাওয়া-পরার সংস্থান হ'লো। বাবা চিঠি লিখে নিমগাছির জমিদারি সেরেস্তায় একটা কাজও জুটিয়ে দিলেন জ্যাঠামশায়কে, হিসেবের কাজ। জ্যাঠা-মশায়ের বিবেক ততো প্রবল ছিলো না, কাজেই সে-কাজে তাঁর মাইনের চেয়ে উপরি পাওনাই চারগুণ হ'লো। মোট কথা, বাবা লেখাপড়া শিখে এম. এ. পাশ ক'রে দশটা-পাঁচটা খেটে যা রোজগার করতে পারলেন, জ্যাঠামশায়ও ক্লাশ নাইন অবধি বিদ্যা ব'লে তার চেয়ে কিছু কম গেলেন না, বরং বেশিই হ'লো কিছু। কেননা জ্যাঠামশায়ের অধিক সন্তান, তাই বাবার কাছ থেকেও নিয়মিতভাবে নিতেন কিছু। উপরন্তু মা-র কাকা ততোদিনে নবাবগঞ্জ ছেড়ে বদলি হ'য়ে কলকাতা চ'লে আসাতে মা-র বাবার স্থরি লেনের বাড়িটার দেখাশুনোর ভারটাও জ্যাঠামশায়ের হাতে রইলো। ভাড়া দিয়ে দিলেন তিনি, কিন্তু সে-ভাড়া পুরোপুরি কোনো-দিনই মা-র হাতে পৌছতো না, প্রত্যেক মাসেই শোনা যেতো রিপেয়ারের খরচ বাবদ এতো টাকা লেগেছে, ততো টাকা গেছে।

শেষে মা আর ও-টাকা নিতেন না, ছেলেমেয়েদের ইস্কুলের খরচ বাবদ রেখে দিতে বলতেন। তা ছাড়া ভাড়াটেও নাকি প্রায়ই থাকতো না। সুতরাং ও নিয়ে আর মাথা ঘামিয়ে লাভ কি? ক'টাই বা টাকা।

বাবা যতোদিন বেঁচে ছিলেন, বছরে একবার ক'রে তাদের নিয়ে আসতেন এখানে। দশ-বারো দিন কাটিয়ে চ'লে যেতেন। দাদার সঙ্গে

বিরোধের প্রশ্ন ছিলো না কোনো। বরং জ্যাঠামশায় বাবাকে অতিরিক্ত যত্নই করতেন। বড়ো-বড়ো মাছ নিয়ে আসতেন, দুধ নিয়ে আসতেন, আনতেন টাটকা শাক-সবজি ফল-ফলারি। ক'টা দিন যেন ভোজ লেগে থাকতো। ফূর্তিও কম হ'তো না। বাবা সকলের টিকিট কেটে আনতেন, তারপর দল বেঁধে নবাবগঞ্জের নতুন সিনেমা-হাউসে নিয়ে গিয়ে সায়লেন্ট পিকচার দেখাতেন। কী রোমাঞ্চই না হ'তো। কোনো-কোনোদিন আশেপাশে বেড়াতে নিয়ে যেতেন ঘোড়ার গাড়ি ক'রে, নদীর ঘাটে গিয়ে নৌকো ভাড়া ক'রে বেড়াতেন। আবেদের বিখ্যাত বিস্কুটের দোকানে গিয়ে হরেক রকম বিস্কুট কিনতেন, গনি মিঞার পরোটার দোকান থেকে মাংস-পরোটা। মুসলমানের দোকান ব'লে জ্যাঠামশায়-জ্যাঠাইমা নাক সিঁটকোতেন, সাত হাত দূরে স'রে থাকতেন। বাবা জোর ক'রে ছেলেমেয়েদের খাওয়াতেন, নিজে খেতেন, মাকে চোখ টিপে ইশারা করতেন, মা ভাসুর আর জায়ের দৃষ্টান্ত অনুসরণ ক'রে প্রবল বেগে মাথা নেড়ে আপত্তি জানাতেন। সুতরাং হাঁড়িভর্তি প্রাণহরা, ক্ষীর-মোহন আর অমৃতিও মন্দ আসতো না। জ্যাঠাইমা-জ্যাঠামশায় প্রাণ ভ'রে খেতেন আর মা লজ্জায় সারা হ'য়ে যেতেন হাঁ ক'রে মুখে তুলতে। জ্যাঠাইমা বাবার জন্য কতো ভালোমন্দ রান্না করতেন নিজের হাতে, মা কপাল পর্যন্ত ঘোমটা টেনে ঘুরঘুর করতেন বড়ো জায়ের পিছনে-পিছনে। ভাসুরের যে-মুহূর্তে যা দরকার সব-কিছু ঠিকঠাক ক'রে খাড়া হ'য়ে থাকতেন একপায়ে। ছোটো বাচ্চাদের নাওয়াতেন, খাওয়াতেন, ঘুম পাড়াতেন, সারা দিন উচ্চকিত হ'য়ে নিরলসভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করতেন তাদের। জ্যাঠাইমা নিশ্চিন্তে শুয়ে-ব'সে হাঁপ ছেড়ে বাঁচতেন এদের দৌরাত্ম্য থেকে।

আর স্কুলেখারা? সব ভাইবোনেরা মিলে কী হুটোপুটিটাই না

করতো দিনরাত। দাদু-ঠাকুমা না-থাকার বিচ্ছেদ-বেদনাটা প্রায় ভুলে যেতো।

কিন্তু সব ছবিই পাল্টে গেলো বাবার মৃত্যুর পরে। তাই তো স্বাভাবিক। তাই তো যায়।

॥ ছয় ॥

বিধবা হবার পরে মা অনিয়মে অত্যাচারে শরীরটাকে একেবারে ক্ষতবিক্ষত ক'রে তুলেছিলেন। যেন অদৃষ্টের বিরুদ্ধে এটাই তাঁর মস্ত লড়াই। খেতেন না, শুতেন না, যখন-তখন স্নান করতেন, যখন-তখন অস্থির আবেগে বুকটা মাটির মধ্যে পেতে রেখে ভেসে যেতেন চোখের জলে। বারো বছরের সুলেখা চুপ ক'রে তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখতো সেই শোক। নিজের বুকটা থেমে থাকতো। কী করলে, কী বললে যে মা-র একটু শান্তি হবে, ভেবে পেতো না। জ্যাঠাইমাও সমানে হা-হুতাশ করতেন মা-র সঙ্গে, জ্যাঠামশায় মাথায় হাত দিয়ে ঝিমিয়ে ব'সে থাকতেন। যেন শোকে-দুঃখে কতোই কাতর। মা নিজেকে একেবারে বিকিয়ে দিলেন তাঁদের সেই সহানুভূতির কাছে, যত্নের কাছে। কিন্তু সুলেখার বালিকা-হৃদয়ের অন্ধকার ঠেলে-ঠেলে কী যেন একটা সংশয়ের কাঁটা বিঁধতে থাকলো ক্রমাগত। জ্যাঠাইমা মাকে নিয়ে নিরালা হ'লেই সে অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে সাবধানে তাকিয়ে থাকতো সেখানে গিয়ে, কী ভাবতো, কী দেখতো, নিজেও তা জানে না। শুধু জানতো এ-কান্না এঁদের মেকি, এ-আদরে এঁদের প্রাণ নেই কোনো। আর তার সেই সন্দেহ যে কতোটা সত্য সেটা জানতে তার পুরো দশটা বছর কেটে গেলো, এই দশটা বছর সুষমা দেবী মেয়ের কাছে ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ করলেন না সে-কথা। যখন বললেন

তখন আর উপায় ছিলো না কোনো। জ্যাঠামশায় চালাক মানুষ, জ্যাঠাইমা সংকীর্ণচেতা। দু-জনের স্বভাবের এই মিল হয়তো তাঁদের পক্ষে আশীর্বাদ হয়েছিলো, কিন্তু সুলেখারা তলিয়ে গেলো সংসার থেকে। সুপ্রকাশবাবুর সেখানকার যা এবং যতোটুকু ছিলো, সবটুকু শুষে নিলেন স্বামী-স্ত্রী। লাইফ-ইনশিওরের পলিসি থেকে গায়ের গয়নাগুলো পর্যন্ত। আর তারপরেই বদলে গেলো হাওয়া। সুলেখা চকিত হ'য়ে লক্ষ্য করলো, জ্যাঠামশায়-জ্যাঠাইমার মুখের মিষ্টি শুকিয়ে কাঠ। মা-র ভেজা চোখে ভয়ের ছায়া।

শোক-তাপ ভুলে তিনি সন্ত্রস্ত হ'য়ে উঠলেন। আর সুলেখা ভাবলো এই তো স্বাভাবিক, এতোদিনে মুখোশটা তবু খসলো। একরকম বাঁচা গেলো। আশ্রিত আর আশ্রয়দাতা, এ-রকম না-হ'লে মানাবে কেন? তবু যে কেন ভেতরে-ভেতরে তাপিত হ'য়ে ওঠে, কে জানে! নিজের ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে জ্যাঠাইমা যখন তাদের তিন ভাইবোনকে নির্লজ্জের মতো তফাৎ করেন, রাগে তার মুখ লাল হ'য়ে ওঠে। খেতে ব'সে নিজেদের থালা থেকে ওদের থালায় চোখ তুলে তাকাতে পারে না। একটি মাছের টুকরোকে তিন টুকরো ক'রে অত্যন্ত কৃতিত্বের সঙ্গে জ্যাঠাইমা ভাগ ক'রে দেন তাদের তিন ভাইবোনকে— কিন্তু তাঁর নিজের সন্তানদের প্রত্যেকের দু'খানা ক'রে মাছ না-হ'লে স্বাস্থ্য টেঁকে না। সুলেখা নিজের মাছের টুকরোটা সাপটে ফেলে দেয় থালা থেকে। আর কিছু নয়। অসম্মানের বেদনা। ঘেন্না করে ভাত খেতে।

বাবার মৃত্যুর পরে জ্যাঠামশায় নিজে গিয়েই কলকাতা থেকে নিয়ে এসেছিলেন তাদের। জ্যাঠাইমা তাঁর নিজের ঘরের পাশের বড়ো ঘরখানাতে থাকবার ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছিলেন। সুলেখা বলেছিলো,

'আমরা আমাদের উপরের ঘরে থাকবো না জ্যাঠাইমা?' জ্যাঠাইমা গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে বলেছিলেন, 'এখন কি আর তোর মা আমার কাছে-কাছে ছাড়া থাকতে পারে? না কি শোকার্ত মানুষটাকে আমিই অতোদূরে রাখতে পারি। ক'টা দিন যাক, একটু শান্ত হোক, তারপর না-হয় যাস। আর হারানের আবার পরীক্ষা সামনে, একা ঘরে নিরিবিলিতে পড়ছে পড়ুক এখন।' ব্যস্ত হ'য়ে মা বলেছিলেন, 'না না, ও-ঘরে হারানই থাকুক।'

বলেছিলেন বটে, কিন্তু সুলেখা জানে সেটা মা-র মনের কথা নয়। মা-র মন ও-ঘরেই প'ড়ে আছে। ওটা যে বাবার ঘর। বাবার স্মৃতিতে ভরা। ও-ঘরে বাবার ছাত্রজীবন কেটেছে। নতুন বিবাহিত জীবন কেটেছে, নতুন পিতৃত্বের আস্বাদও তিনি ও-ঘরে বাস ক'রেই উপভোগ করেছেন। ও-ঘরে মা-বাবার বিয়ের খাট পাতা আছে, টেবিল আছে, থাকে-থাকে বই সাজানো আছে দেয়াল-র‍্যাকে। সুপ্রকাশবাবু যতোদিন বেঁচে ছিলেন, ও-ঘর ছাড়া অন্য ঘর কল্পনাও করেননি তিনি। তা ছাড়া নির্দিষ্ট ঘর এ-বাড়িতে সকলেরই ছিলো। যেমন বাবার ছিলো, তেমনি জ্যাঠামশায়েরও ছিলো, দাদুরও ছিলো। বাবা যতোবার বেড়াতে এসেছেন দোতলায় নিজের ঘরে এসেই উঠেছেন, মৃত্যুর পরে তাঁর ঘর আর সুলেখাদের রইলো না। তা হোক, অভিযোগ করবার ছিলো না কিছু। দক্ষিণ-পশ্চিম-খোলা মস্ত ঘর। এ-ঘরটাতেই আগে জ্যাঠামশায়-জ্যাঠাইমা থাকতেন। এখন তাঁদের বড়ো দুই মেয়ে মণি-পুনিকে ছেড়ে দিয়ে নিজেরা গেছেন দাদুর ঘরে। জানালা ঘেঁষে তাদের দুই বোনের বিছানা, এদিকটায় তারা তিন ভাইবোন আর মা। হঠাৎ একদিন ইস্কুল থেকে ফিরে সুলেখা অবাক হ'য়ে দেখলো, সে-ঘরের বাস উঠেছে তাদের। উৎফুল্ল হ'য়ে উঠেছিলো, ভেবেছিলো এতোদিনে বুঝি স্বগৃহে থাকবার ব্যবস্থা

হয়েছে। লাফিয়ে উঠে গিয়েছিলো দোতলায়। কিন্তু নামতে হ'লো। অনেক নিচেই নামতে হ'লো। উত্তর কোণে তিন-দিক-বন্ধ ভাঁড়ারঘরের পাশের ছোট্টো একটি গুদমঘরে এসে হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকতে হ'লো। দুটো তক্তপোশ পেতে দরজার চৌকাঠ থেকে শুধু এক হাত ফালি জায়গা বাকি ছিলো সেই ঘরের। সেই জায়গাটুকুতেই মা-মেয়ে মুখোমুখি হ'লো। একটু হাসলেন সুষমা দেবী—'এই ভালো, বেশ একা এক কোণে, নির্জনে—'

সুলেখা মা-র মনের কথা বুঝলো, বুঝলো পাছে এ নিয়ে তার উদ্ধত অসভ্য মেয়ে কোনো গোলমাল করে, কোনো অশান্তি ডেকে আনে তাই এই স্তোকবাক্য। অদ্ভুত মানুষ। অদ্ভুত ভয়। এই অহেতুক ভয়েই তিনি গেলেন। মা-র উপর রাগ ক'রেই সুলেখা আর একটা কথাও বললো না। কী বলবে? তার কতোটুকু শক্তি? কতোটুকু অধিকার? কিন্তু ঘর বদলে দিয়েই জ্যাঠাইমা ক্ষান্ত দিলেন না, আসল ছবির যবনিকা উঠলো ঝি তুলে দেয়ার ব্যাপার নিয়ে। সেদিনও ইস্কুল থেকে ফিরেই ঘটনাটা দেখলো সুলেখা। বাসন-মাজা ঝি সদুর-মার সঙ্গে বচসাটা শুনে গিয়েছিলো, সদুর-মা জ্বর হ'য়ে কামাই করেছিলো দু-দিন, আর সে-অসুস্থতার ছাপ তার চেহারাতেই প্রকট ছিলো। রুক্ষ চুল, শুকনো মুখ, ব'সে-যাওয়া কালি-পড়া চোখ। তাতে কী! জ্যাঠাইমা বিশ্বাস করলেন না সে-কথা। করলেও ক্ষমা করলেন না। বললেন, 'ও-সব ঢং-ঢাং তোমাদের জানা আছে আমার। বাজে কথা রেখে দাও। সোজা কথা হচ্ছে আমার কাজ করতে হ'লে কামাই চলবে না।'

সদুর-মার ক্ষীণ গলা প্রায় কান্নায় পর্যবসিত হ'লো— 'দু-দিন একেবারে বেহুঁশ জ্বর ছিলো মা। মাথায় যে কী যন্ত্রণা—'

জ্যাঠাইমা রূঢ় গলায় চেঁচিয়ে উঠলেন, 'পরের দরজায় খেটে খাও,

অতো সোনা-বাঁধানো মাথা থাকলে চলবে কেন? যাও, খাট-পালঙ্কেই শুয়ে থাকো গিয়ে।'

কিন্তু সেই যাও-টা যে এই যাও, এটা সে কল্পনা করতে পারেনি। অধীনস্থ মানুষের উপর জ্যাঠাইমার এই নিষ্ঠুর ব্যবহারে একটা বেদনা-ভরা মন নিয়ে সে ইস্কুলে গিয়েছিলো। সদুর-মার জন্য যে-বেদনা, নিজের মা-র জন্য অবশ্যই তার চাইতে অনেক বেশি বেদনা অনুভব করলো, যখন বেলা চারটের পড়ন্ত রোদের তীব্র তাপে দেড় মাইল রাস্তা হেঁটে ইস্কুল থেকে ফিরে এসে দেখলো, মা একটা ভিজে গামছা মাথায় চাপিয়ে স্তূপীকৃত বাসন নিয়ে মাজতে বসেছেন। পায়ের শব্দে মুখ ফিরিয়ে মেয়ের রাগি মুখের দিকে তাকালেন তিনি।

সুলেখা বললো, 'তুমি বাসন মাজছো যে!'

'তুই এসে গিয়েছিস?' ভীত সন্ত্রস্ত চোখে তিনি চারদিকে তাকালেন।

'ঝি নেই?'

'দেখলিই তো সকালবেলা কেমন ঝগড়াঝাঁটি ক'রে চ'লে গেলো।'

'চ'লে গেলো না তুলে দিলেন?'

'তুলে আবার দিতে হয় নাকি আজকাল? যা মুখরা হয়েছে সব।'

মা-র কথা শুনে দীর্ঘশ্বাস ফেললো সুলেখা, বললো, 'তা হ'লে বাসন-মাজার কাজে এখন বুঝি তুমিই বহাল হ'লে?'

'আহা, এর আবার বহালের কী আছে। নিজেদের সংসারের কাজ নিজেরা করবো, তার মধ্যে—'

'এটা তো তোমার সংসার নয়।'

'কার তবে?'

'জ্যাঠামশায় আর জ্যাঠাইমার।'

'তাঁরা কি আমার পর ?'

'আপন যে নয় তার প্রমাণ তো রাতদিনই পাচ্ছো।'

সুষমা দেবী হাত ধুয়ে কাপড়ের আঁচলে হাত মুছলেন, 'চল, খেতে দিয়ে নিই।'

'এক-ডালা মুড়ি দেবার জন্যে বেশি তোড়জোড় না-করলেও চলবে। কিন্তু আমি ভাবছি লোকের তো একটা চক্ষুলজ্জাও থাকে। এতো বড়ো সংসারের রান্নাবান্নার ভার চাপিয়েও জ্যাঠাইমার আশা মিটলো না, এতোগুলো বাসন তোমাকে দিয়েই মাজতে বসালেন ?'

'কী আজেবাজে বকছিস। তোর স্বভাবই কেবল অশান্তি করা।'

'কী শান্তিতে আছো তুমি ?'

'তর্ক করিস না।'

'তর্ক তো দূরের কথা, দরকার হ'লে এ নিয়ে আমি আজ ঝগড়া করবো। তোমার সঙ্গেও করবো, ওদের সঙ্গেও করবো।'

ভাঁড়ারঘরে ব'সে জ্যাঠাইমা ছেলেমেয়েদের জন্য খাবার ঠিক করছিলেন। ইস্কুল থেকে সকলের আগে আসে বাবু আর ছোটু। ওরা পাড়ারই একটা ছোটো ইস্কুলে ভর্তি হয়েছে। তারপর আসে সুলেখা। সঙ্গে-সঙ্গেই আর-সব এসে পড়ে। সবাই থার্ড ট্রিপ গাড়িতে আসে ব'লে দেরি হয়। সুলেখাদের তিন ভাইবোনের জন্য এক-ডালা মুড়ি ধ'রে দেন জ্যাঠাইমা, কিন্তু তাঁর নিজের সন্তানদের অনেক ঝামেলা আছে খাওয়া-দাওয়া নিয়ে। বোধ হয় সব শুনেই তিনি বেরিয়ে এসে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়ালেন, 'কী বলছিস ?'

সুষমা দেবী জড়োসড়ো হ'য়ে গেলেন— 'না, না, কিছু না।'

সুলেখা উদ্ধত হ'য়ে বললো, 'সদুর-মা চ'লে গেছে ব'লে কি এখন থেকে বাসনগুলো আমার মাকেই মাজতে হবে ?'

সোজাসুজি প্রশ্নে একটু থমকে গেলেন জ্যাঠাইমা, তারপরেই গরম হ'য়ে বললেন, 'কেন, হাত ক্ষ'য়ে যাবে?'

'আর-সকলের যদি যায়, আমার মা-রই বা যাবে না কেন?'

সুষমা দেবী জ্যাঠাইমার হাত জড়িয়ে ধরলেন, 'ওর কথা আপনি নেবেন না দিদি।'

'থাম তুই,' জ্যাঠাইমা ঠেলে সরিয়ে দিলেন তাঁকে। 'আস্পর্ধা দিয়ে-দিয়ে তো মাথাটা তুই-ই খেয়েছিস। এখন আর গোড়া কেটে আগায় জল ঢালতে হবে না।'

কী বলবে সুলেখা, মায়ের ভীত আর্ত কাতর চেহারার দিকে তাকিয়ে সমস্ত প্রতিবাদ তার থেমে যায়।

'রেখে দে বাসন, কাউকে মাজতে হবে না। কেউ যেন আর এ-সংসারে তৃণটিও না নাড়ে। যদি ঘেন্নাপিত্তি ব'লে কিছু থাকে, তা হ'লে যেন এ-সংসারের অন্নও আর কেউ ধ্বংস না করে।'

ঝাপটা মেরে জ্যাঠাইমা আবার ভাঁড়ারঘরের দরজায় পা দিয়েছিলেন, তক্ষুনি ফিরে দাঁড়িয়ে বললেন, 'সকলেই খেটে·খায়, পায়ের উপর পা রেখে ব'সে-শুয়ে কারো দিন চলে না। ভাত এতো শস্তা নয়।'

ভাত। ভাত। ভাত। খাওয়া। খাওয়া। খাওয়া। দিনরাত জ্যাঠাইমার মুখের এই খোঁটা শুনতে-শুনতে শরীরে মনে যেন শলাকা বিদ্ধ হয় সুলেখার। ছুটে তার বেরিয়ে যেতে ইচ্ছে করে। গলায় কাপড় বেঁধে ফাঁসি লাগাতে ইচ্ছে করে, কুয়োর জলে ডুবে মরতে ইচ্ছে করে। রুদ্ধস্বরে সুষমা দেবী বললেন, 'তুই কি আমাকে রাস্তায় বার না-ক'রে ছাড়বি না?' বলতে-বলতে কেঁদে ফেলে আবার বাসন মাজতে বসলেন। আর মায়ের উপর রাগে আপাদমস্তক জ্ব'লে গেলো সুলেখার।

মায়ের মেরুদণ্ড নেই। চিরদিন কেবল সকলের পায়ের তলায় কাদা হ'য়েই কাটালেন। সেদিন স্থলেখার সত্যিই ম'রে যেতে ইচ্ছে করেছিলো। মায়ের উপর প্রতিশোধ নেবার জন্যই এই বাসনা হয়েছিলো তার। মনে হয়েছিলো শুধু জ্যাঠাইমার অপমান অসম্মান আর অন্যায় নয়, পৃথিবীর সব দুঃখ নেমে আসুক মানুষটার ভাগ্যে, তবু যদি কোনোদিন চোখ তুলে তাকায়, খাড়া হ'য়ে দাঁড়ায়, মুখ ফুটে দুটো প্রতিবাদের ভাষা শোনাতে পারে কাউকে। মনে-মনে প্রতিজ্ঞা করেছিলো সারা জীবনেও আর মা-র হ'য়ে কোনো কথা বলবে না সে। কারো হ'য়েই বলবে না, কিন্তু তার নিজের গায়ে যদি এককণা সর্ষে পরিমাণ অন্যায়ও ছিটকে এসে পড়ে, সে একবার দেখে নেবে এদের।

অবশ্য সেই প্রতিজ্ঞা সে রাখতে পারেনি। রাখা সম্ভব ছিলো না। কয়েকদিনের মধ্যেই প্রায় একটা খুনোখুনি হ'য়ে গেলো হারানদের সঙ্গে। দোতলার ঘর থেকে হারান জানালায় দাঁড়িয়ে আর-কাউকে হাতের কাছে না-পেয়ে তার কাকিমাকেই সিগারেট ধরাবার জন্য রান্না-ঘরের দেশলাইটা আর এক-গ্লাশ জল উপরে দিয়ে আসতে বলেছিলো। নিবারণবাবু খেতে বসেছিলেন, তাঁকে ভাত দিতে ব্যস্ত ছিলেন মা, হুকুমটা তখুনি তামিল করতে পারেননি তিনি। মেজাজ বিগড়ে গেলো হারানদার। লম্ফঝম্পের সীমা রইলো না। উপর থেকেই সে চেঁচিয়ে গালাগালি ক'রে পাড়া মাৎ করলো। জ্যাঠাইমা বললেন, 'জানিস তো বাপু ওর রাগ বেশি, কেনই বা কথাটা শুনলি না।' বলতে না বলতেই ঘর থেকে বেরিয়ে এলো স্থলেখা, ইস্কুলে যাচ্ছিলো, এক রাশি বই ছিলো বগলে, বোর্ড-বাঁধানো শক্ত ইংরিজি বইটা সে তৎক্ষণাৎ তাক ক'রে ছুঁড়ে মারলো উপর দিকে, শিক-ছাড়া জানালায় অর্ধেক দেহ বার-করা হারানের ঠিক বুকের মাঝখানটিতে গিয়ে লাগলো সেই আঘাত। বইটা আবার

ফিরে এলো নিচে। কুড়িয়ে নিতে-নিতে সুলেখা বললো, 'ফের আর একটা কথা যদি বলবে আমার মাকে, বঁটি দিয়ে কুপিয়ে দু-টুকরো ক'রে ফেলবো।'

'ওরে, বাপ রে মা রে, কী ডাকাত মেয়ে রে,' ব'লে আর্তনাদ ক'রে উঠলেন জ্যাঠাইমা। ইস্কুলে যাওয়া স্থগিত রেখে দুই চোখ ভরা আগুন নিয়ে থমকে শক্ত হ'য়ে ঘুরে দাঁড়ালো সুলেখা। লাফিয়ে নেমে এসেছিলো হারান, থেমে গেলো সেদিকে তাকিয়ে। পা থেকে মাথার চুল পর্যন্ত একটা দুর্দান্ত প্রতিবাদের প্রতিমূর্তি, উদ্যত দণ্ড। একটা কথা আর সেদিন বললো না কেউ।

॥ সাত ॥

কী করবে, তার স্বভাবটাই এ-রকম। এ-সব সে সইতে পারে না। মা-র মতো সহ্যগুণ নেই তার। অনেক চেষ্টা ক'রেও নিজেকে সংযত করতে পারে না। মেনে নিলেই যা চুকে যায়, তাতেও তার দেহের রক্ত গরম হ'য়ে ওঠে। তা যদি না হ'তো হয়তো জীবনের অনেক গ্লানি, অনেক দুঃখ, অনেক কটু কথা থেকে রেহাই পেতে পারতো সে। মা বলেন, অশান্তিই সে ভালোবাসে, তাই অশান্তিকে ডেকে আনে এভাবে। হয়তো সত্য কথা। সেবার পুজোর কাপড়চোপড় নিয়েই কি কম হাঙ্গামা করলো সে ? মা-র মতো চুপচাপ ঘাড় গুঁজে হাত পেতে নিলেই তো চুকে যেতো সব। পারলো কই ? কয়েক গজ মার্কিন আর একখানা খাপি চুয়াল্লিশ বহরের থান হাতে নিয়ে জ্যাঠাইমাকে দরজায় এসে দাঁড়াতে দেখেই লাল হ'য়ে গেলো চোখ। সুষমা দেবী সন্ত্রস্ত হ'য়ে উঠলেন, মেয়েকে আড়াল ক'রে হাসিমুখে এগিয়ে এলেন নিঃশব্দে।

সুলেখা জানে পুজোর কাপড়চোপড় মাত্র আজই আসেনি। এসেছে সাত দিন আগে পনেরো দিন ধ'রে। এটা পছন্দ হয়েছে তো ওটা হয়নি, ওটা হয়েছে তো সেটা ফেরৎ গেছে, এক জ্যাঠাইমার শাড়িই বদল হয়েছে চারবার। দিন তিনেক ঘোড়ার গাড়ি ভর্তি হ'য়ে ছেলেমেয়ে সবসুদ্ধ বেরিয়েছেন জ্যাঠামশায়-জ্যাঠাইমা। লক্ষ্মী বস্ত্রালয়ে গিয়ে গাঁট-ভর্তি কাপড় নিয়ে এসেছেন বাড়িতে বাছাই করতে। এরা সব দাদুর আমলের দোকানদার—খুশি হ'য়ে রাজ্যের কাপড় তুলে দিয়েছে গাড়িতে। জ্যাঠাইমার মেয়েরা সগর্বে সে-সব কথা শুনিয়েছে সুলেখাকে, কে কী শাড়ি নেবে তার তালিকা শুনিয়েছে। নতুন পোশাকের আনন্দ উত্তেজনায় ফেটে পড়েছে ভাইবোনেরা। বাবু ছোটু হাঁ ক'রে গিয়ে দাঁড়িয়ে থেকেছে জ্যাঠাইমার ঘরের দরজায়। সুলেখা ধমকে নিয়ে এসেছে ঘরে।

জ্যাঠাইমার তিন ছেলে চার মেয়ে। বড়ো ছেলে হারান আই. এ. ফেল ক'রে বহুদিন যাবৎ চাকরির চেষ্টা ক'রে বিফল হ'য়ে এখন শুয়ে-ব'সে দিন কাটাচ্ছে। বয়স চব্বিশ পেরিয়ে পঁচিশে পা দিয়েছে। জ্যাঠাইমার মনের গোপন বাসনা বেশ কিছু মোটা টাকা নগদ পেলে ছেলের বিয়ে দেন। তাই সতীশ ঘটকের নিত্য আনাগোনা। বড়ো মেয়ে পুনিদিও লেখাপড়ায় তথৈবচ। পিঠোপিঠি ভাইবোন, তেইশ পূর্ণ হ'তে চলেছে। কিন্তু দেখতে খুব ছোটো; বাচ্চা মেয়ের মতো। ক্লাশ টেন অবধি উঠে আর ডিঙোতে পারেনি। ইস্কুল ছেড়ে এখন সে-ও ঘরে বসেছে। জ্যাঠাইমা বলেন, প্রাইভেট ম্যাট্রিক দিচ্ছে। কয়েক বছর যাবৎই ব'লে আসছেন কথাটা, কিন্তু দেওয়া আর হচ্ছে না। মেজো মেয়ে মণিদিও সুলেখার চাইতে বছর চারেকের বড়ো, কিন্তু পড়ে একই ক্লাশে, আর দেখতেও ঠিক পুনিদির মতোই এইটুকু। জ্যাঠাইমা কর গুনে হিসেব

ক'রে বলেন, 'মণি আর লেখা তো একই বছরে জন্মেছে, কেবল মাস কয়েকের এদিক-ওদিক।' এ-কথা শুনে সুষমা দেবী কাজ করতে-করতে চোখ তুলে তাকান, তারপরেই আবার নামিয়ে নেন। অবশ্য অবিশ্বাস করবার কিছু নেই। একমাত্র হারানই এদের দেহের সকল মেদ শুষে নিয়ে একটা মস্ত কিছু হ'য়ে উঠেছে। চব্বিশ বছর বয়সেই তার শরীরে মাংসের পর্বত জ'মে উঠেছে। স্থলেখা বাড়ন্ত গড়নের, মাথায়ও অনেকটা লম্বা সে। জ্যাঠা-জেঠির অবহেলায় খুদকুঁড়ো খেয়েও সুস্থ সতেজ। দেখতে পুনির চেয়ে বড়ো ছাড়া ছোটো মনে হয় না। মেয়ের স্বাস্থ্যের দিকে তাকিয়ে বোধ হয় সুষমা দেবী কুণ্ঠিত হন। বোধ হয় মনে-মনে ভাবেন, মণি-পুনির মতো ছোটো হ'য়ে থাকলে ক্ষতি ছিলো কী? মেয়ে বড়ো হ'লেই জ্বালা। প্রথম জ্বালা তো আরম্ভই হ'য়ে গেছে, ফ্রকে কী লজ্জা আর ঢাকছে তার? অথচ ঘরে-ঘরে ওর মতো পনেরো-ষোল বছরের কতো মেয়ে দিব্যি বারো বছরের খুকি সেজে ঘুরে বেড়াচ্ছে। শাড়ি পরানো কি আজকাল সহজ কথা নাকি? দাম আছে না? স্থলেখার ছোটো দুটি ভাই অবশ্য সে-লজ্জা তাঁর ঢেকে দিয়েছে। তাদের দেহে কতকগুলো হাড় ছাড়া আর কিছুই নেই। স্থলেখা ছাতে নিয়ে গিয়ে দুই ভাইকে মুলার সাহেবের বই দেখে ব্যায়াম করায়। তাতে তাদের ঘর্মক্ষরণ ছাড়া আর-কিছুই লাভ হয় না।

মণিদির পরে জ্যাঠাইমার মেজো ছেলে বুলন। সে-ই ঠিক স্থলেখার সমান। মাথায়ও বড়ো। আসলে জ্যাঠাইমার ছেলেরা সব বয়সমতোই বেড়ে ওঠে, মেয়েরাই ছোটো। জ্যাঠাইমা বলেন, 'এই ভালো বাপু। মেয়েদের বাড় ভালোবাসি না আমি। অলক্ষীর মতো দেখায়। এখনই আমাকে এইরকম দেখছো, বয়সকালে আমিও ওদের মতোই ছয়ছোট্টো ছিলাম।' বুলনের পরে মেয়ে দুটি অবশ্য বেশ মোটাসোটা। পুঁটি আর

নাটু। একটির বয়স বারো। একটির দশ। তাতেও জ্যাঠাইমা অসুখী নন। লোক এলেই বলেন, 'এই তো ঠাকুরপোর ছেলে দুটি তো পুঁটি-নাটুরই সমান, বরং দু-চার মাসের বড়োই হবে, অথচ মনে হয় যেন শিলের তলার শুকনো লঙ্কা। ছোট্টোটি হ'য়ে দিব্যি ঘুরে বেড়াচ্ছে। লোকে বলে, ছেলেমেয়ে-ছেলেমেয়ে ক'রেই আপনি গেলেন। তা তোমরাই বলো, কষ্ট না-করলে কি আর কেষ্ট মেলে ? নিজের সুখদুঃখ ভুলে দেহ-পাত ক'রে সন্তানদের দেখবো, তবেই না মা। আর তবেই না এমন স্বাস্থ্য হবে। তাই তো সুষমাকে বলি, জ্যাঠা তো প্রাণপাত ক'রে কতোই খাওয়াচ্ছে, কিন্তু তুই নিজে যদি যত্ন না নিস তবে কি কিছু হবে ? শুয়ে-ব'সে দিন কাটিয়ে লাভই বা কী ?' মা-র সামনেই বলেন এ-সব কথা। মা প্রতিবাদ করেন না। এমনকি মুখ ফুটে এই সত্য কথাটাও বলতে পারেন না যে, পুঁটি-নাটুর চাইতে ওরা দু-জনেই অনেক ছোটো। ছোটুর এখনো ন' পোরেনি, বাবুর মাত্র সাত। বাবু জ্যাঠাইমার সব-চেয়ে ছোটো ছেলে ঝুলনের সমান। এখনো যে-ছেলে রাতদিন কাঁদে, রাত্তিরে ন্যাংটো হ'য়ে ঘুমোয়, দিনের বেলা ইচ্ছে হ'লেই বাপ-মায়ের কোলে ওঠে। কিন্তু ছোটো ব'লে এখনো সে-ছেলেকে জ্যাঠাইমা অক্ষর-পরিচয় করাননি।

রাগে বিদ্বেষে জ্বলতে থাকে সুলেখা। দুই ভুরু এক ক'রে আকাশের দিকে তাকায়। কেন তাকায়, কাকে খোঁজে, কী ভাবে কিছু জানে না। হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে মায়ের উপর, 'জ্যাঠাইমা এতো মিথ্যে কথা বলেন কেন ?'

কেন বলেন তা কী ক'রে জানবেন সুষমা দেবী। মেয়ের দিকে তাকিয়ে থেকে শান্ত গলায় জবাব দেন, 'বলুন না, কী হয় তাতে।'

রেগে যায় সুলেখা, 'ব'লে দিয়ো, ও-রকম যেন আর না বলেন।'

সুষমা দেবীর রক্ত তেমনি ঠাণ্ডা, 'কী বলেন ?'

'শুঁটকো মেয়েগুলোকে বলেন এই ভালো, মোটকা ছেলেগুলোকে বলেন এই ভালো। তাঁর নিজের যা সব ভালো। মণিদি কোন সুবাদে আমার সমান হয় শুনি ? আর বুলনকে বলেন আমার চেয়ে দেড় বছরের ছোটো। পুঁটি-নাটু কবে বাবু-ছোটুর সমান হ'লো ?'

'বয়েস নিয়ে দিদির ভুল হয়।' বিছানায় চাদর বিছোতে-বিছোতে, কি ঘর ঝাঁট দিতে-দিতে উদাস গলায় জবাব দেন সুষমা দেবী। চারদিকে তাকিয়ে বলেন, 'এ-সব কথায় কান দিস কেন ? তুই পড়তে বসেছিস, পড়।'

মা কি মানুষ না আর-কিছু ? মা-র প্রাণশক্তি কি বাবার সঙ্গে-সঙ্গেই নিবে গেছে ? ভেবে পায় না সুলেখা, কী ক'রে এমন স্থির হ'য়ে থাকতে পারেন তিনি।

সুষমা দেবীর যতোটুকু অস্থিরতা, জীবনের যতোটুকু ঢেউ সব বোধ হয় তার একমাত্র মেয়েকে কিছু শাসন করবার জন্যই সঞ্চিত আছে। সব সময়েই তাকে বোঝাচ্ছেন এটা করে না, ওটা করে না, এটা মানতে হয়, পরের সংসারে থাকতে গেলে সইতে হয়। আসল কথা, চুপ ক'রে থাকতে হয় সব-কিছুতে।

জ্যাঠাইমার হাত থেকে কাপড়গুলো এনে তিনি বিছানার উপর রাখতে-রাখতে আর-এক পশলা উপদেশের শিলাবৃষ্টি করতে যাচ্ছিলেন, সুলেখা অবকাশ দিলো না, পলকে সেগুলো তুলে নিয়ে দ্রুত বেরিয়ে গেলো, সোজা জ্যাঠাইমার ঘরে। দুপুরের খাওয়া-দাওয়া মিটেছে, এবার ঘুমোবার পালা। পুজোর ছুটি হ'য়ে যাওয়ায় বেলা হয়েছে অনেক, জ্যাঠাইমা ক্লান্ত হয়েছেন। গুছিয়ে শুতে যাচ্ছিলেন, সুলেখার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কী এগুলো ?'

'পুজোর কাপড়।'

'ওগুলো তো তোদের।'

'আমাদের লাগবে না।'

অবহিত হলেন জ্যাঠাইমা, চুপ ক'রে থেকে বললেন, 'কেন, খুব বড়োলোক হয়েছিস বুঝি!'

'বড়োলোক হ'লে কি আর এ-সব কাপড় দিতেন?'

'কী দিতাম তবে? সোনার শাড়ি?'

'আপনারা নিজেরা কি সোনার শাড়ি নিয়েছেন?'

'আমাদের সঙ্গে তোদের কী?'

'আপনার বাড়ির চাকর ফটিক-নিতাইয়ের সঙ্গেই বা আমাদের কী?'

'তাদের কথা উঠছে কিসে?'

'না-উঠলে কি কেউ তাদের সঙ্গে জোড়া মিলিয়ে নিজের ভাইয়ের স্ত্রীকে কাপড় কিনে দেয়? না কি তাদের জামার সঙ্গে মিলিয়ে আমাদের জামা দেয়।'

'ইশ। খুব যে তেজ দেখছি। এতো দাবি কিসের শুনি? তোর বাপ কি তোর জ্যাঠার কাছে জমিদারি রেখে গেছে?'

'বাবা না রাখুন—' মুখে-মুখে সমান উত্তর দিলো সুলেখা, 'দাদু তো রেখে গেছেন?'

'কী রেখে গেছেন?'

'কী না? এ-বাড়িতে আমরা নিজেদের অধিকারেই থাকি, আর হিসেব করলে খাবার খরচও জ্যাঠামশায়ের ভাগে পড়ে না। অতো বড়ো পুকুরের অতোগুলো মাছ যায় কোথায়? অতোগুলো নারকেল, সুপুরি, আম—'

সুষমা দেবী এসে মুখ চেপে ধরলেন,— ছি ছি ছি, এতোটুকু মেয়ের

মুখে এমন শরিকানি কথা? এ-সব কথা ওর মনে এলো কী ক'রে? লজ্জায় দুঃখে ম'রে গেলেন তিনি। আর জ্যাঠাইমা রাগে একটা হুলো বেড়ালের মতো ফুলে উঠলেন। ঠাশ ক'রে চড় মারলেন একটা। স্বলেখার স্বাস্থ্যপুষ্ট মসৃণ গালে চড়টা পাঁচ আঙুলের দাগ নিয়ে একটি স্পষ্ট ছবি হ'য়ে ফুটে উঠলো। কিন্তু তাতে তাঁর ক্রোধ নিবৃত্ত হ'লো না। আত্মহারা হ'য়ে স্বলেখার পিঠভরা কালো চুলের গোছা টেনে ধরলেন দূর থেকে, প্রচণ্ড জোরে একটা পাক দিয়ে প্রায় উপড়ে আনলেন মাংস। দাঁতে দাঁত ঘ'ষে বললেন, 'বেরো, বেরো বাড়ি থেকে, মামলা ক'রে তারপর ঢুকিস। দেখবো কোন সোদর এসে তোকে বাড়ির অংশ দেয়।'

চড়-খাওয়া গালে, মুঠি-ধরা চুলে, কম্পিত রক্তিম মুখে লোহার পুতুলের মতো শক্ত হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলো স্বলেখা। মজা দেখতে ছুটে এলো সব। পুঁটি, নাটু, মণি, পুনি, ঝুলন, বুলন সব। চাকররাও বাদ গেলো না। বাড়ির ছোটো বেড়ালছানাটা পর্যন্ত তার নীল চোখ তুলে তাকিয়ে রইলো।

এই জীবন। যতোদূর চোখ যায়, পিছন ফিরে তাকালে এই দেখতে পায় স্বলেখা। পৃথিবীটা কুৎসিত, কদর্য, নোংরা আর পঙ্কিল। এ-সংসারে কিছু ভালো নয়। কেউ ভালো না। এইভাবে, এই একইভাবে পুরো বাইশটা বছর কেটে গেছে তার। ক'টা দিন শান্তিতে ছিলো, স্বস্তিতে ছিলো; কর গুনে ব'লে দিতে পারে। কিন্তু তবু ম'রে যায়নি। না দেহে, না মনে। অহংকার এতোটুকু কমেনি। জাতসাপের কোমর ভেঙেছে তবু ফণা তুলতে ছাড়েনি। একদিকে মা যেমন সর্বদাই একটা ভীরু শশকের ত্রাস নিয়ে আছেন, আর-একদিকে সে আছে বাঘের আক্রোশ নিয়ে, জলন্ত আগুনের জ্বালা নিয়ে।

কিন্তু কেন এই জেদ ? কী লাভ হয়েছে তাতে। দুঃখই বেড়েছে। বাবার মৃত্যুর পর এই যন্ত্রণা থেকে একদিনও জিরোতে পারেনি। তারপর শেষ পর্যন্ত এই নরকে এসে পৌঁছতে হ'লো। তুলনা করলে এটার চেয়ে সেটাই কি ভালো ছিলো না ? না কি নরকের কোনো স্তর-ভেদ নেই। সব নরকই সমান কুৎসিত ? কার থেকে কে ভালো ? জ্যাঠাইমার সেই পুলিশ ভ্রাতুষ্পুত্র, না এই পাষণ্ড-প্রধান সুলতান-সাহেব। যদি এমন হ'তো— সেই লোকটাকে সে বিয়ে করতো জ্যাঠাইমার কথা-মতো তা হ'লে কি এর চেয়ে ভালো হ'তো কিছু ? এই প্রবঞ্চক প্রতারক ধূর্ত প্রণয়ীর কবল থেকে সেই মূর্খ, নির্বোধ, চরিত্রহীন স্বামীই কি শ্রেয় ছিলো ? কী ? কী ? সবচেয়ে ভালো হ'তো না-জন্মালে। ম'রে গেলে। এই ভবসংসারে কতোটুকু তার মূল্য ? কতোটুকু সার্থকতা। সে দেখতে সুন্দর নয়, তার স্বভাব নম্র নয়, কাউকে সে ভালোবাসে না। তাকেও কেউ ভালোবাসে না। কেবল বড়ো হ'তে-হ'তে অবিশ্রান্ত আত্মসম্মান-বোধে ঘা খেয়ে-খেয়ে ক্ষতবিক্ষত হয়েছে। যেটা অন্যায় তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে-করতে ক্লান্ত হয়েছে। কিন্তু পাষাণ-ভার কি এতোটুকু হেলেছে তাতে ?

জ্যাঠামশায়ের সংসারে মা ছিলেন দাসী, আর তারা ছিলো তাঁর সন্তান। প্রত্যেক দিনের ভার প্রত্যহ যন্ত্রণা দিয়েছে। এই তো অবস্থা। অসহ্য। অসহ্য। সবচেয়ে অসহ্য ছিলো লোক এলেই জ্যাঠাইমার কাঁদুনি। 'নিজের শখ সাধ ব'লে কিছু কি রেখেছি দিদি। পরার্থেই সব জলাঞ্জলি। তোমরাই বুঝে দ্যাখো, আপন সংসার, দেওরের সংসার সব মিলিয়ে তো কমসম কিছু নয় ? এতোটিকে খাইয়ে-পরিয়ে আর কী থাকে ?' তারপর বুকে টোকা মেরে প্রায় চ্যালেঞ্জ করেছেন— 'আর কেউ করুক তো আমার মতো, দেখবো কেমন বাপের বেটি। নিজের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে

এতোটুকু তফাৎ করি না। বরং ওদের বাপ নেই ব'লে ঘন দুধটুকু, বড়ো মাছের পেটিটুকু ওদের পাতেই ঢেলে দি।' শুনতে-শুনতে হাত-পা ঠাণ্ডা হ'য়ে এসেছে সুলেখার। কিন্তু জ্যাঠাইমা সেখানেই থামেননি, মাথা নেড়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলেছেন, 'মা হ'য়ে নিজের মুখে বলা শোভা পায় না, ছেলেমেয়েরাই কি আমার কম ভালো? ডালভাত খেয়ে উঠে চ'লে যাবে, টুঁ শব্দটি করবে না। মণি পুনি কি সাধে এতো রোগা? খায় কী, বলো? কথায় বলে, ভাগের মা গঙ্গা পায় না। তার উপরে বিধবা জা, অল্প বয়স, খেতে-টেতে একটু বেশিই ভালোবাসে। যেমন মাছ খায় না, দুধে ফলেতে আমার সেটুকু পুষিয়ে দিতে হয়। আর ঐ যে একখানা মেয়ে— বাব্বা—'

সুষমা দেবী চলতে-ফিরতে দু-চারটে কথা কানে গেলেই স'রে গেছেন তাড়াতাড়ি। এতো মিথ্যে শুনতে বোধ হয় লজ্জা করেছে তাঁর। নিজের জন্য যতোটা কষ্ট হয়েছে, যিনি বলেছেন তাঁর জন্য বোধ হয় বেশি যন্ত্রণা ভোগ করেছেন। কিন্তু জ্যাঠাইমার লজ্জা নেই।

আবার সতেজে বলেছেন, 'মেয়ে তো নয় বিষ। কেউটে সাপের বাচ্চা। হ'তো আমার পেটের মেয়ে, গাল টিপে রক্ত বার করতুম, নুনজল খাইয়ে মেরে ফেলতুম, ধুতুরার বিচি বেটে খাওয়াতুম।' বলতে-বলতে জ্যাঠাইমা উত্তেজিত হ'য়ে উঠেছেন। মনের সমস্ত ইচ্ছে যেন রূপ নিয়েছে মুখের চেহারায়। মা-র মুখটা নীল হয়েছে শুনতে-শুনতে।

তারপর বিয়ে। নিজের মেয়েদের কথা না-ভেবে দেওরের মেয়ের কথাটাই ভাবলেন আগে। তা তো ভাববেনই। কর্তব্য আছে না?

'তোরা তো ভাবিস—' জায়ের কাছে বসলেন তিনি গা এলিয়ে, 'আমি বুঝি কেবল নিজেরটাই দেখি। তা নয়। বুঝিস না তো পরের দায়

ঘাড়ে থাকার কতো জ্বালা। বলবার বেলা তো লোকে ছেড়ে কথা কইবে না। বলবে বাপ না-হয় না-ই ছিলো, জ্যাঠা-জেঠিরও কি চোখ নেই গা? আর যা বাড়ন্ত গড়ন তোমার মেয়ের। তা পাত্রও তেমনি সুস্থ-সমর্থ। কী বলিস?'

কী বলবেন। কবে কী বলেছেন মা যে এখনি কিছু বলতে হবে তাঁকে? নিঃশব্দে মাথা নেড়েছেন। বিশদ বিবরণ দিয়েছেন জ্যাঠাইমা, 'পাত্র তোমার গিয়ে খুবই ভালো। ছোটোবেলায় পুলিশে ঢুকেছিলো, এখন তো একেবারে পাকা চাকরি। এতোদিন যে কেন বিয়ে করেনি তাই ভাবি। তোর মেয়ের জন্যই বোধ হয় হাত-পা ধুয়ে ব'সে ছিলো।' এটা জ্যাঠাইমার রসিকতা।

মা চুপ।

নিজের রসিকতায় নিজেই হাসলেন তিনি। —'তা নইলে বয়স তো গজেনের কিছু কম হয়নি। ধর গিয়ে আমার মেজো খুড়ির সেজো বোনের যখন সাধ হ'লো কাসুন্দিগ্রামে তখন দারুণ হৈচৈ। কী? না, গাঁয়ের মোড়ল রতন নন্দীর এক ছেলে হয়েছে বাবা গজেশ্বরের দরজায় হত্যা দিয়ে। বটতলার বাবা গজেশ্বর সেখানে এক বিখ্যাত দেবতা। দারুণ জাগ্রত। নইলে রতন নন্দীর বউয়ের যে আবার ছেলে হবে ভাবতে পেরেছিলো কেউ? আমি তো সবই জানি। মেজো খুড়ির সেজো বোন আবার সম্পর্কে আমার মামী হয় কিনা! রতন নন্দী হ'লো গিয়ে তাঁর জ্ঞাতি ভাসুর। সেই সুবাদে আমাদের কুটুম্ব। রতনদা ব'লে ডাকি। আমার বাপের-বাড়ির সঙ্গে ভাব-সাবও ছিলো যথেষ্ট। সর্বদাই আসা-যাওয়া দেখা-শোনা। একেবারে লাগোয়া গ্রাম। আমার বাপের-বাড়ির গ্রাম থেকে এক লগির খোঁচায় নৌকো গিয়ে এ-ঘাট থেকে ও-ঘাটে ভেড়ে। আমার তখন বিয়ে হয়নি, অবিশ্যি সেই বছরই হ'লো। রতনদা বললেন

"জানো তো, তোমার বউদির আবার বুড়ো বয়সে এক ছেলে হয়েছে ঠাকুরের দয়ায়। ছ' মাসে পা দিলো। তারিখ ফেলেছি, একটু লোকজন ডেকে দুটি দাঁতে ভাতে খাইয়ে দেবে। যখন এসেই পড়েছো, তখন আর ছাড়ছিনে।" মেজো খুড়ি অবিশ্যি অনেক ধানাই-পানাই করলেন। নিত্যি সম্বন্ধ আসছে তখন আমার। তাই বললেন, "পরের মেয়ে, ব'লে-ক'য়ে নিয়ে এসেছি দু-দিনের জন্য, কে কবে আবার দেখতে আসবে কে জানে, শেষে ফসকালে দোষের ভাগী হবো।" কার কথা কে শোনে। জোর ক'রে রেখে দিলেন। শেষে থাকলাম আর কি। কতো বাদ্যভাণ্ড, আলো, ফুল একেবারে ধুমধড়াক্কা ব্যাপার! মুখেভাতে ছেলের নাম হ'লো গজেন্দ্রনাথ। বাবা গজেশ্বরের দোর-ধরা ছেলে কিনা!'

'লেখার তুলনায় বড়ো হ'য়ে যাবে না একটু?' এতোক্ষণে মা-র মৃদু গলার একটি আতঙ্কিত প্রশ্ন।

'না না, বড়ো কেন হবে?' তৎক্ষণাৎ মাথা নেড়ে প্রতিবাদ করলেন জ্যাঠাইমা, 'বছর কুড়ি তফাৎ হবে হয়তো।'

'কুড়ি বছর!'

জ্যাঠাইমা মুখ ভার করলেন, 'তোদের বাপু কিছুতেই মন ওঠে না। কচি খোকাটি কোথায় পাবি শুনি? ছেলে সুন্দর হবে, বয়েস কম হবে, বংশ বড়ো হবে, তিন পাশ থাকবে, চাকরি ভালো করবে, বাপের লক্ষ টাকার সম্পত্তি থাকবে— এতো যদি চাও তা হ'লে বাপু মেয়েকে চির-কুমারী ক'রে রাখতে হবে। ঘটটা বুঝে তো ফলটা দিবি— না কী? মেয়ের দিকে তাকাবি তো? ঐ তো চেহারা, ঐ তো রং। আর নিজেদের অবস্থাটাও তো দেখবি?'

মা চুপ।

'আর তোমার মেয়ের বয়সও কিছু কম হয়নি। গজুর বয়স যা-ই

হোক, স্বাস্থ্য কী। একটা পঁচিশ বছরের ছেলেকে লুফতে পারে। কেবল চুলগুলোই যা টুপি প'রে উঠে গেছে।' একটু চুপ ক'রে থেকে, 'বেশ তো, দু-একদিনের মধ্যেই তো আসবে, দেখবি কথা আমার ঠিক কিনা।'

'আসবে ?'

'শোনো কথা। না-এলে মেয়ে দেখবে কেমন ক'রে ?'

'ও।' মা শিথিল ভঙ্গিতে জ্যাঠাইমার দিকে তাকালেন।

চোখ টান করলেন জ্যাঠাইমা, 'তোর যেন মন উঠছে না।'

'না, ভাবছিলাম লেখার পরীক্ষাটা—'

'ঐ তোদের পরীক্ষা। আরে বাপু মেয়ে মেয়েই। সে জজও হবে না, ব্যারিস্টারও হবে না, এগারো হাত শাড়ির কাছাও দিতে পারবে না। সেই বিয়েই করতে হবে, আর বছর-বছর ছেলেও বিয়োতে হবে।'

এর পরে মা একেবারে চুপ।

॥ আট ॥

আর তারপরে কোনো-এক দুপুরে এক কাঁদি মর্তমান কলা আর দুই হাঁড়ি রসগোল্লা নিয়ে 'কই, পিসি কই গো' ব'লে হাঁক ছাড়লেন গজেন্দ্রনাথ। হাঁকের চোটে রবিবারের বিশ্রাম ছুটে গেলো সকলের, সব গিয়ে হাজির হ'লো গেটের কাছে।

ভাবী বর তার ভারি শরীর নিয়ে ঘোড়ার গাড়ি থেকে নামলো। প্রথমটায় চিনতে পারেননি জ্যাঠাইমা। তারপরেই খুশি হ'য়ে উঠলেন, 'ও মা, গজু যে। কী ভাগ্যি! তবু পিসিকে মনে পড়লো এতোদিনে ? কুমিটোলা তো ছ' মাস যাবৎ বদলি হ'য়ে এসেছিস বাবা, একটা খবরও তো দিতে হয় ? না-হয় একদিন আসতিসই নিজে থেকে।'

হেঁহেঁ ক'রে হাসলো গজেন, হাত থেকে মর্তমান কলার কাঁদি নামিয়ে বললো, 'এই তো এলাম। ফুলের গন্ধেই ভ্রমর আসে। হেঁহেঁ।'

জবাব শুনে একটু অপ্রতিভ হলেন জ্যাঠাইমা, তক্ষুনি সে-কথা ছেড়ে তিনি কলার প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হলেন, 'ওরে বাবা, কতো বড়ো কলা। এমন কলা পেলি কোথায় ?'

'পেলাম ! বুঝলেন, এ হচ্ছে ঠ্যালার নাম বাবাজী। এ-সব হ'লো গিয়ে ভেটের জিনিস। রুলের গুঁতো আর বুটের ঠোক্করে সব বেরিয়ে এসেছে। রসগোল্লাগুলো দেখুন না, অতো বড়ো রসগোল্লাই কি পাবেন কোনোখানে ? অথচ একটা পয়সা লাগেনি।'

'লাগেনি ? বলিস কী ?'

'এরই নাম পুলিশ। বুঝলেন ? তবু তো আজকাল মানতে চায় না। আগে যখন—'

সুলেখাও সকলের সঙ্গে এসে দাঁড়িয়েছিলো, হঠাৎ পিছন ফিরে তাকিয়ে অস্থির হ'য়ে জ্যাঠাইমা বললেন, 'এ কী ! তুই এসেছিস কেন ? যা, ভেতরে যা।'

গজেনও তাকালো সেদিকে, মুচকি হেসে চোখ টিপে বললো, 'এই বুঝি ?'

বলাই বাহুল্য, ঐ ক্ষণিক দর্শনেই মোহিত হ'য়ে গেলো গজেন। মাথা দুলিয়ে বললো, 'বাঃ, বেড়ে মাল। একেবারে কচি, নতুন।'

জ্যাঠাইমা ব্যস্ত হ'য়ে বললেন, 'আয়, আয়, ঘরে আয়। ও-সব পরে হবে।'

কিন্তু জ্যাঠাইমা বললে কী হবে। সেই প্রসঙ্গ কি আর সে ছাড়তে চায় ? সেই বিকেলেই বেরিয়ে গিয়ে মদন সাহার দোকান থেকে

কানের মতো পাৎলা এক সোনার হার কিনে নিয়ে এলো। 'বুঝলেন হেম-পিসিমা—' গম্ভীরভাবে বললো, 'বৃথা কাল তো অনেক কাটালাম, আর নয়। আমি আজই পাকা দেখে ফেলি, দিন সাতেকের মধ্যে একটা তারিখ ঠিক ক'রে বিয়ের ব্যাপারটা চুকিয়ে ফেললেই হবে—'

'আজই পাকা দেখবি কী রে? আর তুই পাকা দেখবি কেন, দেখবে তোর মা।'

'আরে বাপু ঐ বুড়ির নামাখানা, আজ কান ব্যথা, কাল নাক ব্যথা, পরশু ঠ্যাং ব্যথা— ও-সব ছেড়ে দাও। এই ত্যাখো, মালাটি কিনেই এনেছি, এখন টুক ক'রে গলায় পরিয়ে দেয়া—'

জ্যাঠাইমা তবু ইতস্তত করেন দেখে মুচকি হাসলো সে। 'জানি, জানি, ঘুষ চাই কিছু— এই তো? তাতে গজেন নন্দী পেছপা নয়। পছন্দ হ'লে তার জন্যে সে সব কবুল করতে রাজি।'

'দেখি, দেখছি' ব'লে মা-র কাছে এলেন জ্যাঠাইমা, 'ছেলের তো আর সবুর সইছে না রে—' আড়চোখে মা-র মুখের দিকে তাকালেন তিনি। মা চোখ নিচু ক'রে চুপ।

'আবার একটা সোনার হার নিয়ে এসেছে। যেমনি ভারি, তেমনি দামি। এবার আর তোর ভাবনা থাকবে না। বড়োমানুষ জামাই পেয়ে জা-ভাসুরকে চিনবিই না বোধ হয় শেষে।' বাবু-ছোটুকে আদর করলেন, 'কী রে, সন্ধ্যা লাগতেই পড়তে বসেছিস কী? যা, নতুন জামাইয়ের সঙ্গে ভাব কর গিয়ে।'

মা চুপ।

'কথা বলছিস না যে?'

'কী বলবো?'

'মত দিবি তো একটা? গজেন তো এ-মাসেই তারিখ ফেলতে চায়।

কী করবি, এতো বড়ো একটা দায়িত্বের চাকরি করে, রোজ-রোজ তো আর ছুটি পাবে না। তাই তাড়াতাড়ি সেরে নিতে পারলেই ভালো।'

'আপনারা যা ভালো বোঝেন, তাই হবে।'

মা-র স্তিমিত গলা ভালো লাগলো না জ্যাঠাইমার, বললেন, 'একটু মন খুলে কথা ক বাপু, তোদের এই চুপ-চুপ স্বভাব আমার মোটেও ভালো লাগে না। না-হয় পাকা দেখা আজ থাক। যা হয় কালই হবে। কী বলিস?'

আসলে এতো ভালোমানুষি জ্যাঠাইমার মা-র জন্য ছিলো না, ছিলো সুলেখার জন্য। সেই দুরন্ত মেয়ে যে কিভাবে নেবে, কী করবে, সেটা ভেবেই বিচলিত বোধ করছিলেন তিনি। তাই এতো নরম। নইলে মাকে তিনি কি পরোয়া করেন?

কিন্তু বেশিক্ষণ তাঁকে সেই সংশয় ভোগ করতে হ'লো না। তাঁর গুণধর ভ্রাতুষ্পুত্রই তাঁকে মুক্তি দিলো।

কখন কোন ফাঁকে সুলেখাকে একটু একা পাবে গজেন এই তাকে-তাকেই ছিলো সে। জ্যাঠাইমার দেরি তার ভালো লাগছিলো না। ঘরে-ঘরে, যেখানে-সেখানে স্বাধীনভাবে ঘুরতে-ঘুরতে সে ছাদে এসে পেয়ে গেলো সুলেখাকে। আধো-অন্ধকারে চিলেকুঠির দেয়ালে ঠেসান দিয়ে সারা বাড়ি থেকে আলাদা হ'য়ে সে ব'সে ছিলো চুপচাপ। পিছন থেকে এগিয়ে এসে সোনার হারটা নিঃশব্দেই পরিয়ে দিচ্ছিলো, সুলেখা চমকে মুখ ফেরাতেই হাসলো সে, 'অ্যাঃ, টের পেয়ে গেলে? ভাবছিলাম এই চাঁদনি রাতে, এই ছাদের উপরে, নিরিবিলিতে আজ তোমার আমার—'

বিদ্যুৎবেগে সুলেখা হাতের সামনে যা পেলো তাই ছুঁড়ে মারলো, তারপর এক দৌড়ে নেমে এলো নিচে। কিন্তু নিচে এসেই মনে হ'লো, লোকটাকে আরো কয়েক ঘা মেরে আসা উচিত ছিলো, হিপ্পোটার

অতো বড়ো শরীরে ঐ সামান্য এক থান-ইটের আঘাত কতোটুকু! আর ঠিকঠাক লেগেছে কিনা তাই বা কে জানে। আবার সিঁড়িতে পা দিয়েছিলো সে, এর মধ্যেই গজেনের ভয়ার্ত মোটা গলার বীভৎস চীৎকারে সারা বাড়ি কম্পিত হ'য়ে উঠলো। দুদ্দাড় যে যেখানে ছিলো সেখান থেকে ছুটলো ছাদের দিকে। চিৎ হ'য়ে প'ড়ে আছে গজেন, মুখটা হাঁ হ'য়ে রয়েছে, জামার বোতাম খুলে বুকের এক ঝোপ কৃষ্ণবর্ণ লোম খাড়া হ'য়ে উঠছে নিশ্বাসের সঙ্গে-সঙ্গে। সারা শরীরটাই তার লোমে ছাওয়া, হাতের খানিকটা দেখা যাচ্ছে, ভালুকের মতো। পায়ের খানিকটা দেখা যাচ্ছে, তা-ও ভালুকের মতো। বড়ো-বড়ো লোম ভেদ ক'রে মনুষ্য-মাংস আর বোঝা যাচ্ছে না। আধো-অন্ধকারে সহসা একটা জন্তু ব'লে ভুল হওয়া খুব স্বাভাবিক।

ভারি ইট গায়ে না-লেগে পড়েছে পায়ের উপর। জুতো খুলে পা টিপে-টিপে ভাবী বউকে সে কতো ভালোবেসে মালা পরাতে গিয়েছিলো, জুতো থাকলে এই জখমটা হ'তে পারতো না। তিনটে আঙুল একসঙ্গে থেঁৎলে গেছে। জল এলো, পাখা এলো, তুলো ব্যাণ্ডেজ, এমনকি রাস্তার মোড়ের ডাক্তারখানা থেকে একজন কম্পাউণ্ডার পর্যন্ত এসে হাজির। খানিক বাদে সব ঠেলে প্রায় লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালো গজেন, অকথ্য ভাষায় গালাগালি ক'রে নিবারণ তালুকদারের চোদ্দপুরুষ উদ্ধার করতে লাগলো। তারপর গাড়ি আনিয়ে মোটঘাট বেঁধে সেই দিনই পলায়ন।

এর পরে একটা কুৎসিত চিঠি এলো কুমির্টোলা থানা থেকে। স্বয়ং গজেনই অবিশ্যি তার লেখক। জ্যাঠাইমাকে লিখেছে, 'আপনাদের এই অপমানের প্রতিশোধ আমি অবশ্যই লইব। যদি আমি বাপের ব্যাটা হই, তাহা হইলে ঐ অসচ্চরিত্র মেয়েকে একদিন-না-একদিন বেইজ্জৎ

করিয়া এই অপমানের জ্বালা জুড়াইব। আমার নাম গজেন্দ্রনাথ নন্দী। আমি মেদিনীপুরের লবণ-আইনের পুলিশ, আমার নামে বাঘে-গোরুতে এক ঘাটে জল খায়। সেই সময়ের যতো অত্যাচারের কাহিনী খবরের কাগজে আপনারা পড়িয়া শিহরিত হইয়াছেন তাহার নেতা কে? এই আমি। আমি ঘরের মেয়েছেলে টানিয়া বাহির করিয়াছি, আগুন জ্বালাইয়াছি, স্বদেশী গুণ্ডাগুলোকে গোরুর মতো লাঠিপেটা করিয়াছি, সাহেবরা তখন নোন্‌ডিবাবু বলিতে অজ্ঞান। যেখানকার যতো দমন সব এই আমি। এই গজেন নন্দী। আর আমাকেই কিনা থান-ইট ছুঁড়িয়া জখম করা। প্রতিশোধ আমি লইবই লইব।'

জ্যাঠাইমা আগাগোড়াই এই ধরনের একটা সন্দেহ করছিলেন, আগাগোড়াই তাঁর মনে হচ্ছিলো, এই ঘটনাটি ঘটানোর মূলে নিশ্চয়ই স্থলেখা আছে। চিঠি পেয়ে পরিষ্কার হ'লো ব্যাপারটা। বলাই বাহুল্য, তা নিয়ে অনেক অশান্তি, অনেক নির্যাতন, সবই হ'লো, কিন্তু বিয়ের চেষ্টা আর হ'লো না। স্থলেখা বাঁচলো।

॥ নয় ॥

তারপরেই দাঙ্গা। হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা। হাওয়াটা অনেকদিন ধ'রেই ঘোলাটে হ'য়ে ওঠার চেষ্টায় ছিলো, এইবার চেহারা নিলো। দেশময় স্বদেশী আন্দোলনের প্রবল ঝাপটা চলেছে তখন, তারই দাপটে ইংরেজ প্রভুরা ছিন্নভিন্ন উদ্‌ভ্রান্ত। একদিকে বিপ্লবীদের গোপন ষড়যন্ত্র, অন্যদিকে মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলন। এই দুইয়ের চাপে দিশাহারা ইংরেজ বণিক। শেষে আত্মরক্ষার এই অপূর্ব কৌশলটি খুঁজে পেয়ে নিশ্বাস নিলো। চিরদিন যারা সুখে দুঃখে পাশাপাশি বাস ক'রে এসেছে,

বিদ্বেষের বিষ ছড়ালো সেখানে। আগুন লাগালো ঘরে-ঘরে। পরস্পরের বিরুদ্ধে পরস্পরকে উত্তেজিত করার চেষ্টায় উঠে-প'ড়ে লেগে গেলো। কলকাতা থেকে সুবিধাবাদী ইংরেজি কাগজ কালো-কালো অক্ষরের বাহনে সেই গরম বিষ সারা দেশে ছড়িয়ে দিয়ে ইন্ধন জোগাতে লাগলো। এতোদিন যে-মুসলমানসমাজকে ইংরেজরা অবহেলায় তলার দিকে ঠেলে দিয়েছে, অপাঙ্‌ক্তেয় ক'রে রেখেছে, হাসিমুখে সাদর সম্ভাষণ জানালো তাদের, নিজেদের উদ্দেশ্যসিদ্ধির কূট চক্রান্তে। শিক্ষিতসমাজ যোগ দিলো না, কিন্তু সংখ্যায় তারা ক'জন ?

ঘরে-ঘরে গালে হাত দিয়ে বসলো সব। নবাবগঞ্জ শহরে হিন্দু-মুসলমান গলায়-গলায়। সেখানকার মুসলমানেরা অনেক অগ্রসর, পরদা-প্রথা প্রায় নেই বললেই চলে। ছেলেমেয়েরা সমানে লেখাপড়া শেখে, এ ওর বাড়ি যায়, সে তার বাড়ি যায়। তারা সব ফুটতে লাগলো রাগের আগুনে। সেখানে হিন্দু রইলো না, মুসলমান রইলো না, রইলো কতগুলো এক দেশের মানুষ। যাদের চেহারা এক, চলন এক, অভ্যাস একরকম, অন্তঃকরণের স্রোত একই গতিতে ব'য়ে যায়। যতোদিন সুলতান-সাহেবের বাপ বুড়ো নবাব আখতার আমেদ-সাহেব বেঁচে রইলেন, ততোদিন তেমন দানা বাঁধতে পারলো না এই ঝগড়া। একবার দু-বার টুকটাক একটু-আধটু হ'লো বটে, আড়ালে-আবডালে, পাড়ায়-বেপাড়ায় খুনখারাপিও হ'লো দু-চারটে; কিন্তু দেখতে-দেখতে আবার মিটে গেলো। নবাব-সাহেবকে প্রেসিডেণ্ট ক'রে নবাবগঞ্জের গণ্যমান্যরা একটা পীস-কমিটি তৈরি করলেন, আগুন নিবে ঠাণ্ডা পানি হ'য়ে গেলো। কিন্তু আখতার আমেদের মৃত্যুর পরেই উল্টে গেলো হাওয়া। সুলতান আমেদ নবাব হ'য়েই তাণ্ডব আরম্ভ করলো। ইংরেজদের সঙ্গে তার ওঠা-বসা, ইংরেজদের সঙ্গেই তার খানাপিনা, ইংরেজরাই তার বন্ধু সোদর

সব। কয়েক বছর তাদের দেশে বাস ক'রে সবে ফিরেছে তখন, দেখতে-দেখতে শহর গরম হ'য়ে উঠলো।

সুলেখা ততোদিন ইস্কুল ছেড়ে কলেজের ছাত্রী, লেখাপড়ায় সর্বাগ্রগণ্য। স্বাস্থ্য ভালো, দৌড়ঝাঁপে ওস্তাদ, গান করে, অভিনয় করে, নবাবগঞ্জ ভিক্টোরিয়া গার্লস কলেজের একটা বিশেষ মেয়ে সে। প্রোফেসরদের বিশেষ আদরের পাত্রী।

এদিকে রাজনীতি নিয়েও কম মাথা ঘামাচ্ছে না। নবাবগঞ্জে বিখ্যাত বিপ্লবী নেতা সেনদার ডান-হাত বাঁ-হাত। আত্মরক্ষা-সমিতির বিশেষ সদস্য। সেখানে সে লাঠিখেলা শিখেছে, ছোরাখেলা শিখেছে, অবলীলা-ক্রমে রিভলভার ছুঁড়তে শিখেছে। সেনদা আগুন ব'লে ডাকেন। মাঝে-মাঝে গোপন বৈঠক বসে সেখানে, বয়স্করা সুলেখার কথাও মন দিয়ে শোনেন, তার সামনে নিগূঢ়তম তথ্যও গোপন করেন না। তাঁরা তাকে পদমর্যাদায় নিজেদের সমান জায়গা দিয়েছেন। শহরের যতো প্রতিবাদ-সভা, স্ট্রাইক, মিছিল সবের পুরোভাগে এই মেয়ে, এই সুলেখা। কবে, কেমন ক'রে গিয়ে ঐ-দলে সে ভিড়েছিলো সেটা জরুরি নয়, পূর্ব বাংলার যে-কোনো শহরে ঘরে-ঘরে ছাত্রছাত্রীরা তখন এই পথে। আসল যেটা, সেটা হচ্ছে সুলেখার দুর্জয় সাহস, প্রখর বুদ্ধি, অসাধারণ ব্যক্তিত্ব। শহরে এরই মধ্যে তার নাম ছড়াচ্ছে। সভা হ'লে যে আগের মতো শুধু গানই গায় তা নয়, বক্তৃতা দিয়েও চঞ্চল করে, পার্টির চাঁদা তুলতে কেউ তার মতো ওস্তাদ নয়। বস্তিতে-বস্তিতে ঘুরে কাজ-কর্ম করতেও সে পয়লা নম্বর। দলের মেম্বর বাড়ানোটাও একটা মস্ত কাজ। সেই কাজটা সে কলেজের মধ্যে ভালোভাবেই সম্পন্ন করে। সহপাঠিনীরা তাকে ঈর্ষা যতোটা করে, শ্রদ্ধা করে তার চেয়ে বেশি,

কাজেই সেখানে তার যথেষ্ট কর্তৃত্ব, আর ছোটোরা তো সুলেখাদি বলতে পাগল।

নবাবগঞ্জে মেয়েদের কলেজটা দেখবার মতো। চারদিকে উঁচু দেয়াল-ঘেরা বিশাল প্রাসাদোপম বাড়ি, ভেতরে প্রায় তিন-চার বিঘে জমির মধ্যে ফুলের বাগান, ফলের বাগান, কৃত্রিম পাহাড়, ঝরনা, কতো যে কিছু তার হিসেব নেই। নবাবি আমলে কোন আমির-ওমরাওয়ের বাড়ি ছিলো কে জানে, কোম্পানির আমলে এক সাহেব বাড়িটা কিনে বাস করছিলেন, তারপর হাত ঘুরে-ঘুরে মেয়েদের কলেজে পরিণত হয়েছে। নদীর ধার ঘেঁষে এই বাড়ি। বর্ষাকালে বুড়িগঙ্গা যখন ফুলে-ফেঁপে এতো বড়ো হ'য়ে ওঠে, দেয়াল ছুঁয়ে থাকে জল। ভেতর দিয়ে ঢাকা সিঁড়ি আছে নদীতে নামবার, তীরে বেড়াবার। সে-সিঁড়ির দরজা এখন বন্ধ, সিঁড়ি ভাঙা। তারই এক কোণে একটা বুড়ো বট তার শত-শত ঝুরি ঝুলিয়ে সটান দাঁড়িয়ে আছে। মেয়েরা বলে সাধুবাবা। বটের তলায় বিরাট বাঁধানো চাতাল, মাটি থেকে উঁচু। বেশ একটি ছোটোখাটো সভা জমতে পারে, গোলটেবিল বৈঠক বসতে পারে, গরমকালে পাটি বিছিয়ে শুয়ে থাকলে নদীর হাওয়ায় প্রাণ ঠাণ্ডা হ'য়ে যায়। সুলেখা সেই বুড়ো বটতলায় আসর জমায়। ফাঁক-তাক বুঝে জনকয়েক মেয়ে নিয়ে চ'লে আসে সেখানে, একেবারে নিরিবিলিতে, নির্জনে। বটের তলায় এখানে ছায়া গভীর, সেখানে হালকা, এখানে সূর্য, সেখানে অন্ধকার। সেইসব ছায়া-ছায়া ঝোপ-ঝোপ ঝুরি-ঝোলা আড়ালটুকু বেছে নিয়ে গাছটায় ঠেসান দিয়ে দাঁড়ায়, তারপর হঠাৎ ব'লে ওঠে, 'শোনো, মেয়েরা—'

সুলেখার উত্তেজিত গলার ঐটুকু শুনেই মেয়েরা চকিত হ'য়ে তাকায়, গুটিগুটি ভিড় জ'মে ওঠে, আর তাদের প্রত্যেকের মুখের উপর চোখ ফেলে-ফেলে সুলেখা বক্তৃতা দেয়— 'তোমরা কি দেখতে পাচ্ছো, কী

ভীষণ দিন এগিয়ে আসছে সামনে। কী ভয়ানক কালস্রোতে ভেসে চলেছি আমরা। আমরা তলিয়ে যেতে বসেছি, দম বন্ধ হ'য়ে ডুবে মরতে বসেছি, এ-সময়েও কি তোমরা ঘুমিয়ে থাকবে?' জনতার মধ্যে গুনগুন ওঠে। একটু থেমে স্থলেখা আবার বলে, 'বলো, তোমরাই বলো, আমাদের কি এর বিরুদ্ধে কিছুই করবার নেই? জালিয়ানওয়ালাবাগের মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ডের ইতিহাস কি খুব দূরের ঘটনা? যতীন দাসের অনশনে প্রাণত্যাগ কি তোমাদের প্রাণে এতোটুকু বেদনা ঘনিয়ে আনেনি? মহাত্মাজির দণ্ডীযাত্রার কথা তোমরা জানো, লবণ আইনের অত্যাচার পৃথিবীর ইতিহাসে কলঙ্ক লেপন করেছে তা-ও কি জানো না? এই ছাখো তার ছবি—' বুকের ভেতর থেকে লুকোনো নিষিদ্ধ বই বার ক'রে মেয়েদের চোখের সামনে সে মেলে ধরে— 'ছাখো, কিভাবে গাছে বেঁধে চাবুক মারছে, চেয়ে ছাখো সন্তানবতী মহিলাকে পদাঘাত ক'রে কিভাবে তার সন্তানকে অকালে জঠর থেকে বার ক'রে ফেলেছে— গরম তেল ঢেলে দিচ্ছে গায়ে, চামড়া ছিঁড়ে নিচ্ছে—' ভয়ার্ত শব্দ ক'রে চোখ বোজে মেয়েরা। স্থলেখা আবার বইটা লুকিয়ে ফেলে বলে, 'আরো যে কতো জঘন্য অত্যাচারে বিধ্বস্ত করেছে পাষণ্ডেরা তার কোনো বর্ণনা নেই। কিন্তু কেন এই অত্যাচার? তার কারণ আমরা তাদের দাসত্বের গ্লানি আর সহ্য করতে পারছি না। আমরা আজ মাথা তুলে দাঁড়াতে চেষ্টা করছি। এই আমাদের অপরাধ। ইংরেজরা মনে করে আমরা বুঝি চিরদিনই তাদের ভৃত্য হ'য়ে কাল কাটাবো, আমাদের মান থাকবে না, সম্মান থাকবে না, আমরা হবো কলের পুতুল। তাদের মাথা-নাড়াতেই আমাদের মাথা-নাড়া। তারা এই চায়। কিন্তু মানুষ তা পারে না। অত্যাচার ক'রে চিরদিন দাবিয়ে রাখা আর তাদের সম্ভব হচ্ছে না। আমাদেরই দেশে আমাদের আর রেলগাড়ির ফার্স্ট ক্লাশ

কামরা থেকে বুটের ঠোক্করে ফেলে দিতে পারছে না। ব্লাডি, নিগার, সোয়াইন, এ-সব গালিগালাজ শুনতে আর আমরা রাজি নই। এই অবস্থা থেকে তোমরা কি মুক্তি চাও না? বলো, চাও কিনা।' 'চাই, চাই!' একসঙ্গে অনেকগুলো গলা আকাশে-বাতাসে ছড়িয়ে যায়। 'তবে এসো,' হাত বাড়িয়ে দেয় সুলেখা, 'আজ থেকেই আমরা আমাদের মিলিত শক্তি নিয়ে এগিয়ে যাই, দেখি কে আমাদের ঠেকাতে পারে। যদি সারা দেশ আজ এমনি সংঘবদ্ধ হ'য়ে "চাই" ব'লে দাঁড়াতে পারতো তা হ'লে এই শৃঙ্খলিত ভারত একদিনেই মুক্তি পেতে পারতো। আমরা দুর্বল হ'তে পারি কিন্তু ক্ষুদ্র নই, এই আমরাই হয়তো একদিন সারা দেশ এক ক'রে ফেলতে পারবো।-শুধু তোমরা জেনে রাখো সকলে, কলেজের গণ্ডি-ঘেরা এই মসৃণ জীবনই আমাদের সব নয়, ইস্কুল-কলেজ আর নিজেদের বাড়িটুকুই আমাদের পৃথিবী নয়। আমাদের মনুষ্যত্ব আছে, আমাদের বলবার কথা আছে, মর্যাদা পাবার অধিকার আছে। স্বীকার করি, আমরা বয়সে ছোটো ব'লে কিছু অসুবিধে আছে এ-সব কাজে কিন্তু তা ব'লে এ-কথা ভেবো না, বয়স বাড়া মানেই বড়ো হওয়া। বয়স বাড়ে নিজে-নিজে। তার জন্য কোনো চেষ্টার দরকার হয় না। কিন্তু মন? মনের প্রসারের জন্য চাই সাধনা। মনকে বড়ো করতে হ'লে চেষ্টা করতে হয়, একাগ্র হ'তে হয়। আর মন বড়ো হ'লেই আমরা ভাবতে পারি, বুঝতে পারি, কাজে লাগতে পারি। তারপর জোর গলায় বলতে পারি আমরা হিন্দু নই, মুসলমান নই, জাতের যূপকাষ্ঠে বলির পাঁঠা নই। আমরা মেয়েও নই, পুরুষও নই। সর্বপ্রথম আমরা মানুষ। বুকের মধ্যে আমরা আত্মাকে বহন করি। মনুষ্যত্বটাই আমাদের সবচেয়ে বড়ো কথা, বড়ো সম্পদ। মানুষ হিসেবে আমরা তবে কী চাই? চাই বাঁচতে। সে-বাঁচা পশুর বাঁচা নয়। মানুষেরই বাঁচা। আমরা জানি, মানুষ শুধু

উদরসর্বস্ব নয়, মানুষ শুধু খেয়েই বাঁচে না, গোরু-ঘোড়ার মতো জাবর আর দানাপানিতেই কর্ম শেষ হয় না তার, মানুষের মনের ক্ষুধাটাই বড়ো ক্ষুধা। সেই ক্ষুধা কিসের জন্য ? স্বাধীনতা!'

এই স্বাধীনতা শব্দটি উচ্চারণের সঙ্গে-সঙ্গে, যদি উঁচু কিছু থাকে সেখানে, নয়তো যে-কোনো একজন মেয়ের পিঠের উপরেই সুলেখা প্রচণ্ড ঘুষি মারে একটি। তারপরই গানের গলা রিনরিন ক'রে ওঠে, 'বলো, প্রতিজ্ঞা করো, আমরা স্বাধীনতা চাই।'

সঙ্গে-সঙ্গে সরু গলার মিলিত চীৎকার ওঠে, 'আমরা স্বাধীনতা চাই।'

সুলেখা বুক ফুলিয়ে নিশ্বাস নিতে-নিতে উত্তেজিত মুখে আবার বলে, 'আমরা ইংরেজের অধীনতা মানবো না।'

'আমরা ইংরেজের অধীনতা মানবো না।'

'হয় লড়েঙ্গে নয় মরেঙ্গে।'

'হয় লড়েঙ্গে নয় মরেঙ্গে।'

'জাতের নামে বজ্জাতি আর চলবে না, চলবে না।'

'জাতের নামে বজ্জাতি আর চলবে না, চলবে না।'

'হিন্দু-মুসলমান ভাই-ভাই।'

'হিন্দু-মুসলমান ভাই-ভাই।'

এর পর কুইট ইণ্ডিয়া, মহাত্মাজিকী জয় ইত্যাদি ব'লে সভা ভঙ্গ হয়।

কিন্তু ঠিক আজকাল, ফোর্থ ইয়ারের ছাত্রী হবার পর থেকে এ-ধরনের বক্তৃতা সে ছেড়ে দিয়েছে। এখন সুলেখা বক্তৃতার বদলে চুপি-চুপি দলে টানে। চারদিকে তাকিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে নিবিড় হ'য়ে ফিশফিশ করে, 'বুঝলি, এই যে পুলিশ কমিশনার আর ম্যাজিস্ট্রেট, দুই লাল বাঁদরের বাচ্চা সাগরপারের শয়তান, এ-দুটোই হ'লো এই শহরের সর্বনাশ। ঘরে-

ঘরে পুলিশ ঢুকিয়ে সার্চ করবার নামে ওরা আমাদের যে-অত্যাচারটা করায় তার প্রতিশোধ আমাদের নিতেই হবে। দিনেশদাকে সেদিন মারতে-মারতে অজ্ঞান ক'রে ফেললো, দিনেশদার মাকে মশারির ভেতর থেকে চুল ধ'রে টেনে বার ক'রে বলে যে, বলাইপুরের ডাকাতির ব্যাঙ্ক-লুটের দলে দিনেশ ছিলো, তোমার বাড়িতেই তাদের গোপন ষড়যন্ত্রের আড্ডা বসতো, নাম বলো কে কে থাকতো সেখানে। উনি যতো বলেন, সেই তারিখে দিনেশ জ্বরে শয্যাশায়ী ছিলো, তার হুঁশ পর্যন্ত ছিলো না, ততোই জেদ বাড়ে তাদের। আর কেউ না জানুক আমি তো সব জানি। দিনেশদা বিপ্লবী নন। বিপ্লবে তাঁর বিশ্বাস নেই, উনি একান্তভাবেই গান্ধিবাদী। এ-সব ডাকাতি ক'রে টাকা লুট করা বা খুন করা এ-সব তাঁর দ্বারা হবে না। এ নিয়ে আমাদের সঙ্গে তাঁর রীতিমতো তর্ক হয়। উনি প্রায় দল ছেড়ে দিয়েছেন বললেও অত্যুক্তি হয় না। অথচ একটা ভুল সন্দেহে কী অমানুষিক অত্যাচার।'

'সোয়াইন!' বন্ধুরা অস্ফুট উত্তেজনায় নিশ্বাস গাঢ় করে।

'কিন্তু আসলে ঘরশত্রু বিভীষণটি কে, জানিস?' চাপা গলায় যেন মন্ত্র দেয় সুলেখা, 'নবাব সুলতান আমেদ। স্কাউণ্ড্রেল! শয়তান!' বলতে-বলতে দুই চোখে তার ফুলকি ছোটে, দাঁতে দাঁত আটকে যায়, 'লোকটা যে কী জঘন্য, কী পিশাচ, কল্পনা করতে পারবি না। যদি দ্বীপান্তরে যেতে হয়, ফাঁসিতে ঝুলতে হয়, তবু একদিন আমি ওকে দেখে নেবো। আমি হত্যা করবো ওকে।'

'অ্যাঁ?'

'হ্যাঁ। তারপর ঐ দুটো শয়তান। ম্যাকলীন আর হেক্টর। কমিশনার আর ম্যাজিস্ট্রেট। আমার বড়ো সাধ এই তিনটি লোকের বুকের রক্ত দেখে আমি মরি।'

'রক্ত!' মেয়েদের চোখের তারা ঠিকরে পড়ে।

'সেদিন আসল শয়তানটাকে পেয়েছিলাম হাতের কাছে অ্যালবার্ট হলের মিটিং-এ, হঠাৎ দেখি দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। আমি আসছিলাম, চোখে চোখ পড়তে বুকের ভেতরটা আমার নেচে উঠলো। দৌড়ে সেনদার কাছে গেলাম, বললাম, পিস্তল দাও, সুলতানকে পেয়েছি, খুন করবো। সেনদা চোখ-ইশারায় চুপ করতে বললেন। বললেন, এখনো সময় হয়নি। অন্তত আজ নয়। হতাশ হ'য়ে চুম্বকের নেশার মতো আবার আমি দরজার ধারে গেলাম, দেখি ঠিক দাঁড়িয়ে আছে। টকটকে চেহারা, কালো কুচকুচে সিল্কের আচকান পরেছে, দেখাচ্ছে ঠিক নবাবের মতোই, কী আস্পর্ধা, দূর থেকে দু-হাত তুলে নমস্কার করলো। ঘেন্নায় মুখ ফিরিয়ে নিলাম।'

এ-সব কথা সুলেখার শুধু কথাই নয়, তার জন্য সত্যি সে উৎসুক, উৎকণ্ঠিত। কিন্তু সেনদা তাকে এখনো ততো বড়ো কাজের ভার দিতে নারাজ। মিছিল, মিটিং ইত্যাদিতেই তার কর্মকুশলতা সীমাবদ্ধ। কিন্তু নিজেও সে একটি খুদে দলের কর্তা হয়েছে। সেটা তার ব্যক্তিগত। একটি লাঠিখেলা-ছোরাখেলার আখড়া করেছে বাড়ির ছাদে। পাড়ার মেয়ে-বউরা আসে সেখানে। সুলেখা তাদের শক্তি জোগায়, সাহস জোগায়। মাত্র দশটি সভ্য সেখানে কিন্তু সুলেখা বলে, এই দশটিই একদিন দশ সহস্রকে দীক্ষিত করতে পারবে।

বাড়ির লোকেরা কিন্তু তার এ-সব কার্যকলাপের বিস্তৃত বিবরণ কিছুই জানতে পারলো না। এমনকি মাকে পর্যন্ত গোপন করলো সুলেখা। সন্দেহ করবার কিছু নেই। অনেকদিন সে দেরি ক'রে বাড়ি ফেরে, কেউ ভাবে না তার জন্য। সবাই জানে দুটো টিউশনি করতে হয় তাকে।

জ্যাঠামশায়-জ্যাঠাইমার ইচ্ছে এই টিউশনির টাকাটা এনে সে তাঁদের হাতে দেয়। আড়ে-ঠারে অনেকবার বলেছেনও সে-কথা, সুলেখা কানে তোলেনি। সে-টাকা সে মাকেও দেয় না। লাভ নেই। মাকে দেয়া মানেই জ্যাঠাইমাকে দেয়া। ব'লে-ক'য়ে ছলে-বলে ঠিক তিনি বার ক'রে নেবেন মা-র কাছ থেকে। এ-টাকা দিয়ে সে ভাইদের খরচ চালায়, নিজের হাত-খরচ রাখে। কলেজে স্টাইপেণ্ড পায় সে, কাজেই পড়া-খরচটা লাগে না। কিছু জিজ্ঞেস করার অভ্যাস নেই সুষমা দেবীর, উদ্বিগ্ন হ'লেও তা প্রকাশ করার অভ্যাস নেই। যদি কখনো সুলেখার বাড়ি ফিরতে আন্দাজের অতিরিক্ত দেরি হয়, ঘর-বার করেন তিনি, ছাদে গিয়ে দূরে রাস্তার ঐ পর্যন্ত তাকিয়ে থাকেন, কাউকে দেখলে ত্রস্তে নেমে আসেন নিচে। এতো বয়েস হ'য়ে গেলো মানুষটার তবু নতুন বউয়ের লজ্জা, ভয় তাঁর কাটলো না। সুলেখা এলে বিষাদভরা মুখখানা উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে, কাজে মন দিতে পারেন। সুলেখা বোঝে সে-কথা ; তাই আজকাল যেদিন দেরি হবার সম্ভাবনা থাকে ব'লে যায়। সুষমা দেবী চোখ তুলে তাকান। মৃদু হেসে সুলেখা বলে, 'দু-একটা কাজ সেরে আসবো আর কি। তুমি ভেবো না।'

ব্যস। ঐ পর্যন্তই। তবু যেটুকু কথা ভেসে আসে হাওয়ায় তাই নিয়েই অনেক গোলযোগ হয়, কথাবার্তা হয়, অশান্তি করেন জ্যাঠামশায়-জ্যাঠাইমা। কিন্তু সমুদ্রের কাছে কি ডোবার জল দাঁড়াতে পারে? দেশের অতো বড়ো অশান্তির কাছে সুলেখার ব্যক্তিগত জীবনের অশান্তিটা কি নগণ্য নয়?

॥ দশ ॥

জ্যাঠামশায় একদিন কোথায় বেরিয়ে বাড়ি ফিরে মাকে ডেকে বললেন, 'মেয়েকে সামলাও।'

মাকে কে সামলায় তার ঠিক নেই, মা সামলাবেন তাকে। সভয়ে চারদিকে তাকিয়ে তিনি ব্যস্ত হ'য়ে ওঠেন।

'অতিশয় অসভ্য অবাধ্য মেয়ে তোমার। এ-মেয়ে নিয়ে এক বাড়িতে থাকা আমার পোষাবে না।' জ্যাঠামশায়ের গলা প্রত্যয়ে স্থির।

দরজার আধো-আড়ালে দাঁড়িয়ে আধো-ঘোমটা-ঢাকা করুণ মুখখানা আরো করুণ হ'য়ে আসে মা-র। ভাসুরের কথায় তিনি ঘেমে ওঠেন। মেয়ের ভয়ডরহীন স্বাধীনচেতা স্বভাব তাঁর নিজেরই কি কম ভীতির কারণ?

নিবারণবাবু গম্ভীরমুখে তামাকের নলে টান দিয়ে বললেন, 'এইমাত্র মহিম হালদারের বাড়ি গিয়ে তোমার মেয়ের গুণকীর্তন শুনে এলাম। ছী-ছি, আমাদের ঘরের মেয়ে, এ-সব কী বেলেল্লাগিরি। তিনি নাকি দেশোদ্ধার করছেন। দেশোদ্ধারের নামে যে তোরা কী করিস তা কি কারো জানতে বাকি আছে?'

ঢোঁক গিলে চুপ ক'রে রইলেন মা।

সুপুরি কাটতে-কাটতে জ্যাঠাইমা বললেন, 'আবার বাড়ির ছাদে কতগুলো ছেলেমেয়ে নিয়ে কী আরম্ভ করেছে ক'দিন থেকে, কাল আমি সব-ক'টাকে আচ্ছা ক'রে শুনিয়ে দিয়েছি।'

'এ-সব কি ভালো?' নিবারণবাবু আবার মাকে উদ্দেশ ক'রে কথা ছুঁড়লেন, 'বললে তো ভালো শোনায় না কিন্তু মেয়ের মাথাটি তুমিই খেয়েছো। বাড়িটা আমার স্বদেশী গুণ্ডামির আখড়া নয়। এখানে থাকতে হ'লে আমার হুকুম মেনেই চলতে হবে। আর তা যদি না পারে ইচ্ছে

হ'লে মেয়ে নিয়ে তুমি আলাদা হ'য়ে যেতে পারো, দেশে গিয়ে থাকতে পারো। হাজার হোক, ইংরেজ আমাদের প্রভু, রাজা, তাদের মান্য ক'রে চলতেই হবে।'

বড়ো জায়ের দিকে তাকিয়ে ভাসুরকে লক্ষ্য ক'রে এতোক্ষণে কথা বেরুলো মা-র মুখ দিয়ে, 'এজন্যে ওকে শাসন করুন।'

নিবারণবাবু বিদ্রূপের ভঙ্গিতে হেসে বললেন, 'আমি করবো তোমার মেয়েকে শাসন ? কেন, জুতো খাওয়াতে চাও নাকি ?'

মা এ-কথা শুনে আহত হৃদয়ে দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন।

'শহর গরম। বুঝলে ?' তামাকের নলটা জ্যাঠামশায় সরিয়ে রাখলেন পাশে। 'ইংরেজরা আমাদের আস্পর্ধায় খেপে লাল হ'য়ে গেছে, মুসলমানরা এ-সব স্বদেশী-ফদেশীর ধার ধারে না, তাই তারাই এখন তাদের বন্ধু। তাদেরই এখন হাতিয়ার ক'রে মারছে আমাদের। চালাক জাত বটে। বুদ্ধিটা বার করেছে কেমন দ্যাখো একবার। জগতের কাছে সাধুও রইলো আবার ওদিকে কাজও হাসিল হ'লো। তা বাপু যা-ই বলো, আগুনে হাত দিতে যাওয়াই বা কেন ? ভিমরুলের চাকে ঢিল ছুঁড়েছিস আর কামড় খাবি না ? স্বাধীনতার নিকুচি করেছে।'

জ্যাঠাইমা বললেন, 'কাল নাকি বংশী লেনে কলের জল নিয়ে দারুণ মারপিট হ'য়ে গেছে। মুসলমানরা নাকি সব একজোট হ'য়ে বলেছে, নবাবগঞ্জে আর একটা হিন্দুকেও বেঁচে থাকতে দেবে না। সব হিন্দু মেরে ফেলতে পারলে ইংরেজরা নাকি ওদের রাজা ক'রে দেবে ভারতবর্ষের।'

মাথা নাড়লেন জ্যাঠামশায়, 'মিথ্যে বলোনি। যা দেখছি, তাতে তো ভয়ই হচ্ছে রীতিমতো। যেন থমথম করছে শহরটা। কেবল এখানে ফিশফিশ ওখানে গুজগাজ। মুসলমান-পাড়া দিয়ে আসতে গা ছমছম করে। ওদিকে নবাববাড়িতে খানাপিনা চলছে সাহেবদের। পুলিশ

কমিশনার আর ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব তো সাতবার ক'রে ঢুকছে আসান মঞ্জিলে, সাতবার ক'রে বেরুচ্ছে। শুনছি আখতার-সাহেবের গুণধর পুত্রই হচ্ছে এই যজ্ঞের কর্তা। ওটা হচ্ছে এক নম্বরের শয়তান। বুড়ো নবাব আমিরআলি-সাহেব যদি বেঁচে থাকতেন, এতোদিনে নাতিকে কুকুর দিয়ে খাওয়াতেন। সে যা-ই হোক, সাবধান থাকা তো কর্তব্য?'

তাই তো।

'ইংরেজের বিরুদ্ধে এখন একটি কথা যে উচ্চারণ করবে সর্বনাশটি প্রথমে তার ঘরেই ঢুকবে।' দরজার দিকে তাকালেন জ্যাঠামশায়, 'তোমার মেয়ের রকম-সকম তো আমি ভালো দেখিনে, আমার অতো বুকের পাটা নেই যে বাড়ির মধ্যে কালসাপ পুষবো।'

তাই তো।

জ্যাঠাইমা উঠে গিয়েছিলেন একটু সময়ের জন্য, ফিরে এসে যোগ দিলেন কথায়, 'আর ওদিকে টিকটিকিগুলো তো সারা দিন সব পাড়ায়-পাড়ায় কান পেতে ঘুরছে। ভালোমানুষ সেজে এসে কখন যে কে কী সর্বনাশ করবে জানতেও পারবো না। শুনছি ইংরেজরা দু-হাতে টাকা ছড়াচ্ছে এই কাজে। ঘরে-ঘরে ছেলে-বুড়ো সব টাকার লোভে গোয়েন্দার কাজ নিচ্ছে।' একটু গলা খাটো ক'রে বললেন, 'এই তো, দিনেশদের বাড়িতে যে সেদিন সৈন্যগুলো এসে অমন মারপিট ক'রে গেলো, সবাই তো বলছে পাশের বাড়ির কালীমোহনবাবু নাকি গিয়ে ওদের নামে কী সব লাগিয়েছিলো পুলিশের কাছে।'

'তা হ'লেই বোঝো। কে কোনদিন ফশ ক'রে কী লাগাবে গিয়ে—' জ্যাঠামশায় ডিবে খুলে পান মুখে দিলেন, 'তারপর বলা নেই কওয়া নেই রাত-বিরেতে এসে সার্চ করবার নামে যদি ও-রকম মারধোর আরম্ভ করে, মেয়েদের অসম্মান করে, তখন উপায়। আর এলে মারধোর করবেই।

কেন করবে না? কিছু দোষ না-পেলেই করে, তার ওপরে বাড়ি ভর্তি লাঠিসোঁটা। মেয়ে তো দেশ স্বাধীন করছেন লাঠি শিখে ছোরা শিখে, তখন পারবে সে-সব চালাতে? তারপরে গুষ্টিসুদ্ধ হাতকড়া প'রে হাজতে পচো।'

কথা শুনে সুষমা দেবী প্রায় শিহরিত হলেন। এই মেয়ের জন্য সত্যি তার কোনো শান্তি নেই।

এর পরে নিবারণবাবু হঠাৎ গলা নরম ক'রে বললেন, 'সুপ্রকাশ মারা গেছে আজ প্রায় দশ বছর হ'তে চললো—'

দশ বছর! এতোদিন! সুষমা দেবী চোখ নামালেন, চোয়ালটা ব্যথা ক'রে উঠলো।

'এতোদিন তোমরা এখানে আছো। তিন ছেলেমেয়ে ইস্কুলে কলেজে পড়ছে তোমার। খাওয়া বলো, পড়া বলো, লাগে তো সবই। আর দিনকাল যা পড়েছে—'

সুষমা দেবী মাথা নাড়লেন।

'তারপর মেয়ে তোমার যথেষ্ট বড়ো হয়েছে। তার উপর যেভাবে চলাফেরা করছে, তাতে দুর্নাম বই সুনাম নেই। বিয়ে তো দিতে হবে? সুন্দর নয় যে কেউ শখ ক'রে নেবে। বলতে গেলে কুচ্ছিৎই। ক'দিন পরে বিয়ে হওয়াই অসম্ভব হ'য়ে উঠবে। কাজেই চেষ্টাচরিত্র ক'রে এখনি পাত্রস্থ করা ভালো। আমার অবস্থা তো দেখছো। দুই মেয়ের বিয়ে দিতেই প্রায় সর্বস্বান্ত হয়েছি। ছাপোষা মানুষ, দিন আনি দিন খাই। বড়ো ছেলেটা তো অপদার্থ, ব'সে খাবার যম—'

এখানে জ্যাঠাইমা ফোঁস করলেন, 'ও-রকম বোলো না। হরু আমার নিতান্ত বাধ্য ছেলে। তা ছাড়া সোনার আংটি আবার বাঁকা কি? ছেলে ছেলেই। না-ই বা উপার্জন করলো, তবু তো সে মেয়েদের মতো ধনে

প্রাণে নিয়ে নামবে না? তার বিয়ের জন্য মাথায় হাত দিতে হবে না? এই তো সেদিন পদির মাসি একটা সম্বন্ধ এনেছে, মেয়েকে গয়না দেবে, বাক্সভরা কাপড় দেবে—'

'থামো, থামো। ঐ বুড়ো ছেলের গুণকীর্তন আর কোরো না। ও আমার জানা আছে।'

'কী জানা আছে?' চ'টে উঠলেন জ্যাঠাইমা।

জ্যাঠামশায় সে-কথায় কান না দিয়ে আসল কথায় এলেন, 'তাই বলছিলাম, এই সংসারের বোঝা ক'দিন বইতে পারবো কে জানে। টাকা-কড়ি যা ছিলো, সবই তো গেছে— তাই বলছিলাম কী—' একটু থামলেন নিবারণবাবু, 'তোমার স্থরি লেনের বাড়িটা এবার বিক্রি ক'রে দিলে কেমন হয়? ভালো খদ্দের পাওয়া যাচ্ছে, দামও উঠেছে।'

একটু চমকালেন স্থষমা দেবী। ঘোমটার ফাঁকে ভাস্থরের দিকে তাকালেন একবার। নিঃশব্দে দীর্ঘশ্বাস পড়লো একটি।

'বাড়িটার আর আছেই বা কী—' নিবারণবাবু আবার বললেন, 'পুরোনো ঝরঝরে, ভাড়াটে ভাড়া দেয় না, মিছিমিছি ট্যাক্সো গোনা। কাজেই আমার মতে ওটা বিক্রি ক'রে দেয়াই যুক্তিসংগত কাজ। কী বলো?'

বলবেন কী, বুকটা ধকধক করছে তাঁর। সব ফুরিয়ে গেলো? দশ বছরে সব শেষ? এখন বাড়িটায় হাত পড়েছে? পুরো দশ হাজার টাকার লাইফ-ইনশিওর ছিলো, গয়নাতেও কিছু কম নয়। তা ছাড়া কিছু হাতেও ছিলো, টুকটাক এটা-ওটা বিক্রির টাকাও মন্দ ছিলো না। সে-সব তিনি আসবার সময়েই ভাস্থরের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। আর এখানে আসবার পরে কয়েক মাসের মধ্যেই যখন লাইফ-ইনশিওরেন্সের টাকাটাও হাতে এলো স্থষমা দেবীর ইচ্ছে ছিলো সেটা তিনি নিজের নামে বা

সুলেখার বিয়ের নামে রেখে দেন। পারেননি। কিছুতেই পারেননি। এঁদের ভালোবাসা যত্ন মমতার আতিশয্যে তখন তিনি আকণ্ঠ মগ্ন। তা ছাড়া বৈষয়িক বিষয়ে খেয়াল করবার মতো মনের অবস্থাও ছিলো না, গয়নাগুলো ট্রাঙ্ক খুলে জ্যাঠাইমা নিজেই নিজের কাছে নিয়ে রাখলেন, বললেন, 'এ-অবস্থায়, তোর মাথার ঠিক নেই, কবে কোথায় বাক্স খুলে রেখে চোরের পেটে দিবি— শুধু তাই নয়, দামি-দামি শাড়িগুলোও সেই সঙ্গে জ্যাঠাইমা যত্ন ক'রে রাখতে নিয়ে গেলেন। কী বলবেন মা। বলবার মতো স্বভাবও নয়, মনের অবস্থাও নয়। একই বাড়ি, একজনের কাছে থাকলেই হ'লো। আর জ্যাঠাইমা কি তাকে মায়ের বাড়া হ'য়ে রক্ষা করছেন না এই জ্বলন্ত যন্ত্রণা থেকে। আর তারপর জ্যাঠামশায় যখন টাকাগুলো ভালোভাবে ব্যাঙ্কে ফিক্স্‌ড ডিপোজিট দিয়ে রেখে দিলেন নিজের নামে তখনই বা বলবার কী ছিলো? থাক না। একজনের নামে থাকলেই হয়। উনি কি তাঁর বিধবা ভ্রাতৃবধূকে কখনো ঠকাবেন, না কি ঘাড়ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দেবেন বাড়ি থেকে? বাকি জীবন এখানে থাকতে হবে। তিনটে নাবালক শিশুকে মানুষ করতে হবে, এই ভাসুরই তো সকলকে খাওয়াবেন, পরাবেন, ভালোমন্দ দেখবেন, রক্ষণাবেক্ষণ করবেন, কোন লজ্জায় সুষমা দেবী ঐ টাকাগুলো নিয়ে ভাসুর যা করছেন তার বিরুদ্ধে কথা বলবেন। কিংবা স্বার্থপরের মতো নিজের হাতে আঁকড়ে রাখবেন সব। স্বামিহীন শোকার্ত হৃদয়ে আসক্তিও ছিলো না কিছুর উপর। সংসারের মন্দ দিকটা মনেও আসেনি। সমস্ত কিছু হস্তগত ক'রেই যখন সুর বদলালেন এঁরা, হতবাক হ'য়ে গিয়েছিলেন। বিশ্বাস করতে সময় লেগেছিলো। আর বিশ্বাস যখন পাকা হ'লো ফেরবার উপায় ছিলো না। তিনি বুঝলেন সব গেছে; দাবি করবার, চাইবার, নেবার আর-কিছু নেই তাঁর। তা নিয়ে একটা কথা বললেও

এ-বাড়ি ছাড়তে হবে। হবেই। ওটা তাদের মর্মস্থান, সেখানে হাত পড়লে, আমার জিনিস আমাকে দাও ব'লে দাঁড়ালে মুহূর্তে ফয়সালা হ'য়ে যাবে সব। একদিনের জন্যও সুষমা দেবী আর স্থান পাবেন না এখানে। ঐ ঘটনার উপর সম্পূর্ণ যবনিকা প'ড়ে গেছে। মেয়ের জেদি একরোখা স্বভাবে সর্বদাই সন্ত্রস্ত ছিলেন তিনি, ভয়ে তার কাছে একবারের জন্যও ভুলেও এ-সব কথা প্রকাশ করেননি। বুক ফেটে গেছে, কতো রাত বিনিদ্র কেটে গেছে কিন্তু তবুও তিনি তার সমব্যথী, সমদুঃখী, একমাত্র বন্ধু তাঁর মেয়েকে বলতে পারেননি কথাটা।

কিন্তু সব নিয়েও খরচ পোষালো না? এখন বাড়িটা বিক্রি করতে হবে? ঘেমে উঠলেন সুষমা দেবী।

নিবারণবাবু থেমে-থেমে বললেন, 'কী বলো তুমি এ-বিষয়ে?'

অস্ফুটে বললেন, 'ভাঙাচোরা দেয়াল-টেয়ালগুলো সারাই ক'রে নিলে হয় না?'

'হ'লে আর বলবো কেন? ভাড়াও পাচ্ছো না, প'ড়ে থেকে শেয়াল-কুকুরের আস্তানা হচ্ছে, এর পরে তো কানাকড়িও দাম পাবে না।'

'তা হ'লে আর আমি কী বলবো।'

'শোনো কথা—' গলায় দরদ দিলেন জ্যাঠাইমা, 'তুই বলবি না তো বলবে কে? তোর বাড়ি—'

নিবারণবাবু বললেন, 'তা হ'লে আমার নামে তুমি একটা পাওয়ার অব অ্যাটর্নি লিখে দাও। তোমার নামে থাকলে তো আর আমি কিছু করতে পারবো না?'

সুষমা দেবী চুপ।

অপেক্ষা ক'রে-ক'রে উঠে দাঁড়ালেন নিবারণবাবু। গভীরভাবে বললেন, 'ভেবে ছাখো, কাল আমাকে জানিয়ো।'

জীবনে এই বোধ হয় প্রথম একটা দুরন্ত মনের জোরের পরিচয় দিলেন সুষমা দেবী। স্বয়ং ভাসুর তাঁকে ডেকে যে-কথা বলেছেন, সে-কথা আগুনে ঝাঁপ দিতে বলাই হোক আর জলে ডুবে মরতে বলাই হোক, সে-কথা রক্ষা করতে চিন্তা করবেন, দ্বিধা করবেন, এ তাঁর পক্ষে প্রায় অসম্ভব। তবু আজ মনে হ'লো, কথাটা মেয়েকে বোধ হয় একবার জিজ্ঞেস করা দরকার। হোক মেয়ে, তবু যেন মনে-মনে কোথায় তিনি সুলেখার কথা ভেবে ভরসা পান। নিজের অজান্তেই কখন যেন মেয়ের কাছে নিজের ভালো-মন্দ বুদ্ধি-বিবেচনা সব দায় সমর্পণ ক'রে ব'সে আছেন।

বলাই বাহুল্য নিবারণবাবু যে শুধু গম্ভীর হ'য়ে উঠে গেলেন তা নয়, জ্যাঠাইমাও থমথমে হ'য়ে উঠলেন। আর সেই থমথমে মুখের দিকে তাকিয়ে ভয় করলো সুষমা দেবীর। দাঁড়ালেন একটু, তারপর পায়ে-পায়ে বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে। মনটা খারাপ হ'য়ে গেলো।

সন্ধে হ'য়ে এসেছে। কার্তিকের সন্ধে, বিবর্ণ আকাশ কুয়াশায় ঘোলাটে হ'য়ে উঠেছে, আম জাম কাঁঠাল কলার বাগান-ঘেরা বাড়িটা যেন ঝামরে এসেছে চারদিক থেকে। মশার ভয়ে সব ঘরের জানালাগুলো বন্ধ ক'রে দিয়ে সুষমা দেবী প্রদীপ জ্বালালেন লক্ষ্মীর আসনের কাছে, ধুনো দিলেন গাঢ় ক'রে, তারপর লণ্ঠন জ্বালাতে এলেন ভাঁড়ারঘরের বারান্দায়।

লাঠিখেলা-ছোরাখেলা আজ জমেনি সুলেখার। কাল জ্যাঠাইমার মিষ্টভাষণে অভিভূত হ'য়ে অনেকেই আজ আসেনি, হয়তো আসবেও না। না-আসাই উচিত। ছাদ থেকে আসর ভেঙে দিয়ে সুলেখা গম্ভীর মুখে নেমে আসছিলো শিথিল পায়ে, কিন্তু শেষ তৃতীয় সিঁড়িটির মাথায় এসে থামতে হ'লো তাকে। বাঁ পাশে জ্যাঠাইমার ঘর, সিঁড়ির জানালা দিয়ে

পরিষ্কার দেখা যায় ভেতরটা, হয়তো অন্যমনস্কভাবেই তাকিয়েছিলো, তাকিয়েই পশ্চিমের দরজা ধ'রে ছবি হ'য়ে মাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে পা আর নামলো না। এমন-কিছু অস্ফুট কথাবার্তা নয়, এমন-কিছু গোপন ষড়যন্ত্রও নিশ্চয়ই নয় যে শুনতে পেলে বা দাঁড়িয়ে শুনলে অন্যায় হবে। অন্যায় হ'লেও হয়তো কান পাততো স্বলেখা। মাকে ডেকে জ্যাঠামশায় কী বলছেন সেটা অবশ্যই শোনবার যোগ্য। ভালোবেসে যে ডাকেননি সেটা তো অন্তত নিশ্চিত। মা যখন বাড়ি বিক্রির কথায় মাথা নিচু ক'রে রইলেন, তক্ষুনি কাগজ-কলম নিয়ে ব'সে পাওয়ার অব অ্যাটর্নি লিখে দিলেন না, যেন বিশ্বাস হ'লো না তার। জ্যাঠামশায়ের রাগি মুখটা উপভোগ করতে-করতে মা-র আগেই সে ঘরে এসে পৌঁছলো। আর তাকে দেখেই আধো-অন্ধকার ঘরে পরামর্শরত দুই ভাই বাবু আর ছোটু এগিয়ে এলো উত্তেজিতভাবে, 'দুটো টাকা দেবে, দিদি?'

লাঠিখেলা-ছোরাখেলার পার্টি ভেঙে যাওয়ার দুঃখটা মা-র বীরত্ব-দর্শনে একটু হালকা হ'য়ে উঠেছিলো স্বলেখার কাছে, ভাইদের আবদার সহাস্যে শুনে বললো, 'কী করবি?'

'বলো দেবে?'

'আগে বল কী করবি।'

'আগে বলো দেবে কিনা।'

'কারণ না-জানলে দেয়া যায় কখনো?'

'জেনে যদি না দাও।'

'না দেবার মতো কারণ হ'লে, তা জেনেও দেবো না, না-জেনেও দেবো না।'

বাবু মাথা চুলকোলো, 'বাড়িসুদ্ধ কাল সব্বাই জাদু দেখতে যাচ্ছে, আমরাও যাবো।'

'জাদু! জাদুঘর?'

'না, না, জাদু। ভানুমতীর খেলা।' ছোটু হেসে উঠলো।

'ভানুমতীর খেলা?'

'জানো না? সারা শহরের লোক তো জানে।'

'তাই নাকি?'

'নবাববাড়িতে এক ফকির এসেছে, মন্ত্রবলে সে নাকি সব করতে পারে।'

নবাববাড়ি শুনে চকিত হ'লো সুলেখা, 'কোথায় দেখায়?'

'নবাববাড়িরই কাজির মাঠে। কী সুন্দর সাজিয়েছে। গ্যালারি হয়েছে, গদির আসন করেছে, বক্স করেছে। নবাব-সাহেব তো রোজ ব'সে দেখেন। শত-শত লোক যাচ্ছে, দেখছে—'

'নবাবও যায়?' সুলেখার দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হ'য়ে উঠলো।

'রোজ। কাল স্পেশাল শো হবে। কী খেলা দেখাবে জানো?'

'কী।'

'একটা সুতোর বলকে উপরের দিকে ছুঁড়ে দেবে, সেই বলটা গিয়ে-গিয়ে একেবারে আকাশের মধ্যে ঢুকে যাবে, আর সুতোটা শক্ত তারের মতো দাঁড়িয়ে থাকবে। আর সেই তার বেয়ে বাজিকরের একটা ছেলে উঠে যাবে উঁচুতে, যেতে-যেতে তাকেও আর দেখা যাবে না।'

'মানে সে-ও আকাশের মধ্যে ঢুকে যাবে?'

'হ্যাঁ।'

'আর তোরা দেখবি?'

দু-ভাই হাসলো, 'গল্পটা শোনো না। সেই ছেলে শুধু আকাশে ঢুকে গিয়েই ক্ষান্ত হবে না। স্বর্গে গিয়ে দেবরাজ ইন্দ্রের সঙ্গে দারুণ যুদ্ধ করবে,

বাতাসে-বাতাসে সেই যুদ্ধের কাড়ানাকাড়া শুনতে পাবে লোকেরা। শেষে ছেলেটার হাত কেটে পড়বে নিচে, পা কেটে পড়বে, গলা কেটে পড়বে, মুণ্ডু কেটে পড়বে, ফকির তখন সেই কাটা হাত-পা-ধড়-মুণ্ডু সব জোড়া দিয়ে বস্তায় ভ'রে কালো কাপড়ে ঢেকে দেবে, তারপর মন্ত্র প'ড়ে জাদুদণ্ড ছুঁইয়ে দিতেই জোড়া-লাগানো মরা ছেলেটা আড়মোড়া দিয়ে জেগে উঠে বলবে— আমি কোথায় ?'

'ব্যস ?'

'ব্যস।'

'তবে তো দেখতেই হয়।'

'উচিত তো।'

'সঙ্গে-সঙ্গে তোদের নবাব-সাহেবকেও একটু ভালো ক'রে দেখে নেয়া যাবে।'

'দ্যাখোনি ?' এটা ছোটো ভাইয়ের প্রশ্ন। 'আমি কিন্তু খুব ভালো ক'রে দেখেছি সেদিন।'

'কবে ?'

'তোমাদের করোনেশনে পার্কের মিটিং-এ। ঠিক তোমার পিছনে দাঁড়িয়ে ছিলো। একদম সাধারণ ধুতি প'রে, ভাবছিলো কেউ চিনবে না। আমি ঠিক চিনতে পেরেছি। দেখতে কিন্তু খুব সুন্দর।'

'একটা কাজ করবি ?' ঠোঁট কামড়ালো সুলেখা।

'কী।'

'তোদের টিকিটের সঙ্গে আমার জন্যও একটা টিকিট কিনে আনবি

'তুমি যাবে ?' বাবু উৎসাহিত হ'য়ে উঠলো।

ছোটু বললো, 'মাকেও নিয়ে চলো না ? বাড়ির সবাই তো যাচ্ছে

'যাচ্ছে বুঝি ?'

'কোথায় যাচ্ছে তা বলতে বারণ ক'রে দিয়েছেন জ্যাঠাইমা। কিন্তু আমি টের পেয়েছি, ওরা ঐখানেই ঠিক যাবে।'

'জ্যাঠামশায় তো মারামারির ভয়ে অস্থির, কাজির মাঠে যাবেন কী ক'রে? ভয় করবে না?'

নরম পায়ে লণ্ঠন হাতে সুষমা দেবী ঘরে ঢুকলেন, আবছা আলোতে ঠাণ্ডা চোখে তিন ছেলেমেয়ের দিকে তাকালেন তিনি। মাথায় অনেক লম্বা হ'য়ে গেছে বাবু। আসছে-বছর ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেবে। যোগ্য হ'তে আর কতো বাকি? মনে-মনে বোধ হয় ভাবলেন কথাটা। আর ছোটু। ছোটু তেমনি রোগা, তেমনি ছোটো। স্বভাবেও ছোটো, দেখতেও ছোটো। আর সুলেখা। বুক ভ'রে নিশ্বাস নিলেন। মনে না-ক'রে পারলেন না (এটা সুলেখার অনুমান), সুলেখা তার ছেলে হ'লো না কেন? তা হ'লে আজ কিসের ভাবনা। ছেলেরা একটুও তাদের বাপের আদল পায়নি। সব পেয়েছে মেয়ে। যেন খুদে বসানো মানুষটি। সুষমা দেবী ঢোঁক গিললেন। আস্তে বললেন, 'লেখা, তোর সঙ্গে আমার কথা আছে।'

'আমার সঙ্গে!' এটাই আশা করছিলো সুলেখা। তবু অবাক হবার ভান ক'রে বাঁকা চোখে মা-র মুখের দিকে তাকালো সে।

সুষমা দেবী ছেলেদের গায়ে হাত বুলোলেন, 'একটু বাইরে যা তোরা।'

ঐটুকু ঘরে চারজন মানুষ এখন আর তারা ধরে না, গিশগিশ করে। বাবু ছোটু গিয়ে রাত্তিরে বৈঠকখানায় ঘুমোয়, কিন্তু অন্যান্য সময় আর কোথায় যাবে? এ-ঘরেই চারজনে জড়াজড়ি হ'য়ে থাকে। মন্দ লাগে না। চারজন চারজনকে প্রাণ ভ'রে ভালোবাসে, চারজন চারজনের দুঃখ বোঝে। সেদিক থেকে সুষমা দেবীর ভাগ্য ভালো। ছেলেমেয়েরা তাঁর সঙ্গে এখনো শিশুর মতো নিবিড় বন্ধনে আবদ্ধ। অবিশ্যি কে-ই বা কতোক্ষণ বাড়িতে থাকে। তবু যতোটুকু, ততোটুকুই নীরন্ধ্র।

মা-র কথা শুনে বাবু ছোটু বেরিয়ে এলো। দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে খাটের বাজুতে হেলান দিয়ে ক্লান্ত ভঙ্গিতে বসলেন সুষমা দেবী। একটু চুপ ক'রে থেকে বললেন, 'ওঁর মৃত্যুর পরে আমি লাইফ-ইনশিওর থেকে দশ হাজার টাকা পেয়েছিলাম—'

'দশ হাজার!' চমকে উঠলো সুলেখা।

'সে-টাকা সবই তোর জ্যাঠামশায়ের নামে ছিলো।'

'আমাকে বলোনি তো আগে।' শক্ত হ'লো সুলেখার মুখ।

'আমাকে জিজ্ঞেস করিস না, কেন সে-টাকা আমি দাবি করিনি, চেয়ে নিইনি, সব কৈফিয়ৎ তোকে আমি দিতে পারবো না। আমি স্বীকার করছি, আমারই দোষ। কিন্তু তারপর দশ বছর তো রইলাম এ-বাড়িতে? সেটাও তো কম কথা নয়?'

'বুঝলাম। এখন কী বলতে চাও বলো।'

মেয়ের কঠিন মুখের উপর চোখ বুলিয়ে সহসা হাত চেপে ধরলেন, 'একটা প্রতিজ্ঞা করবি গা ছুঁয়ে?'

'প্রতিজ্ঞা! কী প্রতিজ্ঞা?'

'আমাকে ছুঁয়ে বল সে-কথা তুই রাখবি?'

'তার জন্যে তোমাকে ছুঁতে হবে কেন? যদি বলি রাখবো, তবে তা রাখবোই। কিন্তু কী কথা রাখতে হবে সেটা না-জেনে কথা দিতে পারবো না।'

'আমি নিশ্চয়ই এমন-কিছু বলবো না, যাতে তোর ক্ষতি হ'তে পারে।'

'ক্ষতি আবার কী? ও-সব ক্ষতি-টতির কথা আমি ভাবছি না।'

'তবে কী ভাবছিস?'

'কিচ্ছু না।'

'তা হ'লে কথা দিচ্ছিস ?'

'বলো না কী কথা ?'

'এ-সব ছাড়তে হবে।'

'কী সব ?'

'মিটিং করা, মিছিল করা, স্বদেশী দলে মেশা।'

'জ্যাঠামশায় বললেন বুঝি ?'

'অন্যায় বলেছেন ?'

'তোমার কী মনে হয় ?'

'ঠিকই বলেছেন। আমিও তাই বলি। কী দরকার তোর বাজে কাজে মাথা গলিয়ে। কলেজ আর বাড়ি ছাড়া তুই কোথাও ঘোরাঘুরি করিস এ আমার একেবারে ইচ্ছে নয়। তা ছাড়া বাড়ির ছাদ থেকে ঐ-সব লাঠিসোঁটা বিদায় দাও। আড্ডা ভেঙে দাও।'

'আর ?'

'আর কী করিস আমি জানি না। যদি ক'রে থাকিস তা-ও বাদ দিতে হবে।'

'এতোক্ষণ ধ'রে জ্যাঠামশায়-জ্যাঠাইমা বুঝি এ-সবই শাসালেন ?'

'কথাটা কি মিথ্যে ?'

'সত্য-মিথ্যার প্রশ্ন নয়, আমার কোনো কাজ তোমার নিজের অপছন্দ হ'লেই তুমি বলবে, কিন্তু অন্যের প্রতিধ্বনি কোরো না, অন্তত আমার উপরে কোরো না। তুমি তো জানো সে-কথা আমি রাখবো না।'

মুহূর্তকাল চুপ ক'রে থেকে সুষমা দেবী বললেন, 'এ-সব ক'রে কী লাভ ? কেবল নিন্দে। অতো বড়ো একটা শক্তির বিরুদ্ধে তোরা কী করতে পারিস ?'

'পারা না-পারার কথা নয়। ইচ্ছে-অনিচ্ছের কথা। কিন্তু সে-কথা যাক, এটাই কি তোমার বলবার কথা ছিলো ?'

'তুই তো বুঝিস, আমি কতো অসহায়। বাবু ছোটু যতোদিন নিজের পায়ে দাঁড়াতে না পারবে, যতোদিন তোর বিয়ে দিতে না পারবো, পরের মুখের দিকে তাকিয়েই চলতে হবে আমাকে। এঁরা যা চান না, যা ভালোবাসেন না, তাঁদের বাড়িতে ব'সে সে-সব তো আমরা করতে পারি না।'

শক্ত মুখে জানালায় গিয়ে দাঁড়ালো স্বলেখা, আঁচলে মুখ মুছে গম্ভীর হ'য়ে বললো, 'কথা তোমার শেষ হয়েছে ?'

'না।'

'আমি পড়তে বসবো, তাড়াতাড়ি বলো।'

মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে অনেকক্ষণ চুপ ক'রে রইলেন, ইতস্তত ক'রে বললেন, 'তুই বড়ো হয়েছিস। আশা করি সব বুঝে জবাব দিবি।'

'তোমার কথার, না জ্যাঠামশায়ের কথার ?'

'যারই হোক, দুটো তো আলাদা নেই।'

'তোমার কাছে না থাকতে পারে, আমার কাছে যথেষ্ট আছে।'

'তুই কি ঝগড়াই করবি, কথাটা শুনবি না ?'

'বলো না।'

'শান্ত মনে যদি না শুনিস বলতে পারবো না।'

'বেশ বলো।' জানালা ছেড়ে মা-র সান্নিধ্যে এলো স্বলেখা, সুষমা দেবীর দুই চোখ চকচক করছে জলে। সহসা মাকে জড়িয়ে ধ'রে আদর করলো সে। 'তোমার সব কথা আমি শুনবো মা, কিন্তু ওঁদের মুখের দিকে আর তুমি তাকিয়ে থেকো না।'

সুষমা দেবী ঝুপ ক'রে ডুব দিলেন জলে, 'তোর জ্যাঠামশায় বাড়িটা বিক্রি ক'রে দিতে চান।'

'জানি।'

'কী ক'রে জানলি।

'তুমি কী বললে?'

'কিছু বলিনি।'

'কী বলবে ভাবছো?'

'ভাবছি, টাকার তো দরকার, বলছেন ভালো দাম পাওয়া যাচ্ছে—'

মা-র চোখে চোখ রাখলো সুলেখা, 'আমাকে গোপন ক'রে যতোদিন যা করেছো তার আর কোনো প্রতিকার নেই, কিন্তু এখন জ্যাঠামশায়ের কোনো লোভই আর চরিতার্থ হবে না।'

'এ-সব তুই কী বলছিস?'

'তোমার গয়নাগুলো কোথায়?'

সুষমা দেবী চুপ ক'রে রইলেন।

'তা-ও গেছে তো? এই দশ বছরে তা হ'লে খেতে-পরতে আমাদের কতো লাগলো মা?'

'বাজে কথা রাখ, যা বলছি জবাব দে।'

'আমাদের তো টাকার অভাব নেই— বাড়ি বিক্রি করবো কেন?'

'শোনো কথা, এতোক্ষণ বললাম কী?'

'হিসেবটা আগে নিয়ে নি।'

সুষমা দেবী ভুরু কুঁচকোলেন, 'ছাখ, এ-সব কথা নিয়ে কিন্তু ঘাঁটাঘাঁটি করবি না। আমি কোনোদিন কিছু বলিনি। হাজার হোক, গুরুজন।'

'উঃ!' ছটফটিয়ে উঠে দাঁড়ালো সুলেখা, 'তোমার এই গুরুভক্তিটা একটু কমাও তো। দয়া ক'রে গুরুজনটিকে জিজ্ঞেস কোরো, ভাইয়ের নাবালক সন্তান আর তার স্ত্রীকে ঠকিয়ে নিজের মেয়ে দুটিকে না-হয় কিছু

খরচপাতি ক'রে বিয়ে দিয়েছেন, তা ছাড়া আর কী এমন মোক্ষলাভটা হ'লো ?'

জিভ কাটলেন সুষমা দেবী, 'ছিঃ, এ-সব কী কথা লেখা ? ইচ্ছে করলে তো উনি তাড়িয়েও দিতে পারতেন ? লোকেরা তো তা-ও দেয় ?'

'বাড়িটা ওঁর একার হ'লে হয়তো লোকেদের দৃষ্টান্তই অনুসরণ করতেন। কেলেঙ্কারির ভয়ও তো আছে ! তা ছাড়া দু-দু-জন বিনিপয়সার কাজের লোক নেহাৎ ফ্যালনা নয় আজকালকার দিনে।'

'মনে রাখিস, দশটা বছর এখানেই আছিস। খেতে-পরতে পয়সা লাগে না, না ? আরো কতোদিন থাকবো হিসেব আছে তার ?'

'বাড়ি বিক্রি করতে পারলে অবিশ্যি একটা হিসেব চটপট ক'রে ফেলতে পারবেন জ্যাঠামশায়, আর আমিও অন্য কোনো-কিছুর হিসেব না জানি, লাথিগুঁতো অনাদর-অবহেলার হিসেবটা তো অন্তত জানি ! আজ যে এতো বড়ো হয়েছি, কলেজে পড়ছি তার জন্যে কতো লড়াই করতে হয়েছে তার হিসেবও ভালো ক'রেই মনে আছে আমার। যাকগে, মোট কথা বাড়ি আমাদের বিক্রি হবে না। দয়া ক'রে এ-কথাটা ওঁকে জানিয়ে দিয়ো।'

রাগ করলেন সুষমা দেবী, 'না-করলে চলবে কী ক'রে ? রাগ ক'রে যদি দেশে পাঠিয়ে দেন—'

'পাঠাবার কর্তা কি উনি ?'

'নিশ্চয়ই। তোর বাবা নেই, উনিই অভিভাবক। ওঁর কথাতেই ওঠা-বসা।'

'বেশ তো, এ-বাড়িতে যদি নেহাৎ না-ই থাকতে দেন, সুরি লেনের বাড়িতেই চ'লে যাবো। সেখান থেকে তো আর জোর ক'রে দেশে পাঠাতে পারবেন না।'

'সে কী ?'

'আর টাকাকড়িরও একটা হিসেব নেয়া দরকার।'

'কী বলছিস তুই ?' মেয়ের কথায় তাজ্জব ব'নে গেলেন মা।

বড়ো-বড়ো দম নিয়ে সুলেখা বললো, 'আর এ-বাড়ির অংশও ছাড়বো না। লোক ডাকিয়ে বাড়ি ভাগ করিয়ে তবে অন্য কথা।'

'ছী-ছি-ছি—' এতোখানি জিভ কাটলেন সুষমা দেবী।

'ছী-ছি তোমাকে।' উত্তেজনায় হাঁটতে লাগলো সুলেখা, 'যাদের বাপ অতো টাকা রেখে গেছেন, তাদের তুমি রাস্তার ভিখিরির মতো মানুষ করেছো। ওদের কাছে এতো টাকা আমাদের গচ্ছিত ছিলো, তবু কোনো দিন নিজের ছেলেমেয়েদের সমান ওরা আমাদের খাওয়াননি, পরাননি। ডাল ভাত মুড়ি। এই চার বেলার খাওয়া। আর এই গুদমে থাকা, এতো বছরের মধ্যে একটা ভালো কাপড় পর্যন্ত কিনে দেননি। অথচ খরচের বেলায় আমাদের বেশি ওদের কম। এই অদ্ভুত অঙ্কটার একটা ফয়সালা করতে হবে তো ?'

ব্যস্ত হ'য়ে ন'ড়ে-চ'ড়ে উঠে দাঁড়ালেন সুষমা দেবী। 'চুপ কর লেখা, চুপ কর। কেউ শুনে ফেললে কী হবে বল দেখি ? ছী-ছি, এতো বড়ো গুরুজন, তিনি যা-ই করুন, তাই ব'লে তুই বলতে পারিস এ-সব কথা ? আমার লজ্জায় ম'রে যেতে ইচ্ছে করছে।'

লালচে মুখে হাসলো সুলেখা, 'লজ্জায় আর মরতে হবে না তোমাকে, তোমার গুরুজনটি এবার ভাত না-দিয়েই মারতে পারবেন বাড়ি বিক্রি না-করলে। সে-টাকাটা তো এখনো খাওয়া হয়নি। চোর! পাপিষ্ঠ!'

ক্ষোভে দুঃখে আধখানা হ'য়ে এবার ঘর ছেড়ে সুষমা দেবী মেয়ের সামনে থেকে বাইরে এসে দাঁড়ালেন। এ-বাড়ির বউ তিনি। কোন

ছেলেবেলায় এসেছেন, চিরদিন ঘোমটা টেনে অন্ধের মতো সকলের সব কথা শুনে, মাননীয়দের মান্য ক'রে, শ্বশুর-ভাসুরের সেবা ক'রেই তিনি অভ্যস্ত। কোনোদিন তিনি তাঁদের বিচার করেননি, বিশ্লেষণ করেননি, ন্যায় করুন, অন্যায় করুন, তাঁরা তাঁর চেয়ে বড়ো এই একমাত্র অভিজ্ঞান। এখন মেয়ে কিনা এ-রকম বলছে। এ-রকম অপমান করছে, এ যে পাপ। এ-লজ্জা তিনি রাখবেন কোথায়?

ঘরের মধ্যে তক্ষুনি ফিরে এলেন আবার, 'ছাখ, এ-সব নিয়ে যদি জ্যাঠার সঙ্গে অসভ্যের মতো কোনো কথাবার্তা বলিস তা হ'লে কিন্তু ভালো হবে না।'

সুলেখা জবাব দিলো না, পড়তে বসলো বই-খাতা খুলে।

'বুঝলি তো? আমার কথা মনে থাকবে তো?' বিশ্বাস নেই তাঁর মেয়েকে। যা মুখরা, যে-রকম উদ্ধত, লঘুগুরু ভেদ আছে নাকি?

বইয়ের অক্ষর থেকে মুখ তুলে মাকে খানিকক্ষণ দেখলো সুলেখা, তারপর আবার পড়ায় মন দিলো।

কথা তুললো খেতে ব'সে।

'জ্যাঠামশায়।'

গরম ভাতে গরম মুসুরির ডাল আর ডালের বড়া দিয়ে গ্রাসটা মুখের মধ্যে পুরে নিবারণবাবু ভুরু কুঁচকে ভারি গলায় জবাব দিলেন, 'কেন?'

'আমাদের সুরি লেনের বাড়িটা কি বিক্রি করতে চাইছেন?'

'কেন, তার জন্যে তোর অনুমতি নিতে হবে নাকি?' কথার সুরে রাগ এবং টিটকিরি দুটোই স্পষ্ট হ'য়ে উঠলো।

'আপনি না নেন, মাকে তো নিতেই হবে।'

'ও, তোর মা বুঝি তোর অনুমতি না-নিয়ে কিছু করতে পারে না?'

'সম্প্রতি অনেক ঠেকে এই সুবুদ্ধিটুকু তাঁর হয়েছে ব'লে মনে হয়।'

'তাই নাকি? তা হ'লে বাড়ি বিক্রি করা না-করা এখন তোর মতামতের উপর নির্ভর করছে?'

'হ্যাঁ।'

'এটা ভেবে দেখেছিস, খাওয়া পরা থাকা সমস্তই যাদের অন্যের উপর নির্ভর, তাদের অতো স্বাধীন ইচ্ছার কোনো মূল্য নেই।' চাপা ক্রোধে নিবারণবাবুর গলার শিরা ফুলে উঠলো।

ঠাণ্ডা গলায় সুলেখা বললো, 'হ্যাঁ, সেটা একটা মস্ত সমস্যা বটে। তা, আমার বাবার দশ হাজার টাকার লাইফ-ইনশিওরের টাকাটা তো আপনার কাছে আছে, আমি ভাবছি—'

এ-রকম একটা কথা শোনবার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না নিবারণবাবু, চমকে গেলেন। সুলেখার জ্যাঠাইমাও মাছের কাঁসি থেকে মাছ বেছে কাকে কোনটা দেবেন ঠিক করতে-করতে থমকালেন। নিবারণবাবুর ছেলেমেয়েরাও একটু হকচকিয়ে তাকালো সুলেখার মুখেব দিকে। কয়েক মুহূর্তের জন্য একটা অখণ্ড নিস্তব্ধতা। তারপরেই নিবারণবাবু দাঁতে দাঁত ঘ'ষে খিঁচিয়ে উঠলেন, 'টাকা তো তোমাদের ব'সে আছে কিনা? দশ বছর ধ'রে কাঁড়ি-কাঁড়ি তো গেলোনি কেউ।'

'রাগ করছেন কেন? ঐ টাকা ভেঙেই যে আপনি আমাদের খাইয়েছেন তা তো কখনো শুনিনি, বরাবর তো ব'লে আসছেন, আপনিই আমাদের খাওয়ান। বাড়িতে লোক এলেই তো সে-কথা ব'লে জ্যাঠাইমা দুঃখ করেন।'

'চুপ কর, অসভ্য মেয়ে।' এটা জ্যাঠাইমার ধমক।

সুলেখা সে-ধমকটা শুনেছে ব'লে মনে হ'লো না, সোজা নিবারণ-

বাবুর দিকে তাকিয়ে থেকে বললো, 'তা হ'লে সেই দশ হাজার টাকা থেকে দশ বছরে আমাদের কতো খরচ হয়েছে ?'

'দশ বছরের খাওয়া-পরা ঐ দশ হাজারেই চলেছে তোমাদের না ? আমার আর ঘাড় ভাঙোনি ! পাজি মেয়ে।'

'মিছিমিছি সংশয় রেখে লাভ কী, তার চেয়ে বরং একটা হিসেব ক'রে ফেলা যাক না। দেখা যাক না, কার ঘাড় কে ভেঙেছে। আমরা চারজন মানুষ, দু-বেলা দুটো ভাত আর সকালে বিকেলে দু-মুঠো মুড়ি এই তো খেয়েছি। তা-ও বাবু ছোটু খাবার উপযুক্ত হয়েছে এই সেদিন। এতোদিন ওরা ছোটো ছিলো, অল্প খেয়েছে, আর মা রাত্রে একমুঠো খই খেয়ে জল খান। হিসেব যখন করাই হচ্ছে তখন এগুলোও তার মধ্যে পড়বে। আর তরি-তরকারি বেশির ভাগটাই জমি থেকে ওঠে, ওতে আপনারও যতো অধিকার, আমাদেরও ততোটাই। পুকুরটাতে অপর্যাপ্ত মাছ হয়, অর্জুন নিকারীকে বন্দোবস্ত দিয়েছেন, সে সবটা নিয়ে রোজ আমাদের তিন পো ক'রে মাছ দেয়, তার জন্য পয়সা লাগে না। যদিও আমাদের অর্ধেক ভাগ, তবু সে-মাছ থেকে যতোটুকু পরিমাণ আমাদের দেয়া হয় সেটা চোখে দেখতে গেলে দূরবীন লাগে। তা হ'লে ভেবে দেখুন এক মাসে আমরা তিন ভাইবোন আর মা কতো টাকার চাল আর মুড়ি খেয়েছি। সে-হিসেবও আপনাকে আমি মুখে-মুখে দিতে পারি। আট আনা দিয়ে এক টিন মুড়ি রাখেন জ্যাঠাইমা, পাঁচ দিন যায়। আমরাও খাই, ওরাও খায়। আট আনায় পাঁচ দিন গেলে দশ দিনে এক টাকা, আর তিরিশ দিনে তিন টাকা। তিন টাকার মধ্যে তিন ভাগ করলে এক ভাগে আমাদের এক টাকা পড়ে। আর ওটা এক ভাগই হবে, তার কারণ ওরা ছ' ভাইবোন, আমরা তিনজন। তার মানে জলখাবার এক টাকা মাস। আর চাল, ধরুন এক সের দিন। তার বেশি

তো কিছুতেই নয়। তিরিশ সের চালের দাম কুড়ি টাকা মন হিসেবে পনেরো টাকা। আসল খরচ তা হ'লে ষোল টাকা। কাপড়-চোপড় আপনারা দেন না, আগে পুজোর সময় ঝি-চাকরদের সঙ্গে মিলিয়ে দু-চারবার দিয়েছেন বটে, আমরা তা কোনোদিন নিইনি। কাপড়-চোপড় আমাদের প্রচুর ছিলো, দরকারও হয়নি তখন। আর যতোদিন থেকে দরকার হয়েছে ততোদিন থেকে আমি টিউশনি করি, আমিই কিনে নিই। তা হ'লে হিসেব ক'রে দেখুন মাসিক খরচ আমাদের কতো দাঁড়ায়।'

ধৈর্যচ্যুতি ঘটলো নিবারণবাবুর, ফেটে গিয়ে ব'লে উঠলেন, 'বেয়াদব মেয়ে, তুই আমার সঙ্গে এভাবে কথা বলিস, তোর এতোটুকু ভয় নেই, লজ্জা নেই ?'

'লজ্জা আর ভয় ওটা আমার মায়ের একলার সম্পত্তি। তার ফল এমন-কিছু ভালো হয়নি যে অনুকরণ করবো। সে-কথা যাক,—আসল কথা যেটা, সেটা হচ্ছে এই, বাড়ি বিক্রি করার কথাটা উঠলো কেন ? আপনি যদিও বলেন, বাড়িটা ভেঙে গেছে, খালি প'ড়ে আছে, আমি জানি কথাটা ঠিক নয়।'

'তার মানে আমি মিথ্যে কথা বলছি ?'

'তা কেন বলবেন। তবে আমিও ঠিক কথাই বলছি। বাড়িটাতে এতোদিন যিনি ভাড়াটে ছিলেন তাঁর মেয়ে আমাদের সমিতির সভ্য। মাত্র একমাস হ'লো আপনি তাদের নোটিশ দিয়ে উঠিয়ে দিয়েছেন, বিক্রি করবেন ব'লে। বাড়িটা পুরনো হয়েছে ঠিকই, সারানো দরকার, রং করা দরকার, কিন্তু তাই ব'লে বসবাসের অযোগ্য নয়। তা হ'লে তার ভাড়া নিয়মিতভাবে পঁয়ত্রিশ টাকা ক'রে আপনি আদায় করতে পারতেন না !'

ভাতের থালা ঠেলে দিয়ে নিবারণবাবু চেঁচিয়ে উঠলেন, 'কী বলতে চাস তুই, তোদের টাকা আমি চুরি করেছি?'

জল খেলো সুলেখা, 'না না, সে-কথা উঠছে কিসে? ফিক্স্‌ড ডিপোজিটে দশ বছর ধ'রে দশ হাজার টাকা প'ড়ে থাকলে সুদ কতোটা হ'তে পারে, সেটাই ভাবছি মনে-মনে। ধরুন, পঁয়ত্রিশ টাকা ক'রে মাসে যে-বাড়িভাড়াটা আপনি নিয়মিত নিচ্ছিলেন, সেটাই আপনি আমাদের খাওয়ার জন্য খরচ করেছেন। ষোল টাকার জায়গায় তার দ্বিগুণের চেয়ে বেশি টাকাই ধরা গেলো সে-বাবদ। থাকার তো খরচ নেই? এ-বাড়ি যখন আমার দাদুর তখন আমাদেরও নিশ্চয়, কাজেই ঐ গুদমটাতে থাকতে দিয়েছেন ব'লে যে ভাড়া নেবেন তা পারবেন না। সুতরাং দশ হাজার টাকা নিশ্চিন্ত মনে দশ বছর ধ'রে ব্যাঙ্কে প'ড়ে থেকে চক্রবৃদ্ধি হারে সুদে বেড়ে নিশ্চয়ই এতোদিনে হাজার পনেরোতে দাঁড়িয়েছে। তা হ'লে সেই পনেরো হাজার আর আমার মায়ের গয়না। তা-ও তো কিছু মন্দ নয়? আপনি তো সবই জানেন। ঠাকুমার সীতাহার, কানপদ্ম আর রতনচূড় তিনি মাকেই দিয়েছিলেন। তাল-তাল সোনা সব। তা ছাড়া মায়ের বিয়ের পুরোনো ভারি-ভারি গয়নাগুলোও সব তেমনি আছে। আবার কলকাতা গিয়ে বাবা হাল-ফ্যাশানে আলাদা সব গড়িয়ে দিয়েছিলেন। সব মিলিয়ে হাজার তিরিশেক টাকার সোনা তো আছেই, বেশিও হ'তে পারে। এখন আমার যথেষ্ট বয়েস হয়েছে, কাজেই এ-সব আমি এখন বুঝে নিতে চাই। আপনিও বুড়ো হয়েছেন, পরের ঝঞ্ঝাট হাতে রেখে লাভ কী আপনার?'

'লেখা!' নিবারণবাবু গগন ফাটিয়ে গ'র্জে উঠলেন। গলার স্বরে দেয়াল কাঁপলো, ছেলেমেয়েরা কেঁপে উঠলো, নিজের ঘর থেকে সুষমা দেবী ছুটে এলেন।

কিন্তু সুলেখার মুখে চোখে কোনো ভাবান্তর বোঝা গেলো না। নির্বিকার ভঙ্গিতে কপালের উড়ে-পড়া চুল পিছনে ঠেলে দিলো, মুখের ভাত আয়াস ক'রে চিবোতে-চিবোতে আবার বললো, 'এতো টাকা আমাদের, অথচ এখানে আমরা থাকি আশ্রিতের মতো। উঠতে-বসতে আপনারা ভাতের খোঁটা দেন। মায়া-মমতা না-হয় না-ই আছে, ধর্ম নেই? বিবেক নেই? মনে-মনে জানেন না কার ভাত কে খাচ্ছে? কী কষ্টে আমরা থাকি এখানে! ভিখিরির চেয়েও অধম হ'য়ে। আর যদিও এ-বাড়িটাতে আপনার মতোই আমাদের অধিকার তবুও আপনাদের ব্যবহারে সব সময় মনে হয়, আমরা যেন বাইরের কেউ। সেবার আমার ভাইয়ের অসুখে আপনি একটা ডাক্তার পর্যন্ত ডাকলেন না। মাকে দিয়ে তিনটে ঝিয়ের খাটুনি একলা খাটান। কেন? কিসের জন্য। কী ভেবেছেন আপনারা? এতোদিন আমি জানতাম না এ-সব, কয়েক ঘণ্টা আগেও জানতাম আপনাদের দয়াভিক্ষাই আমাদের জীবনের একমাত্র অবলম্বন। কিন্তু আজ এই মুহূর্ত থেকে সব ছবি বদলে যাবে এ-বাড়ির। আমি আমাদের পাওনা-গণ্ডা পাই-পয়সাটি পর্যন্ত বুঝে নেবো এবার। দরকার হ'লে লক্ষ্মীবাজারের উকিলদাদুকে ডেকে আনবো আমি। আমি আমার মা নই, আমি আমার—'

সুষমা দেবী এক হাত ঘোমটা দিয়ে ছুটে এসে হাত ধ'রে এক হ্যাঁচকা টানে মেয়েকে দাঁড় করিয়ে দিলেন। লজ্জায় দুঃখে ম'রে গেলেন ভাসুর আর জায়ের কাছে। নিবারণবাবু ভাতের থালাটা তুলে এক আছাড় মেরে খাওয়া ফেলে উঠে দাঁড়ালেন, ভাইঝির মুখের সামনে গিয়ে রাগ সামলাতে না-পেরে একটা চড় মারলেন ঠাশ ক'রে, ক্রুদ্ধ বাঘের তর্জনে-গর্জনে ভ'রে ফেললেন ঘরটা। 'বেতরিবৎ বেয়াদব মেয়ে। এতো বড়ো কথা তোমার? এতো বড়ো আস্পর্ধা! বেরো, বেরিয়ে যা, এই মুহূর্তে

বেরিয়ে যা তুই এ-বাড়ি থেকে, নিয়ে আয় তোর উকিলদাদুকে, মামলা কর, একটা পয়সা আর পাস কিনা আমার কাছ থেকে ছাখ ভালো ক'রে। এক মুঠো ভাতের জন্য রাস্তায়-রাস্তায় ঘুরলেও আর তেল গলবে না এখানে। যা, এক্ষুনি বেরিয়ে যা—' হনহন ক'রে কুয়োতলায় গিয়ে রাশি-রাশি জল ঢেলে আঁচাতে-আঁচাতে গলা ফাটিয়ে আরো যে কী বললেন আর বললেন না, তা তিনিই জানেন।

মা উপুড় হ'য়ে জ্যাঠাইমার পা দুটো জড়িয়ে ধরলেন, 'ক্ষমা করুন, ক্ষমা করুন। আমার দুঃখ বুঝে ওকে ক্ষমা করুন আপনারা।'

সুষমা যতো জোরে টেনে মেয়েকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলেন, তার দ্বিগুণ জোরে মাকে টেনে দাঁড় করিয়ে দিলো সুলেখা, বললো, 'কিসের ক্ষমা? কার জন্য ক্ষমা? তোমার ইচ্ছে হ'লে তুমি যতো খুশি মাথা খোঁড়ো সকলের পায়ে, কিন্তু আমার জন্য নয়। কিছুতেই নয়। আর মানুষের মাথাটা এমন-কিছু নিকৃষ্ট অঙ্গ নয় যে যে-কোনো একটা মানুষের পায়েই সেটা ঠেকানো যায়। নিজেকে নিজে একটু সম্মান করতে শেখো। দাঁড়াতে শেখো—'

এর পরে সুষমা দেবী কাঁদতে-কাঁদতে দেয়ালে মাথা কুটে রুদ্ধস্বরে বললেন, 'আমার কেন মরণ হয় না, আমার কেন মরণ হয় না?'

ঘর ছেড়ে যেতে-যেতে বিদ্রূপে ঝলসে উঠলো সুলেখা, বাঁকা চোখে তাকিয়ে বললো, 'তুমি তো সর্বদাই ম'রে আছো, আর কতো মরবে? লজ্জায় ম'রে আছো, ভয়ে ম'রে আছো, দুঃখে ম'রে আছো, অপবাদের আশঙ্কায় ম'রে আছো, সকলের পায়ের তলায় গড়িয়ে সারা দিনই তো ম'রে আছো তুমি। বরং ভগবানকে ডেকে বলো, তোমার এই মরা দেহে একটু প্রাণশক্তি দিন, তোমার মতো মানুষকেও যারা ঠকাতে দ্বিধা করে না, সেইসব বিবেকহীন মানুষগুলোকে একটু তাকিয়ে দেখুন।'

। এগারো ।

বলাই বাহুল্য সেই রাতে আর খাওয়া-দাওয়া হ'লো না কারো। কারো মুখেই আর একটি শব্দ শোনা গেলো না। পরের দিন সকালেও থমথমে। সুলেখা ছাতা নিয়ে কোথায় বেরিয়ে গেলো, এলো সেই বারোটায়। আর এসেই জিনিসপত্র গোছাতে ব'সে গেলো। খেলো না। বাবু ছোটুর ভানুমতীর খেলা দেখা হ'লো না, সুলেখার নবাবদর্শন হ'লো না, কারো সঙ্গে কারো কথা বিনিময় হ'লো না, একটা জগদ্দল পাথরের মতো ভারি বাড়িতে ভারি মানুষেরা চলতে-ফিরতে লাগলো নিঃশব্দে।

তার পরের দিন সকালে সুলেখা ঘোষণা করলো, 'আমরা কাল থেকে আমাদের সুরি লেনের বাড়িতে চ'লে যাবো।'

শুনে জ্যাঠাইমা চোখ না-তুলেই বললেন, 'বেশ।'

'জ্যাঠামশায়কে বলবেন।'

'বলবো।'

'মা-র গয়নাগুলো মাকে দিয়ে দেবেন, দরকার হবে। আর বাবার লাইফ-ইনশিওরের টাকাটা আমার মায়ের নামে ট্রান্সফার করিয়ে দিতে হবে।'

এবার জ্যাঠাইমা জবাব দিলেন না কোনো, জবাবের প্রত্যাশায় সুলেখাও দাঁড়ালো না।

নিবারণবাবু বাজারে গিয়েছিলেন, বোধ হয় আধ ঘণ্টার মধ্যেই হাঁপাতে-হাঁপাতে দৌড়ে বাড়ি ফিরে এলেন। পিছনে একজন বোরকা-পরা স্ত্রীলোক, রোজের ডিমওয়ালি হাসানের মা আর বুড়ো গোফুরের ছোটো নাতি রমজান খাঁ। ভয়ে কাঁপছে সব। ঘরে ঢুকে ঠাশ ক'রে দরজাটা বন্ধ ক'রে দিয়েও কাঁপুনি কমছে না কারো।

জ্যাঠামশায় ঊর্ধ্বশ্বাসে বললেন, 'মারামারি। সাংঘাতিক মারামারি। হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা লেগেছে। দোকান-বাজার লুট হ'য়ে যাচ্ছে, বাড়িতে-বাড়িতে—'

এর বেশি বলবার সুযোগ হ'লো না জ্যাঠামশায়ের, 'অ্যাঁ-এ-এ' ব'লে ঢ'লে পড়লেন জ্যাঠাইমা। মা দৌড়ে জল-পাখা নিয়ে এলেন। বাড়িসুদ্ধু লোক ছুটে এলো সে-ঘরে, তারপরেই দুদ্দাড় সব দৌড়ালো দরজা-জানালা বন্ধ করতে। জ্যাঠামশায় কোঁচার খুঁটে ঘাম মুছতে-মুছতে কথা শেষ করতে চেষ্টা করলেন। 'কী কাণ্ড! কী ভয়ংকর ব্যাপার! বলা নেই, কওয়া নেই, শালারা—' ব'লেই হাসানের মা-র দিকে তাকিয়ে থেমে গেলেন, ঢোক গিলে মিষ্টিমুখে বললেন, 'তোমরা বোসো মা, বোসো। কিচ্ছু ভয় নেই। কী ব্যাপার বলো দেখি রমজান?'

বোরকা-পরা স্ত্রীলোকটি আর হাসানের মা জড়োসড়ো হ'য়ে বসলো এক কোণে, রমজান কাঁদো-কাঁদো হ'য়ে বললো, 'কেমন কইরা কমু মাহাজান, সকালবেলা নাস্তা কইরা কামে বাইর অইছি, এইর মৈধ্যেই এই। ডরের চোটে আপনের পিছে-পিছে আইয়া এইখানে ঢুকলাম। অখন কয়েন দেখি— কেমনে বাসায় যাই? আমাগো জাত যখন আপনেগো মারতেছে, তখন আপনেগো জাইতই কি ছাইরা কথা কইবো?'

'কী যে বলিস।' জ্যাঠামশায় সান্ত্বনা দিলেন, 'তোদের কিছু ভয় নেই, নিশ্চিন্তে বোস। হাঙ্গামা থামলে আমি নিজে গিয়ে তোদের হিন্দু-পাড়া পার ক'রে দিয়ে আসবো। কিন্তু ভাবছি যে, হঠাৎ হ'লোটা কী? এমন একটা উটকো দাঙ্গা কে লাগালো। পরামর্শটা কার?'

'আমার নানা কয়—' লুঙ্গি ঝেড়ে কোণে একটা জলচৌকিতে বসলো রমজান— 'ঐ নবাব হারামজাদাই যতো নষ্টের গোড়া, ইংরাজগো লগে

খানা খায়, ম্যাম লইয়া নাচে আর ভাবে যে, আমি কি অইনু রে। ফুইলা অইলাম বাউয়া ব্যাং।'

হতাশভাবে মাথা নাড়লেন জ্যাঠামশায়, 'অথচ ভেবে ত্যাখ, ওর ঠাকুর্দা আলি-সাহেব একটা কেমন মানুষ ছিলেন। দেবতার মতো। ইংরেজদের উনি জুতোর সুকতলার চেয়েও হেয় জ্ঞান করতেন। এখন সেই ইংরেজরাই হ'লো তাঁর নাতির ধ্যানজ্ঞান।'

'আর কয়েন ক্যান কর্তা, ঐ হালার-পুত্ত বান্দরের বাচ্চাটা, দেখলে তো মনে হয় বুঝি অখনই গাছের থন কলা খাইতে-খাইতে লাইমা আইছে, এইখানে আইয়া হালা অইছে পুলিশের কর্তা। ত্যাজ কতো। হাকিমটা আর এইটা দিনে সাতবার কইরা অথন আসান মঞ্জিলের ফটকে ডুকতাছে, আর বাইর অইতাছে। খাতিরে পিরিতে মেদিনী ফাটে।'

জ্যাঠাইমা সামলে উঠেছেন ততোক্ষণে, ছুটেছেন ঘরের আনাচকানাচ দেখতে, বিশেষ জিনিস সাবধান করতে। সুলেখা বন্ধ জানালা ফাঁক ক'রে বেলা ন'টাতেই সুমসাম শহরের চেহারাটা দেখে নিলো একবার।

সেদিন অবিশ্যি ঐখানেই থামলো ব্যাপারটা। কিন্তু ত্রাস কমতে দুটো দিন কেটে গেলো, আর চতুর্থ দিনে ভোর না-হ'তেই পুলিশ-ভ্যান এসে দাঁড়ালো গলির মুখে। পাঠান সৈন্যে ভ'রে গেলো গলিটা। সার্জেন্টরা নিজে পাড়ার প্রত্যেকটা বাড়ি খানাতল্লাশ করলো। একে লাথি মারলো, তাকে গুঁতো দিলো, বিছানা-বালিশ ছিঁড়ে-ফেঁড়ে তছনছ ক'রে ফেললো। আত্মরক্ষার উপায় হিসেবে লাঠি-দা যে-বাড়িতে যে যা সংগ্রহ ক'রে রেখেছিলো, সব নিয়ে চ'লে গেলো। এমনকি কয়লা-ভাঙা হাতুড়িটা পর্যন্ত বাকি রাখলো না। মশারি টাঙাবার খাটের বাজুগুলোও ছাড়লো না।

রাত জেগে যে-সব ভলান্টিয়াররা যার-যার নিজের এলাকা পাহারা দিচ্ছিলো, তাদেরও ধ'রে নিয়ে গেলো বন্দুকের কুঁদোর খোঁচা মারতে-মারতে। তারপর যখন বেলা বাড়লো, সব বাড়িতে সবাই খেয়ে-দেয়ে ঈষৎ অনবধানে আলস্যে গা এলালো বিছানায়, ঠিক তক্ষুনি হুসনি দালানের অভ্যন্তর থেকে শত-শত কণ্ঠের চীৎকার উঠলো, 'আল্লা হো আকবর।' এই হুসনি দালান এখানকার মুসলমানদের একটা বিশেষ পবিত্র জায়গা। ঈদের দিনে এরা এখানেই একত্র হয়, কোনো পরব হ'লে মেলা বসে এখানে, বুক চাপড়াতে-চাপড়াতে হাসান-হোসেনের মিছিল বেরোয় এখান থেকে। কোনো জরুরি সভা হ'লেও এখানেই জমায়েত হয় সব। হুসনি দালানের পবিত্র মাটিতে আজ ওরা কাফের-দলনের প্রতিজ্ঞা নিয়ে একত্র হচ্ছিলো বোধ হয়, এতোক্ষণে বেরুলো তৈরি হ'য়ে। যে-শহরে রাস্তায় একসঙ্গে তিনজন লোক দাঁড়ালেও পুলিশ রেহাই দিচ্ছিলো না, গৃহস্থদের দৈনন্দিন জীবনের যন্ত্রপাতিও যেখানে বাজেয়াপ্ত করা হচ্ছিলো, সেই শহরের বড়ো-বড়ো রাস্তাগুলো সহসা শত-শত মাথায় কালো হ'য়ে উঠলো। লাঠিসোঁটা, সোডার বোতল, কিরিচ, বল্লম, মাংস-কাটা ছুরি, ছোরা, কোনো-কিছুরই অভাব দেখা গেলো না তাদের হাতে। আর সবচেয়ে আশ্চর্য, যে পুলিশের ভ্যান সারা দিন ভেঁপু বাজিয়ে, বুক কাঁপিয়ে, দাঁত খিঁচিয়ে এখানে-ওখানে আনাচে-কানাচে ঘুরে বেড়ায় শহর শান্ত রাখার জন্য, তাদেরও দেখা মিললো না কোথাও।

মুহূর্তে কী থেকে কী হ'য়ে গেলো। ঘরে-ঘরে রোল উঠলো আর্তনাদের। শিশুর কান্নায়, মেয়েদের চীৎকারে, পুরুষের ভয়ার্ত গলার বিকৃত আওয়াজে আকাশ-বাতাস মথিত হ'লো। রক্ত আর রক্ত, কাটা আর ছেঁড়া, খুন আর জখম। জ্বালালো, পোড়ালো, ভাঙলো, ছিঁড়লো,

যে-যে রাস্তা দিয়ে গেলো সে-সব পাড়াগুলো একেবারে তছনছ ক'রে দিয়ে বীরের ঝাঁক পেরিয়ে গেলো সদর্পে। যখন সব শেষ হ'লো তখন হর্ন দিতে-দিতে রাস্তা কাঁপিয়ে রক্ষা করতে এলো সরকারি পুলিশের গাড়ি।

॥ বারো ॥

এই ক' বছরে দেশের উপর দিয়ে গর্জন-বর্ষণ তো কম গেলো না? একটার পর একটা তরঙ্গ। ক্ষিপ্ত জনগণ রেললাইন উপড়েছে, স্টেশন পুড়িয়েছে, গোলা লুট করেছে, পোস্টাপিস জ্বালিয়েছে, কেটে দিয়েছে টেলিগ্রাফের তার, যুদ্ধের জন্য সঞ্চিত যা-কিছু প্রয়োজনীয় যানবাহন সব নষ্ট করেছে। ইংরেজের শাসনযন্ত্রের শিরা-উপশিরাগুলিকে একে-একে উপড়ে ফেলতে আপ্রাণ চেষ্টা করেছে। মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় অসহিষ্ণু কতোগুলো পাগলমানুষ কী না করেছে জীবনপণ ক'রে? মেদিনীপুর জেলায় স্বাধীন গভর্নমেণ্ট পর্যন্ত প্রতিষ্ঠা করেছে তারা। একদিন এক-যোগে কুড়ি হাজার লোক একসঙ্গে গলা মিলিয়ে চীৎকার ক'রে বলেছে, 'আমরা স্বাধীন', তারপর হাজার-হাজার সৈন্য, হাজার বন্দুকের সামনে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে শুধু-হাতে মরেছে, তবু গোঁ ছাড়েনি। ইংরেজের নির্যাতনের চাকা স্বচ্ছন্দে গড়িয়ে গেছে বুকের উপর দিয়ে, লাঠি লাথি গুলি চাবুক— তাতেও কুলোয়নি, এসেছে মিলিটারি, এসেছে মেশিনগান— আসুক, তবু পা টলেনি এতোটুকু, স্বাধীন জাতীয় সরকার ব্রিটিশ সরকার পাশাপাশি ঠিক দাঁড়িয়ে থেকেছে। আর তারও পরে এগিয়ে এসেছে আজাদ হিন্দ ফৌজ। কে না জানতো যে-কোনো মুহূর্তে তারাও বাংলাদেশে এসে পড়তে পারে আর তার ফলে কেবলমাত্র মেদিনীপুরই

নয়, সারা বাংলাতেই একটা বিদ্রোহী জাতীয় সরকার গ'ড়ে উঠতে পারে এই আশঙ্কায় ব্যাকুল হ'য়ে উঠেছে ইংরেজরা। তখন তারা কোনদিক সামলাবে। জাপানকেই আটকাবে, না এই সম্ভাবনাকেই রোধ করবে। হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা লাগিয়েই যে শুধু তাক লাগালো তা নয়, দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি ক'রেও সে-সময়ে এই সমস্যার মন্দ সমাধান করলে না। ক্ষুধার্ত দরিদ্রের সংখ্যা পিলপিল ক'রে বেড়ে উঠলো দেশে। সুজলা আর সুফলা ব'লে চিরবিখ্যাত বাংলার আকাশে-বাতাসে হাহাকার উঠলো, উঠলো বুকফাটা কান্নার রোল। জীবজগতে ক্ষুধার বাড়া কষ্ট নেই। দেহ ধারণ করতে হ'লে তার আহার চাই। সেই আহার্য একেবারে গুদমজাত হ'য়ে গেলো। তা পচলো, গললো, ফেলা গেলো কিন্তু এক কণা শস্যও কোনো রন্ধ্র দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলো না। লোকগুলো হা-হা করতে-করতে রাস্তায় বেরুলো, গ্রাম ছেড়ে শহরে এলো, পেটের তাড়নায় দিগ্বিদিকে ছড়িয়ে গেলো, হারিয়ে গেলো, ডাস্টবিনের নোংরা পচা গলিত খাদ্য নিয়ে ছেঁড়াছিঁড়ি করতে লাগলো কুকুরের সঙ্গে, শরীর শুকিয়ে কঙ্কাল হ'য়ে গেলো। কেউ গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলতে লাগলো গাছের ডালে, কেউ কাপড়ে আগুন ধরিয়ে জ্বালা জুড়লো, কেউ জলে ডুবে ঠাণ্ডা হ'লো। আর যে-সব হতভাগ্যরা তা পারলো না, তারা 'ভাত দে, ফ্যান দে' বলতে-বলতে ফুটপাথের উপরেই নিঃশেষ হ'য়ে গেলো। আর তাদের প্রাপ্য অন্ন লরি-বোঝাই হ'য়ে তাদের পাশ দিয়েই রাস্তা কাঁপিয়ে চ'লে গেলো গুদমজাত হ'তে। নেতৃস্থানীয় কেউ তখন বাইরে ছিলো না। এতো বড়ো ঘটনাটা ঘটাবার আগেই সকলকে নিয়ে গারদে পুরে রেখেছিলো, কে উদ্বুদ্ধ করবে, কে তাদের বলবে যে, ক্ষুধার জ্বালায় মরছো কেন, মজুত-করা খাদ্য লুঠ করো, বিদ্রোহ করো, রুখে দাঁড়াও।

তারপর যুদ্ধ থামলো একদিন, আস্তে-আস্তে মুক্তি পেলো বন্দীরা, মুক্তি পেয়ে আবার তারা ঝাঁপিয়ে পড়লো যার-যার কাজে। করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে। এই একটিমাত্র মন্ত্র। মহাত্মাজি তাঁর সমস্ত কর্মে এই একটি কথাকেই বারংবার উচ্চারণ করলেন, দেশে ইংরেজ-বিদ্বেষ চরম হ'য়ে উঠলো। বিদ্রোহের চেহারা দেখে স্তব্ধ হ'লো ইংরেজ। মহাত্মাজির কথায়ই বিপ্লবীরা এসে কংগ্রেসে যোগ দিলো, সকলেরই এক কেন্দ্র, এক উদ্দেশ্য, এক গুরু। মহাত্মাজির মুখের দিকেই তাকিয়ে আছে সব। তারা তাঁর নেতৃত্বে তখুনি সংগ্রাম আরম্ভ করতে চায়। সমস্ত ক্ষমতা ভারতীয়দের হাতে ছেড়ে দিতে হবে ব'লে রুখে দাঁড়ালো কংগ্রেস, কিন্তু সেই চাঁদ সওদাগরের লোহার ঘরের মধ্যেও যেমন সর্ষে পরিমাণ একটি ছিদ্রপথে কাল ঢুকেছিলো, ঠিক তেমনি সহসা মুসলিম লীগ বিরোধিতা ক'রে সমস্ত ভেঙে দিলো। তারা বললো, 'দাঁড়াও, ক্ষমতা এ-ভাবে আসবে না, ভারতীয় মুসলমানদের আগে স্বতন্ত্র জাত ব'লে স্বীকার করো, স্বতন্ত্র রাষ্ট্র দাও, আমরা জাতীয় ঐক্যে বিশ্বাস করি না।' ভারতবর্ষের ষাট বছরের সংগ্রাম সার্থক হবার জন্য পরিপূর্ণ সম্ভাবনার ভারে থরথর করতে-করতে থেমে গেলো। মুচকি হাসলো ইংরেজরা। তারপরেই লাগলো সেই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা।

কিন্তু এই কি তার চেহারা? এতো মর্মান্তিক, এতো বীভৎস, এমন হৃদয়বিদারক?

তা-ও নবাবগঞ্জে আর কতোটুকু, একটা ঢেউ মাত্র। আসল দাঙ্গাটা হ'লো কলকাতায় আর নোয়াখালিতে। নৃশংসতায় হিন্দু-মুসলমান কেউ কম গেলো না।

ছটফট ক'রে উঠলো সুলেখা, 'অনুমতি দিন সেনদা, একবার দেখে নিই লোকটাকে।'

সেনদা শান্ত চোখে তাকিয়ে হাসলেন, 'এই একটা লোককে দেখে নিয়ে এতোগুলো লোকের দুঃখ কি তুমি ঘোচাতে পারবে?'

'পারবো। পারবো। এই একটা লোকই এক কোটি লোকের সর্বনাশের কারণ, নবাবগঞ্জের এই স্থলতান আমেদ নামক লোকটির ঠিকানা যেদিন মুছে যাবে জগৎ থেকে, অনেক পাপ, অনেক ক্ষতিও সেদিন দূর হ'য়ে যাবে ওর সঙ্গে-সঙ্গে। এ-সব গোলমালের আসল পরামর্শ-দাতাটি কে? এই নরপিশাচ। দাঙ্গা লাগাবার মূলসূত্রটি কী? এরই কূটবুদ্ধি। মরি মরবো, মরতে একদিন হবেই, কিন্তু ওর রক্ত না-দেখে আমি মরতে পারবো না।'

নিচু গলায় সেনদা বললেন, 'থামো। শত্রুতা কোরো না, এটা শত্রুতা করবার সময় নয়, হিংসা করবার সময় নয়, মনে-প্রাণে মহাত্মাজির পদ্ধতিকেই অনুসরণ ক'রে চলবার চেষ্টা করো।'

'মহাত্মাজির সব কথা শুনতে রাজি আছি, কিন্তু তাঁর এই মুসলমান-প্রীতি আমি সইতে পারিনে।'

হাত তুলেছেন সেনদা, 'তিনি পিতা, তাঁর কাছে সকলেই গ্রহণ-যোগ্য। তা ছাড়া,' চোখ নামিয়ে নিয়েছেন তিনি, 'মুসলমানরা যে আজ নিজেদের স্বতন্ত্র ব'লে ঘোষণা করছে, ভেবে দেখতে গেলে তার জন্যে আমরাও কি খানিকটা দায়ী নই? ওদের মনে এই অভিযোগ, এই গ্লানি কেন জমেছে? আমাদেরই অন্যায়ে—'

'অন্যায়! আমাদের?' মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে বলেছে সুলেখা, 'কক্ষনো না। আপনার এ-কথা আমি মানবো না, শুনবো না। আমাদের কোনো অন্যায় হয়নি ওদের উপর। ওরা নিজেরাই নিকৃষ্ট।'

'তোমার মতো মেয়ের মুখে এটা মানায় না সুলেখা।'

'মানায়, খুব মানায়। আসলে আপনি অন্যরকম হ'য়ে গেছেন।

একদিন এই আপনিই চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের একজন নেতৃস্থানীয় ছিলেন, সেই লুঠ-করা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে এই আপনিই পাহাড়ে-পাহাড়ে ইংরেজ সামরিক বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করেছেন, খানায়-খন্দে প'ড়ে থেকেছেন, নালা-নর্দমার জল খেয়ে তৃষ্ণা মিটিয়েছেন, গাছের কাঁচা পাতা, কাঁচা ফল চিবিয়ে খিদে মিটিয়েছেন, আর আজকে কিনা আপনি একটা তুচ্ছ মশার মতো লোককে—'

'আর আজকে আমি—' সেনদা হাসলেন, 'পঞ্চাশ বছর বয়সে এটাই উপলব্ধি করেছি, চুরি-করা রিভলভার বুকে গুঁজে হত্যার নেশায় বেড়ালের পায়ে চুপিচুপি ঘুরে বেড়ানোই একমাত্র পথ নয়। পথ সত্যি যিনি নির্দেশ করেছেন, তাঁকে অনুসরণ করাই একমাত্র ধর্ম। সমস্ত পৃথিবী যদি আজ এই পথে এসে দাঁড়াতো, সত্যি হয়তো স্বর্গরাজ্য হ'তে পারতো। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের কঠিন পাথর একটার পর একটা বৈপ্লবিক আঘাতে কিছুটা টলমল করেছে বটে, কিন্তু আজ এ-কথাটা খুব ভালোভাবেই বুঝেছি— হিংসার বদলে হিংসা দিয়ে জয় হয় না। আমরা চীৎকার ক'রে যতোটুকু ছিনিয়ে নিয়েছি, উনি চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থেকে তার চেয়ে ঢের ঢের বেশি নিজে থেকেই পেয়ে গেছেন। মারো মরবো, কিন্তু পণ ছাড়বো না। কতো আর মারতে পারে মানুষ, বলো? একদিন থামবেই। কিন্তু মারামারি হ'লে তার শেষ হয় না।'

অতএব মনের বাসনা মনে রেখে চুপ ক'রে রইলো সুলেখা।

আর এই অবস্থার মধ্যে তাদের অন্য বাড়িতে চ'লে যাবার কথাটাও চাপা প'ড়ে গেলো। নিবারণবাবুই বারণ করলেন সুষমা দেবীকে ডেকে। সুষমা দেবীও হাঁপ ছাড়লেন। মেয়েকে বললেন, 'দেখলি তো, আপন আপন, পর পর, যে না বোঝে সে আব্বর।'

হেসে ফেলে সুলেখা বললো, 'আব্বরটা কী মা?'

'কী আবার, বোকা। তোর মতো বোকা। হাজার হোক ওঁরাই আমাদের আপনজন। ভালো করুন, মন্দ করুন, প্রাণের টান যাবে কোথায় ?'

'প্রাণের টান !'

'তুই সেদিন যে-ব্যবহার করেছিলি, তার পরেও আমাদের এ-বাড়িতে থাকতে দেয়া, সেটা নেহাৎই দয়া। তা ছাড়া নিজেই তুই চ'লে যেতে চেয়েছিলি, ভেবে ছাখ, গেলে কী হ'তো ?'

'কী আবার।'

'মেয়ে হ'য়ে জন্মেছিস, এতো তেজ ভালো না। ধৈর্য ধরতে শেখ। শেষ পর্যন্ত তোর জ্যাঠা নিজে থেকেই তো বারণ করলেন যেতে ? রাগ কি রাখতে পারলেন ? না কি যাও ব'লে ঠেলে দিতে পারলেন বিপদের মুখে ?'

'ও, যেতে বারণ করেছেন ? তাই এতো !' মৃদু হেসে আবার ভাইদের জামায় বোতাম লাগাতে মন দিলো স্থলেখা।

স্থষমা দেবী মেয়ের দিকে তাকিয়ে রাগ ক'রে বললেন, 'তোর আর মন ওঠে না কিছুতেই।'

'মনটা উঁচু তারে বাঁধা থাকলে ওঠানো একটু কঠিন কিনা।' দাঁত দিয়ে স্থতো কাটলো সে, 'আর জ্যাঠামশায় যে এখন যেতে বারণ করবেন সে তো আমি জানি। কাজের লোক কই ? পালিয়ে গেছে না ? ঠিকে ঝি-ও গেছে, মদনও গেছে। তারপর তুমিও যাবে, আমিও যাবো, সে কী ক'রে হয় ?'

তীব্র দৃষ্টিতে মেয়েকে ভস্ম করলেন মা।

বিচলিত না-হ'য়ে ছোটো-ছোটো শব্দে হাসলো স্থলেখা, 'আরো আছে। জ্যাঠামশায় এর পরে আমাকে ভলাণ্টিয়ার ঠিক করতে বলবেন

বাড়ি পাহারা দেবার জন্য। বলবেন, তোদের তো অনেক গুণ্ডা পোষা আছে, একটাকে ধ'রে নিয়ে আয় না, থাকবে সারা দিন।'

সুষমা দেবী রেগে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন, আঁচল টেনে ধরলো সুলেখা, হেসে আরো কী বলতে যাচ্ছিলো, হঠাৎ থেমে গিয়ে উৎকর্ণ হ'লো। 'কী-রকম গোলমাল হচ্ছে না ?'

সুষমা দেবীও কান খাড়া করলেন, 'তাই তো।'

কোথা থেকে ছুটে এলেন জ্যাঠাইমা, 'সর্বনাশ। আসছে, আসছে—'

এলেন জ্যাঠামশায়, হুদ্দাড় ক'রে দৌড়ে ছুটে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে যে যেখানে ছিলো সব এসে জড়ো হ'লো এক জায়গায়। বেলা বোধ হয় তখন এগারোটা। রবিবার, বাড়ি ছিলো সবাই। মুখের রক্ত, বুকের রক্ত সব শুকিয়ে গেলো ভয়ে। হাতের সেলাই ফেলে, কোমরে কাপড় বেঁধে উঠে দাঁড়ালো সুলেখা। ঝপাঝপ বন্ধ হ'য়ে গেলো জানালা-দরজা। প্রত্যেক দরজার মুখে টেনে-টেনে নিয়ে যাওয়া হ'লো সব ভারি-ভারি আসবাবপত্র। যাতে দরজা ভাঙলেও সহজে ঢুকতে না-পারে। 'চলো, ছাদে চলো,' চেঁচিয়ে উঠলো সে, 'ছাদটাই নিরাপদ। সিঁড়ির মুখ আটকে দিই চলো। তাড়াতাড়ি করো, আসছে, এদিকেই আসছে, এসে গেছে।' দলা হ'য়ে সবাই সকলকে ঘিরে পড়তে-পড়তে ছুটতে-ছুটতে সিঁড়ির মুখে টেনে আনলো বাক্স-ডেক্স খাট-আলমারি, তারপর সব এলো ছাদে। সব নিয়ে মোট তেরোজন লোক কাঁপতে লাগলো বলির পাঁঠার মতো।

বাড়িটা মোটেই নিরাপদ নয়। একে তো পিছন দিকে আম জাম কাঁঠাল কলার বিশাল বাগান আর পুকুর। সদর ফটকটিও পোক্ত নয়, দেয়ালটা ভাঙা, তার উপরে পুরোনো বাড়ি ব'লে দরজা-জানালাও তেমনি। টের পাওয়া গেলো জনস্রোত দ্রুত এগিয়ে আসছে কাছে,

ফটাফট আওয়াজ হচ্ছে। চীৎকার, কান্নাকাটি, হুড়োহুড়ি— দেখতে-দেখতে হুহু ক'রে ভ'রে গেলো গলিটা। শত-শত পায়ের লাথিতে গেট ভেঙে গেলো স্থলেখাদের। দা শাবল কুড়ুল দিয়ে নির্দয় হাতে ভাঙতে লাগলো সামনের দরজা। অতর্কিতে আক্রমণ হ'লে যে-সব সংকেত শিখিয়ে দিয়েছিলো স্বেচ্ছাসেবকের দল, তার একটাও মনে করতে পারলো না কেউ, সব ভুলে কেবল একটা সমবেত আর্তনাদের রোল তুললো আকাশে। নিচের নরস্রোতের দিকে তাকিয়ে কতোক্ষণের জন্য স্থলেখাও স্তব্ধ হ'য়ে গেলো। দাঁতে দাঁত লেগে এলো তার, হাতে হাত আটকে গেলো, বুকটা ধকধক করতে লাগলো একটানা যন্ত্রের মতো। তারপরেই সে শক্ত হ'য়ে দাঁড়ালো। একটা ঝাঁকানিতে জাগিয়ে তুললো নিজেকে, নাক দিয়ে আগুনের মতো নিশ্বাস বেরুতে লাগলো, বুকের ওঠাপড়া হাপরের মতো হ'লো, সমস্ত শরীরে বিদ্যুৎ খেলে গেলো, হিংস্র শ্বাপদের মতো জ্ব'লে উঠলো দুই চোখ। হঠাৎ কোণে জড়ো ক'রে-রাখা মাসের কয়লার স্তূপ থেকে বড়ো-বড়ো চাঙড়া তুলে ক্ষিপ্র গতিতে এলোপাথাড়ি ছুঁড়তে লাগলো নিচে, দুই হাতে। শুধু তাই নয়, কয়লার পাশে ভাঙা উনুন, ঠ্যাং-ভাঙা চেয়ার, ফেটে-যাওয়া জলচৌকি, বাড়তি তক্তা, লোহার কড়াই, ডাম্বেল, শিলনোড়া, পুরোনো ট্রাঙ্ক, বাচ্চাদের ঠেলাগাড়ি— বাঙালি গৃহস্থঘরের স্বভাবদোষে জমানো বহু বছরের যতো কিছু আবর্জনা জড়ো করা ছিলো, সব তুলে-তুলে ছুঁড়তে লাগলো চাপ-চাপ জনতা লক্ষ্য ক'রে। এই অপ্রত্যাশিত প্রতিরোধের জন্য প্রস্তুত ছিলো না ওরা। কারো মাথা ফাটলো, কারো চোখ গেলো, কারো দাঁত ভাঙলো, শিলনোড়ার আঘাতে একসঙ্গে তিনটে লোক জখম হ'য়ে ছুটে পালালো, আর তারপর একসময়ে দেখা গেলো এক জোড়া হাত কখন যেন তেরো জোড়া হ'য়ে উঠেছে। আর ছাব্বিশখানা মরিয়া হাতের কয়লা-বৃষ্টির মধ্যে

দাঁড়াতে পারে, এমন সাধ্য কারো হ'লো না। জনতা ছত্রভঙ্গ হ'য়ে কোথায় কোন নতুন শিকারে এগিয়ে গেলো উন্মত্ত আবেগে। ততোক্ষণে শাঁখ বেজে উঠেছে ঘরে-ঘরে, মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে এসেছে দুরন্ত ছেলের দল, একজনের নায়কত্বে একশো জন ঝাঁপিয়ে পড়ছে এক হাজারের মধ্যে। কে রুখবে তাদের! কে মারবে!

এর পরে কিছুকাল পর্যন্ত দেশে যেন আর কোনো আইন রইলো না, আদালত রইলো না, রাজ-দরবার রইলো না নালিশ জানাবার। কেবল দস্যুতা, হত্যা, হানাহানি, আর পৈশাচিকতার উল্লম্ফন। যে যাকে পারছে মারছে, কাটছে, খুন করছে। হিন্দু মুসলমানকে আর মুসলমান হিন্দুকে। সারা দেশ জুড়ে এই একটিমাত্র কথা, মারো আর কাটো। হিন্দু-পাড়াগুলো ভেসে গেলো মুসলমানের রক্তে, আর মুসলমান-পাড়াগুলো হিন্দুর রক্তে। যেহেতু নবাবগঞ্জ মুসলমানপ্রধান শহর, সেখানে হিন্দুদের অবস্থা ক্রমেই সঙিন হ'য়ে দাঁড়ালো। যে যেমন ক'রে পারলো পালাতে লাগলো শহর ছেড়ে। তার মধ্যে কেউ পারলো, কেউ অর্ধপথেই শেষ হ'য়ে গেলো। গৃহস্থেরা সব ঘরে-ঘরে কুলুপ এঁটে মাত্র একটি ঘরে জড়োপুঁটুলি হ'য়ে বেঁচে রইলো কোনোরকমে, সব বাড়ি এক বাড়ি হ'লো, সব হাঁড়ি এক হ'য়ে গেলো। লড়াই তো শুধু মুসলমানের সঙ্গে হিন্দুর নয়, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের লক্ষ-লক্ষ সৈন্য আছে পিছনে, আছে বন্দুক আর কামান। শহরে কারফিউ হ'লো, একশো চুয়াল্লিশ ধারা হ'লো, আরো কতো কিছু আইন হ'লো ঠিক নেই তার। রাস্তায় তিনটি মাথা একত্র হ'লেও পুলিশের কবল থেকে রক্ষা পেলো না কোনো হিন্দু। হাতে একটি ছড়ি থাকলেও সেটা মহা-অপরাধ ব'লে গণ্য হ'তে লাগলো, আর হাজার-হাজার মুসলমান যখন 'আল্লা হো আকবর' ব'লে গগনবিদারক

জিগির তুলে এক-একদিন এক-এক পাড়া লুঠ ক'রে বেড়াতে লাগলো, সরকারি পুলিশের টিকিটিও দেখা গেলো না তখন। শেষে গুর্খা সৈন্যরাও বিদ্রোহ করলো হিন্দুদের বিরোধিতা করায়। তাতে কী, তৎক্ষণাৎ এলো পাঠান সৈন্যের দল, খুলে দেয়া হ'লো জেলখানার গেট, যতো মুসলমান গুণ্ডাকে ছেড়ে দেয়া হ'লো বিনা শর্তে শহরের মধ্যে। অবস্থা চরমে উঠলো।

আর-কিছু না, একটা রিভলভার। শুধু একটা রিভলভার। শুধু একটা লোককে ঠাণ্ডা করা। পাগল হ'য়ে গেলো সুলেখা। সেনদার কাছে প্রায় হত্যা দিলো।

সেনদা বললেন, 'কী হবে রিভলভার দিয়ে? মারবে? কেন মারবে? কী অধিকার আছে তোমার একজন মানুষকে প্রাণে মারবার? সেই প্রাণ কি তোমার রচনা যে তুমি তা হরণ করবে? না, ও-সব মনোভাব ছাড়ো। ও-পথে আর না। রক্তের পথ পিছল, পতন অনিবার্য।'

আজকাল কী যে বলেন সেনদা, বুঝতে পারে না সুলেখা। বুঝতে চায়ও না। সেনদার এ-সব নিরামিষ কথায় মন তার আরো ক্ষিপ্ত হ'য়ে ওঠে। মাথার মধ্যে একটা পোকা তাকে কেবলই কুরে-কুরে খায়, প্রতিহিংসার আবেগে সে কাঁপে। শেষে সেনদাকে ছাড়লো। বুঝলো, সেনদা অনুমতিও দেবেন না, অস্ত্রও দেবেন না। এবার সে তার এক অনুগত অনুচর, পনেরো বছর বয়সের বীরেনকে ধরলো। বীরেনের বাবা সরকারি দপ্তরের বড়ো চাকুরে, তাঁর নিজের রিভলভার আছে। সুলেখাদিকে সুখী করবার জন্য বীরেন কী না করতে পারে। কিন্তু তাই ব'লে বাবার রিভলভার চুরি! সে যে বড়ো শক্ত কাজ। বাবা অত্যন্ত হুঁশিয়ার। ভুলক্রমেও ঐ ক্ষুদ্র বস্তুটি তিনি যেখানে-সেখানে রাখেন না।

ওটা চুরি গেলে চাকরি নিয়ে টানাটানি হবে। ছেলেমানুষ বীরেন শেষে চকচকে এক ধারালো ছোরা জোগাড় ক'রে এনে দিলো। এই বা রিভলভারের চেয়ে কম কী? কেবল কাছাকাছি হবার সুযোগ। তা চেষ্টায় থাকলে মিলতে কতোক্ষণ। নবাব? নবাব-সাহেবকে চায় সুলেখাদি? একটা মিটিং ডেকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে নিয়ে এলেই হয়। মুসলমান বালক সেজে সে তো কতোদিন ওদের গোপন পরামর্শ শুনে এসে খবর দিয়েছে সমিতিতে, তেমনি ক'রে নবাবকেও না-হয় ফাঁদে ফেলবে একদিন। কিন্তু তারপর? এতোক্ষণে সচেতন হয় বীরেন, 'তার-পরে যদি ধরা পড়ো?'

'ধরা পড়া সোজা কিনা! আর পড়লে পড়বো, কী হবে?' প্রত্যয়ে দৃঢ় গলায় জবাব দেয় সুলেখা।

'কী হবে? দ্বীপান্তর হবে। ফাঁসি হবে।'

'অনেক প্রাণের জন্য তোর একটা সুলেখাদির প্রাণ না-হয় মুছেই গেলো পৃথিবী থেকে।' নেশায় আচ্ছন্ন চোখে সুলেখা বীরেনের দিকে তাকিয়ে হাসে।

বীরেন মূর্ছা যায়। কম্পিত গলায় বলে, 'না না, ও-সবে দরকার নেই। ও-সব করতে যেয়ো না তুমি। বরং আমাকে হুকুম দাও, আমি যাই, আমি রক্ত এনে দেখাই তোমাকে।'

সুলেখা বীরেনের মাথায় সস্নেহে হাত বুলোয়, সান্ত্বনা দিয়ে বলে, 'ভয় কী. বোকা। তুই দেখবি আমাকে স্পর্শও করতে পারবে না কেউ। আর যদি ধরাই পড়ি, ছোরাটা তো আমার হাতেই থাকবে, নিজের বুকে বসিয়ে দিতে কতোক্ষণ! তুই কি ভেবেছিস ফাঁসিতে ঝোলবার জন্য আমি অপেক্ষা করবো?'

ভয়ে, বিস্ময়ে, শ্রদ্ধায়, বেদনায় ঢোঁক গেলে বীরেন।

বীরেনকে এতো কথা বললে কী হবে, বাড়ি ফিরে কিন্তু মন ভারি হ'য়ে ওঠে স্থলেখার। রাত্রে বিছানায় শুয়ে ছটফট করে। নাবালক ভাইদের দিকে তাকিয়ে, অসহায় মায়ের দিকে তাকিয়ে বুকের মধ্যে কেমন ক'রে ওঠে। এর নামই মায়া। মধ্যরাত্রে উঠে তাই গীতা খুলে বসে। এইভাবে দিন কাটে তার। অহোরাত্র মনের সঙ্গে এই একই দ্বন্দ্ব, একই বচসা। ছোরাটাকে সারা দিন আঁকড়ে থাকে বুকের মধ্যে, লালন করে, ইচ্ছের জোর দ্বিগুণিত হয়। আজকাল আর বেরুতে পারে না বেশি, রাস্তাঘাট নিরাপদ নয়। হিন্দু-পাড়া দিয়ে এ-গলি ও-গলি বেয়ে যে-সব পথ গেছে, মাঝে-মাঝে সে-সব রাস্তা দিয়ে সমিতিতে গিয়ে পৌঁছয়, আবার ফিরে আসে কাজের নির্দেশ নিয়ে। কী নির্দেশ ? না, 'মাথা গরম কোরো না, এটা মাথা গরম করবার সময় নয়।' ছাই। আসলে সেনদার নিজের মাথায় আর তাপ নেই তাই অন্যের মাথাকে শীতল করবার জন্য এতো আবেদন-নিবেদন।

পুরো একটি মাস তাণ্ডব ক'রে কয়েকদিন শান্ত রইলো শহর। এইবার সেনদা নিজে ঘুরে-ঘুরে শহরের সব গণ্যমান্য লোকেদের একত্র ক'রে একটা ঘরোয়া বৈঠকের ব্যবস্থা করলেন। এ-ভাবে তো চলতে পারে না। মরলে কি শুধু হিন্দুরাই মরবে ? মুসলমানরা মরবে না ? হাতে না-মরুক ভাতে তো মরবে। দারিদ্র্য ছাড়া আর কী সম্বল আছে ওদের ? দিন আনে দিন খায়। নবাব এখনো নবাবি করেন বটে, স্বজাতি-পোষণেও দিলদরিয়া— তবুও এখানে হিন্দুরাই বর্ধিষ্ণু, হিন্দুরাই মাথা। বড়ো-বড়ো চাকুরেও যেমন, বড়ো-বড়ো ব্যবসায়ীও তেমনি। তৃতীয় পক্ষের প্ররোচনায় শেষ পর্যন্ত তো ওরাই মরবে।

'মরুক। মরুক। মরতে দিন। এখুনি তো না-খেয়ে শুকোচ্ছে, আর

ক'দিন চলবে এই জুলুমবাজি ? হিন্দুদের হাতে-পায়ে ধরলো ব'লে। পেশা তো কেনা-বেচা আর ঘোড়ার গাড়ি চালানো। আমরা না-কিনলে ওরা বেচবে কার কাছে ? আমরা না-চড়লে ওদের ঘোড়ার গাড়ির অর্থ কী ? ঘোড়াগুলো ছেড়ে দিয়েছে, সেদিন বসিরুদ্দিনের অমন সুন্দর কালো ঘোড়াটা কিভাবে না-খেয়ে ধুঁকে-ধুঁকে মারা গেলো আমাদের বাড়ির সামনে। আস্তাবলগুলোতে ঘাস-বিচালি প'চে দুর্গন্ধ বেরিয়েছে।' বলতে-বলতে লাল হ'য়ে ওঠে সুলেখা। রুদ্ধ আক্রোশে মাথা খোঁড়ে। আবার বলে, 'অনুমতি দিন সেনদা, সব সমস্যার সমাধান আমি এক পলকে ক'রে দিই।'

সেনদা তার আগুনভরা চোখের দিকে তাকিয়ে নরম ক'রে হাসেন।

॥ তেরো ॥

ঘরোয়া বৈঠকের দিন নবাব সুলতান আমেদকেও আসতে অনুরোধ করা হ'লো। তিনিই মুসলমান-সমাজের মাথা, এই শহরের অর্ধেক মুসলমানই তাঁর প্রজা, তাঁর সহায়তা ভিন্ন শান্তির আশা কম। অন্যান্য মুসলমান ভদ্রলোকেরাও এলেন। সাগ্রহেই এলেন। এই অবিশ্বাস্য, অভদ্র নারকীয় অবস্থার চাপে তাঁরাও হাঁপিয়ে উঠেছেন, তাঁরাও শান্তি চাইছেন। সবসুদ্ধ মোট জন পঞ্চাশেক লোক হ'লো সেই সভায়। তার মধ্যে সমিতির সভ্যদের সংখ্যা মাত্র দশজন। সেনদা সুলেখাকেও ডাকলেন, বললেন, 'ইচ্ছে ক'রেই আসতে বললাম তোমাকে। তুমি সমস্ত মুসলমান-সমাজের উপরই ক্ষিপ্ত হ'য়ে উঠেছো, কিন্তু এ-সভায় এলে দেখবে, শিক্ষিত লোকেরা সব সম্প্রদায়ের মধ্যেই একরকম। এমনকি, যে-নবাবকে খুন করবার জন্য তুমিও খুন হ'য়ে যাচ্ছো, তাঁর ব্যবহারও কম মার্জিত নয়, আর

পাঁচজন ভদ্রলোকের মতোই একজন ভদ্রলোক তিনি। আশা করি আলাপ করলে তোমার অনেকগুলো ভুল ধারণা ভেঙে যাবে।'

আলো হ'য়ে উঠলো স্থলেখার মুখ। বুকের ভিতরটাতে গরম রক্ত চলাচল করতে লাগলো। তাকিয়ে থেকে সেনদা বললেন, 'আমাকে লজ্জা দিয়ো না কিন্তু।'

স্থলেখা চমকে উঠে বললো, 'না, না, আপনার আদেশ ছাড়া এক পা-ও ফেলবো না আমি।'

'শূন্য হাতে এসো। প্রসন্ন মনে এসো। আর যদি মনে করো তা পারছো না তা হ'লে এসো না। তুমি জানো, মেয়েদের মধ্যে একমাত্র তোমাকেই আমি আসবার অনুমতি দিয়েছি। তিনশো সভ্যের মধ্যে মাত্র দশজনকে ডেকেছি। তাঁরা প্রত্যেকেই বয়স্ক, অভিজ্ঞ, আমার গুরুজন-তুল্য। উত্তেজনার বশে কোনো ছেলেমানুষি ক'রে ফেলো না।'

সেনদার উপদেশ শিরোধার্য ক'রেই সভায় এসেছিলো স্থলেখা, মন থেকে সমস্ত উত্তাপ ঝেড়ে ফেলেই এসেছিলো, সমস্তটা আলাপ-আলোচনাও নিঃশব্দে শুনেছিলো, কিন্তু শেষ মুহূর্তে সব গোলমাল হ'য়ে গেলো। সভা শেষ হবার একটু আগেই বেরিয়ে যাচ্ছিলো, প্রায় অশোভন দ্রুত ভঙ্গিতে স্থলতান এসে দাঁড়ালেন দরজায়। এইমাত্রই এসেছেন, অনেক দেরি ক'রে এসেছেন ব'লে সকলের কাছে ক্ষমা চাওয়া ছাড়া আর দ্বিতীয় কথাটি বলবারও অবকাশ হয়নি, এরই মধ্যে উঠে এলেন স্থলেখাকে বেরুতে দেখে। সঙ্গে-সঙ্গে স্থলেখার রক্ত আবার গরম হ'য়ে উঠলো। স্থলতানকে দেখে থেকেই তার অস্থিরতা শুরু হয়েছিলো, আর বেরিয়েও আসছিলো সেইজন্যই। এখন মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যন্ত্রণা হ'লো।

হাত তুলে স্থলতান নমস্কার করলেন, একটু হেসে বললেন, 'এ কী, মিটিং শেষ না-হ'তেই চ'লে যাচ্ছেন ? কর্তৃপক্ষের মধ্যে আপনিও তো একজন, শেষ পর্যন্ত আপনার থাকা উচিত।'

স্কাউণ্ড্রেল ! বুকের ভিতরকার খাপে ছোরাটা আলগোছে অনুভব করলো স্থলেখা, কঠিন হ'য়ে বললো, 'কাজ আছে।'

'এর চেয়ে বেশি কাজ আজ অন্তত থাকা উচিত নয়। আর আমি তো এইমাত্র এলাম। যদিও আলাপ নেই, তবু জানি তো আপনি কে। আপনার চ'লে যাওয়া—'

'আপনার দেরির জন্য নিশ্চয় অন্য কেউ দায়ী নয়। সকলেরই সময়ের দাম আছে।' স্থলেখা দ্রুত নেমে এলো দু-সিঁড়ি।

স্থলতানও নামলেন, 'রাগ করছেন কেন, আজ তো আপনাদের বিরোধ করবার দিন নয়। আপনারা, মানে স্বর্গের দূতেরা যে আজ মিলন-সভা ডেকেছেন। আর আমরা, নরকের কীটেরা সেই সভার উপযুক্ত হবার শিক্ষা নিতে এসেছি। আপনাদের সেবা করাই তো আমাদের ধর্ম। নেহাৎ যদি যেতেই চান, চলুন গাড়ি ক'রে আমিই না-হয় পৌঁছে দিয়ে আসি।'

স্পর্ধা দেখে দাঁতে দাঁত আটকে গেলো স্থলেখার। ইশ ! কী স্থযোগ আজ নষ্ট হ'য়ে গেলো। কী সময় আজ ব'য়ে গেলো। চমৎকার পরিবেশ ! গাঢ় সন্ধ্যায় প্রায় নির্জন একটি কোণে, মুখোমুখি-দাঁড়িয়ে-থাকা একটা অসাবধান লোক। কিন্তু না— আজ পারবে না। সেনদাকে কথা দিয়েছে, সেনদা ডেকে এনেছেন এঁকে। যেতে-যেতেও সে ঘুরে দাঁড়ালো। গলার কাঠিন্যকে যথাসম্ভব মোলায়েম ক'রে বললো, 'শুমুন, আপনার সঙ্গে আমি একদিন আলাদাভাবে দেখা করতে চাই—'

'কী সৌভাগ্য !'

'কোথায় হ'তে পারে ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'আপনি যেখানে বলবেন আমি সেখানেই যাবো।'

'কলেজ-হলের মিটিং-এ আসবেন ?'

'সোমবার!'

'হ্যাঁ, সোমবার ?'

'আসতে পারি, কিন্তু অতো বড়ো জন-সমুদ্রে কোথায় আপনাকে খুঁজে বেড়াবো ?'

'মিটিংটা তো হবে ভিতরে। বাইরে ভলাণ্টিয়াররা দু-চারজন ছাড়া কেউ থাকবে না। আমি না-হয় পিছনের দিকের আমলকি-বাগানে অপেক্ষা করবো।'

'বেশ তো।'

'মিটিং আরম্ভ হবে ছ'টায়, দরজা বন্ধ হ'য়ে গেলে, আমি সাতটা নাগাদ বেরিয়ে এসে ওখানে দাঁড়াবো।'

'খুব জরুরি কথা আছে বোধ হয় ?'

'তা আছে।' সুসংবদ্ধ দাঁতে সুলেখা হাসলো, 'শহরের মধ্যমণি আপনি, আপনাকে শান্ত না-করলে শহর শান্ত হবে কেন ?'

'সে-ভারটা কি আপনার উপরই পড়েছে ?'

'একটা বোঝাপড়া হ'য়ে গেলে ভালো হয় না ?'

'নিশ্চয়ই। আর সে-বোঝাপড়া যদি আপনার সঙ্গে হয় তা হ'লে আমি তৎক্ষণাৎ রাজি।'

'তবে তাই কথা থাক ?'

'বেশ তো।'

'পিছন দিককার আমলকি-বাগান, মানে যেটা—'

'বুঝতে পেরেছি।'

'সদর গেট দিয়ে না-ঢুকে আপনি যদি পিছনে পশ্চিমের গেট দিয়ে ঢোকেন, লেবরেটরি ছাড়িয়ে, বাঁ দিকে খানিকটা গেলেই—'

'কবরখানার পাশে তো?'

'হ্যাঁ। সোমবার সন্ধ্যা সাতটা। মনে থাকবে?'

'নিশ্চয়ই।'

'নমস্কার।'

'নমস্কার।'

হনহন ক'রে উত্তেজিত পায়ে চ'লে এলো স্থলেখা। সোজা বাড়ি। দশ মিনিটের রাস্তা পাঁচ মিনিটে পেরিয়ে এসে হাঁপাতে-হাঁপাতে লম্বা হ'য়ে শুয়ে পড়লো বিছানায়।

কলেজ-হলের মিটিং-এর আগে সেদিন থেকে দুটো দিন যে স্থলেখার কিভাবে কেটেছিলো, বোধ হয় নিজেও জানে না। খাওয়ায় মন নেই, পড়ায় মন নেই, কাপড় ছাড়া নেই, চুল বাঁধা নেই, সারা দিন কী ভাবছে। একটা মোহাচ্ছন্ন অবস্থা। কেউ ডাকলেও চমকে ওঠে। মিটিং-এর দিন সমিতি থেকেই একসঙ্গে বেরুলো সব। মিছিল ক'রে নয়, গাড়ি ক'রে। মিছিল করা এখন বন্ধ শহরে। আত্মরক্ষার জন্য সকলেই সাবধান হ'য়ে নিলো। বলা যায় না, শেষ পর্যন্ত ধোঁয়া পেঁচিয়ে-পেঁচিয়ে কোনদিকে গতি নেয়। শুধু সমিতিই নয়, শহরের অনেক লোকই সেদিন সাহস ক'রে যোগ দিতে গেলো মিটিং-এ। হিন্দু-মুসলমান দু-ই। এটা দু-পক্ষের গরজেই আপোসের মিটিং। মুসলমানরা এই এক মাসের মধ্যেই বুঝেছে, সত্যিই হাতে মারাটা কিছু না। ভাতে মারাটাই মারাত্মক। সেনদার কথা অক্ষরে-অক্ষরে ফলেছে। হাতে মারে তারা মুষ্টিমেয় কয়েক-জনকে, ভাতে মরছে জাতসুদ্ধু। কে ক'দিন খাওয়াবে? কুকর্মে ফুসলে

দিয়ে, সব প্রভুরাই স'রে পড়েছে এখন। বলতে গেলে সেদিন সারা শহরই ভেঙে পড়লো মিটিং-এ। এই সাফল্যে দারুণ উৎসাহ সেনদার মনে। সকলেই খুশি। শান্তি নেই শুধু সুলেখার। তার মাথায় কেবল এক অন্ধ পোকা ঘুরপাক খেয়ে মরছে।

ঠিক সাতটার সময় মিটিং থেকে সকলের অলক্ষ্যে আস্তে বেরিয়ে এলো সে। হল থেকে প্রায় সিকি মাইল দূরে বড়ো-বড়ো গাছে ছাওয়া ভুতুড়ে আমলকি-বাগান। দিনের বেলাতেই বাগানটার কাছে এলে গা ছমছম করে। সন্ধ্যার অন্ধকারে আরো ঘন হ'য়ে উঠেছে ভয়, নিঃশব্দতার ভারে আরো থমথম করছে। দৃঢ় পায়ে নিঃশব্দে নির্দিষ্ট জায়গায় এসে সুলেখা নিশ্বাস নিলো। তাকিয়ে দেখলো সুলতান আমেদ তার আগেই এসে দাঁড়িয়ে আছেন। গাছে হেলান দিয়ে প্রতীক্ষমাণ হ'য়ে সিগারেট খাচ্ছেন। এতোটা তৎপরতা আশা করেনি সুলেখা। বরং সংশয়াচ্ছন্ন মনেই এসেছিলো। এ-ধরনের লোকেরা সাধারণত কাপুরুষ হয়। প্রাণের ভয়ে সব সময়েই কাতর থাকে। এতো বড়ো একটা সভার মধ্যে, এতোগুলো হিন্দু যেখানে জড়ো হয়েছে, যেখানে মুসলমানরাও এই বিরোধিতায় বিধ্বস্ত হ'য়ে প্রায় ক্ষিপ্ত অবস্থায় এসে পৌছেছে, তাদের অগ্রাহ্য ক'রে, বুক ফুলিয়ে একেবারে একা-একা এই নিরিবিলি আমলকি-কুঞ্জে সোজা চেহারায় নির্ভীক হ'য়ে অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট রক্ষা করতে আসাটা ঈষৎ বীরত্ব-ব্যঞ্জক। সুলেখা তালুকদার যে তাকে সুনজরে দেখে না এই খোলাখুলি সত্যটা সে কি জানে না? এমনও তো হ'তে পারতো, সুলেখা নিজে না-এসে পার্টির ছেলেদের লেলিয়ে দিলে। মনে-মনে সুলেখা হাসলো। আসলে শিকারের গন্ধ পেয়েছে লোকটা। ভেবেছে একজন মেয়েকে এমন পরিবেশে হাতের কাছে পেয়ে না-জানি কোন বাসনা তার চরিতার্থ

হবে। মূঢ়। এখনো তুমি সুলেখা তালুকদারকে চিনতে পারোনি। তুমি স্বপ্নেও ভাবতে পারোনি, তোমার নিয়তি আজ তোমাকে কোথায় নিয়ে এসেছে। প্রাণের মায়া ভুলে এই ছুটে আসাটা একান্তভাবেই তার ইঙ্গিত। অবিশ্যি সুলেখাকে সন্দেহ করতে পারে তেমন আভাস এতোটুকুও সেদিন সুলেখা দেয়নি সুলতানকে। বরং রীতিমতো বন্ধুতার সুরই ঢেলেছিলো গলায়। অথবা (খারাপ অর্থে) আবদারের সুর। এগুলো আবার ঠিক আসে না সুলেখার। সে একরোখা, জেদি। তার সুর তার মনের অনুকূল, কাজের অনুকূল নয়। তবু কি সেদিন এই আমন্ত্রণের মধ্যে সে কিছুটা অন্তত কোমলতা মিশিয়ে দিতে পারেনি ? পেরেছিলো। পেরেছিলো ব'লেই এতো বড়ো দোর্দণ্ডপ্রতাপ শ্রীল শ্রীযুক্ত নবাব কাজি সুলতান আমেদ-সাহেবকে ফাঁদে ফেলতে পেরেছে। বুকের ভিতরটা মেঘের ডাকের মতো গুরগুর ক'রে উঠলো। সাবধানে সভয়ে চারদিকে তাকিয়ে সহজ হ'য়ে দাঁড়ালো।

সুলতান-সাহেব একটু হাসলেন। টোকা দিয়ে সিগারেটটা দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললেন, 'এই যে—'

'এসেছেন তা হ'লে ?'

'সন্দেহ ছিলো ?'

দু-পা এগুলো সুলেখা। কোন দিকে কিভাবে কতোটুকু ব্যবধানে দাঁড়ালে তার আসল কাজের সুবিধে হবে মনোযোগ দিয়ে সেটাই লক্ষ্য করলো বোধ হয়। বললো, 'তা নয়। কথা যে রেখেছেন তাতেই আমি সুখী।'

'আপনার কথা রাখবো না, ততোটা ব্যক্তিত্ব আমার নেই। বাধ্য ছাত্রের মতো যা বলেছেন, যেমন বলেছেন ঠিক তেমনি ক'রেই এসেছি। একেবারে নিরস্ত্র, নির্বান্ধব। বলুন, কী আপনার কথা।'

হঠাৎ একটু খারাপ লাগলো সুলেখার। খুন করাটা কিছু নয়; মস্ত একটা মঙ্গলের জন্য অতি তুচ্ছ এই নরহত্যা। কিন্তু এই নির্জনে, এ-ভাবে ফাঁকি দিয়ে ডেকে এনে—

'জায়গাটা কিন্তু বেশ, না?'

'মন্দ কী?'

'কলেজের এই আমলকি-বাগানের কথা আমি অনেক শুনেছি, দেখলুম এই প্রথম।'

'তাই নাকি?'

'আপনার সঙ্গে দেখা করবার এর চেয়ে উৎকৃষ্ট জায়গা আর কোথায় আছে এই নবাবগঞ্জ শহরে?'

'তা হ'লে ডেকে এনে খুব কষ্ট দিইনি?' কথার ফাঁকে সুলেখা আরো ছু-পা এগিয়ে এসে দাঁড়ালো।

সুলতান-সাহেব পকেট থেকে মস্ত এক রুমাল বার করলেন। মুঠোয় চেপে হাওয়া খেতে লাগলেন ধীরে-ধীরে। একটা অস্পষ্ট গন্ধ উঠলো। স্মিতহাস্যে বললেন, 'এর চেয়ে সুখী সারা জীবনেও হইনি।'

'এতো!'

'এতো!'

'আপনার কি গরম লাগছে খুব।'

'একটু তো বটেই।'

'রুমালের হাওয়া কি গাছের পাতার হাওয়ার চেয়ে শীতল?'

'ওটা একটা বিকার।'

'নবাবি রক্ত কিনা, তাই গরমটাও একটু বেশি।'

'তা-ও হ'তে পারে।'

'আর তা ছাড়া শহরময় যা দাপাদাপি ক'রে বেড়ান—'

'এইবার ঠাণ্ডা হবো।'

'ঠাণ্ডা হবেন ?'

ডান দিক থেকে স্থলেখা বাঁ দিকে এসে দাঁড়ালো। শোনা যায় প্রাণপাখিটি বক্ষঃস্থলের বাঁ দিকেই অবস্থান করে। ঠিক কোথায় বিদ্ধ করলে তার কী ফল হবে, কতোক্ষণ লাগবে শেষ হ'য়ে যেতে, সব স্থলেখার নখদর্পণে। সমস্ত রক্ত গরম হ'য়ে উঠেছে তার, একটা অস্বাভাবিক উত্তেজনায় ভিতর থেকে কেঁপে-কেঁপে উঠছে শরীর। আঁচলের আড়ালে ডান হাতের মুঠোয় শিরশির করছে ছোরাটা। আর দেরি কিসের ? মাত্র একটা পলক। তারপরেই লুটিয়ে পড়বে মানুষটা। সত্যিই ঠাণ্ডা হ'য়ে যাবে। একটা রিভলভার হ'লে স্থবিধে হ'তো বেশি। ব্যাপারটা এর চেয়ে অনেক সহজ হ'তো। গলা দিয়ে আওয়াজ বার করবার সময়টুকুও পেতো না, কিন্তু এই মৃত্যু— অবিশ্যি ভালোমতো বিদ্ধ করতে পারলে এই বা বন্দুকের চেয়ে কম কী ? মিনিট চার-পাঁচ। তারপরেই স্থির। হয়তো চীৎকারে আকৃষ্ট হ'য়ে ছুটে আসবে সবাই, ছোরাটা ছুঁড়ে ফেলে তারই বা সকলের সঙ্গে একজন হ'য়ে মিশে যেতে বাধা কোথায় ? কে বুঝবে ? কে জানবে ? মিটিং-এ এসেই দু-বার সে ঘুরে গেছে জায়গাটা, কোথা দিয়ে কেমন ক'রে গা ঢাকা দিয়ে ভালোমানুষ সেজে আবার ঘটনাস্থলে এসে পৌছতে পারে তার তালিকা তার মুখস্থ। কিন্তু রুমালটা অতো ঘন-ঘন নাড়ছে কেন ? আসল কাজে অস্থবিধে হ'য়ে যাচ্ছে যে, একাগ্রতা বিচ্ছিন্ন হ'য়ে যাচ্ছে, ঠিকমতো তাক করা যাচ্ছে না— আর রুমালই বা কই ? সবখানিই তো মুঠোর মধ্যে, হাতটাই নাড়ছে শুধু। এ কী বদভ্যাস !

'আপনি কি একটু অন্যমনস্ক আছেন ?' তাকিয়ে থেকে প্রশ্ন করলেন স্থলতান-সাহেব।

'অ্যাঁ— কই, না তো।'

'কী যেন ভাবছেন।'

'আপনার এই হাত নেড়ে হাওয়া খাওয়ার পদ্ধতিটা ঠিক বিজ্ঞান-সম্মত কিনা সে-কথাটা একটু ভাবছি বটে।'

'অসুবিধে হচ্ছে?'

'তা একটু হচ্ছে।'

তৎক্ষণাৎ হাত নামালেন সুলতান।

পায়ের পাতা লোহা করলো সুলেখা। লক্ষ্য স্থির করলো। না, আমলকি-বাগানের সহস্র ঝিঁঝির ডাক এখন আর তার কান বধির করছে না, তাদের চমকে-ওঠা আলো-আঁধারের অরণ্যে আর তার দৃষ্টি হারিয়ে যাচ্ছে না। শকুনছানার মানুষী কান্নায় কাঁপছে না বুকের ভিতরটা। লক্ষ-লক্ষ কোটি-কোটি জন্মের সংস্কার— যে-সংস্কার একটা জানোয়ারের মতো মানুষকে খুন করতেও কতো চোখ রাঙায়, সেই সংস্কারকে সে এক ঝাঁকানি দিয়ে দূরে ফেলে দিয়েছে। তবে আর কিসের দেরি! সুলেখার পটু হাত মুহূর্তে তড়িৎগতিতে উঠে এলো সুলতানের বুকের কাছে বিদ্ধ হ'তে। স্থির লক্ষ্যের জন্য এই হাত তার বিখ্যাত। তার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় কোনোদিন কেউ পারেনি তাদের সমিতিতে। সেনদাও না। আর আজই কি সে হেরে যাবে? অসম্ভব।

এই তো, এই তো সে দেখতে পাচ্ছে সুলতানের বুকের রক্ত, ফিনকি দিয়ে ফোয়ারা হ'য়ে কেমন ভিজিয়ে দিলো ঢাকাই মসলিনের চিকন কাজ-করা পাৎলা পাঞ্জাবির প্রশস্ত বুক। শাদা মানুষটা লাল হ'য়ে গেলো, লাল মানুষ কালো হ'য়ে গেলো, কালো মানুষে ছেয়ে গেলো পৃথিবী। তারপর সব অন্ধকার, অন্ধকারের অতল সমুদ্র।

সুলতান-সাহেব মুচকি হেসে বাঁ হাতে ধ'রে ফেলেছেন তার ছোরা-সুদ্ধু হাতটা। ডান হাতের রুমাল দিয়ে চেপে ধরেছেন তার নাক-মুখ। একটি শব্দ নেই কোথাও, কেবল তাঁর হাতের মস্ত থাবার ঢাকনার অন্ধকারে সুলেখার ছোট্টো নরম মুখটা ক্লোরোফর্মের সুতীব্র গন্ধে দম আটকে ঝেঁকে-ঝেঁকে উঠছে। শরীরটা বেঁকে-চুরে শতধা হ'য়ে ভেঙে যাচ্ছে। জীবনে এই প্রথম ভয় পেয়ে প্রাণপণ শক্তিতে সে চীৎকার ক'রে উঠলো, 'বাঁচাও, বাঁচাও!' আওয়াজ বেরুলো না, স্বরটা আটকে রইলো গলার মধ্যে। সুলেখার হালকা শরীরের দাপাদাপি একটা পাখির পাখা-ঝাপটের চেয়ে বেশি নয়। সুলতান-সাহেব অবলীলাক্রমে তাকে তুলে নিলেন বুকের মধ্যে।

কাছেই গাছের ছায়ায় মিশে কালো গাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে। খোলা দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকতে-ঢুকতে সুলতান বললেন, 'এই সুযোগের অপেক্ষা একা তোমারই ছিলো না সুলেখাসুন্দরী, এই গোলামেরও ছিলো।'

ড্রাইভার স্টার্ট দিলো, তিনি গাড়ির পরদাগুলো টেনে দিয়ে গুছিয়ে ব'সে বললেন, 'ফুল্ স্পীড।'

দ্বিতীয় খণ্ড

॥ এক ॥

সুলতান-সাহেব দরজার কাছে এসে বাইরের জুতো খুলে ঘরে পরবার জন্য সাজিয়ে-রাখা সবুজ মখমলের নরম নাগরায় পা গলালেন। তারপর কার্পেটের উপর দিয়ে নিঃশব্দে হেঁটে এগিয়ে এলেন ঘরের মধ্যে। একটু দাঁড়ালেন, সুলেখার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন একটু। তাঁর ভারি চোখের পাতায় একটি প্রগাঢ় আবেগের কম্পন, ধনুকের মতো বাঁকা, ঈষৎ পুরু, ঈষৎ চাপা ঠোঁটে এক ফোঁটা হাসির শিশির। আস্তে বললেন, 'কেমন আছো?'

দু-পা পিছিয়ে গিয়ে আরো শক্ত হ'য়ে, আরো শক্ত মুখে দাঁড়িয়ে থাকলো সুলেখা। জবাব দিলো না। নিষ্প্রয়োজন। এই একই প্রশ্ন সে প্রত্যহ শুনে আসছে আজ তিন মাস যাবৎ। প্রথম-প্রথম লাফিয়ে উঠে টুঁটি চেপে ধরতে ইচ্ছে করতো, ক্রমে স্তিমিত হ'য়ে এসেছে সেই তেজ। যেমন ক'রে মৃত প্রিয়তমের শোকে উন্মাদিনীর কাতর কান্নাও একদিন থেমে আসে, তেমনিই থেমে গেছে সব উত্তেজনা। এখন সে শান্ত, শীতল, কঠিন পাথরের মতো শক্ত, নিষ্প্রাণ। হতাশা। কেবল হতাশা। হতাশার নীরন্ধ্র নিতল অন্ধকারে হাবুডুবু খাওয়া। এ ছাড়া এখন আর-কিছু অবশিষ্ট নেই তার শূন্য হৃদয়ে।

সেই সন্ধ্যায়, রুমালের আড়ালে ক্লোরোফর্ম নিয়ে যেদিন এই শয়তান দেখা করতে গিয়েছিলো তার সঙ্গে, অজ্ঞান ক'রে ধ'রে নিয়ে এসেছিলো এখানে, সেদিন সে ঘুমিয়ে-ঘুমিয়েই ঢুকেছিলো এই বাড়ির ফটকে। ঘুমিয়ে-ঘুমিয়েই কেটে গিয়েছিলো রাতটা। পরের দিন সকালে চোখ

মেলে তাকিয়ে সে অবাক হ'য়ে গেলো। শিশির-ধোয়া, রোদে-ছাওয়া কী সুন্দর সকাল। আকাশ গভীর নীল। আশ্চর্য! আজ, এমন দিনে, সারা পৃথিবী যেদিন ঘন অন্ধকারে আচ্ছন্ন হ'য়ে যাওয়া উচিত ছিলো সেদিনও এমন উজ্জ্বল সুন্দর সুখে-ভরা সকাল? কী নিষ্ঠুর! কী নিষ্ঠুর! প্রকৃতির মতো নির্দয় আর-কিছু নেই জগতে। যা হোক, যেমন হোক, রাত্রির পর তেমনিই ফিরে-ফিরে সকাল আসে। দুই হাতে মুখ ঢেকে সে ফুঁপিয়ে উঠলো। মাথাটা তখনো ঝিমঝিম করছিলো, উঠতে গিয়ে আবার শুয়ে পড়তে হ'লো। সে যেখানে আছে সেটা এ-বাড়ির কোন মহল, তাকে সে-দিন নবাববাড়ির কোন মহলের উপযুক্ত ভেবে সেখানে রাখা হয়েছিলো, সে-কথা আজও জানে না সুলেখা। এখানে, এই মহলে এলো পরের দিন বেলা এগারোটার সময়। তার আগে ভিতরে-ভিতরে আঁকাবাঁকা অলি-গলি বেয়ে দালান পেরিয়ে তাকে নিয়ে গিয়েছিলো সুলতানের নিজস্ব দরবারকক্ষে। বিশাল ঘর, মাঝখানে ফরাশ-তাকিয়ার এক হাত পুরু নরম গদিতে অলস আলস্যে অর্ধশায়িত সুলতান। তাকে দেখেই মুচকি হেসে অভ্যর্থনা করলেন, 'এসো, এসো। প্রিয়তমে! কাল রাত্তিরে এ-অধীনের কুটিরে এসে ঘুমের কোনো ব্যাঘাত হয়নি তো? রাত্রিটা তোমার সঙ্গে কাটাইনি ব'লে অভিমান করোনি তো? স্নান, পান, আহার—'

মুখের কথা শেষ করতে দেয়নি সুলেখা। ছুটে এসে লাথি মেরেছিলো। মুহূর্তের জন্য বিহ্বল অসতর্ক সুলতানকে আঁচড়ে-কামড়ে ক্ষতবিক্ষত ক'রে দিয়েছিলো, তারপরেই সুলতান বজ্রের মতো কঠিন হাতে চেপে ধরলেন তার কচুপাতার মতো শ্যামল কোমল নরম মেয়ে-হাত। হাড়গুলো মড়মড় ক'রে উঠলো। কিন্তু তক্ষুনি ছেড়ে দিয়ে পাথর-চোখে তাকিয়ে রইলেন মুখের দিকে। চোখ থেকে সুলেখাও চোখ সরালো না। দুই শিকারীর মতো দু-জনের চোখ দু-জনের চোখের উপর বিঁধে রইলো।

সুলতান আবার সাটিন জাজিমের পালক-কুশানের নরম আরামে এলিয়ে কী জানি কেন সেই অপমান নিঃশব্দে হজম করলেন। চুপ ক'রে থেকে বললেন, 'বোসো।'

'না।' সুলেখা তেমনি উদ্ধত, তার পলক তেমনি স্থির।

সোনার লতা-আঁকা রুপোর পানদানি থেকে কয়েকটা ছোটো এলাচ মুখে দিলেন সুলতান-সাহেব। আয়াস ক'রে বললেন, 'কেন?'

'ঘেন্না করে।'

'মুসলমান ব'লে?'

'না।'

'তবে?'

'নর্দমার পোকা ব'লে।'

'পোকা?' হাসিতে ভেঙে গেলেন সুলতান, 'কই, টিপে তো মারতে পারলে না।'

সুলেখা দম নিচ্ছে বড়ো-বড়ো। মুখ লাল হ'য়ে উঠেছে।

'তোমার বুদ্ধির উপর কিন্তু এর চেয়ে বেশি শ্রদ্ধা ছিলো আমার।'

'বিশ্বাসঘাতক!'

'তোমার চেয়েও?'

'নীচ। হীন। কাপুরুষ।'

'আর কোনো বিশেষণ নেই?'

'তোমার মতো ঘৃণ্য আর কী আছে জগতে?'

'তুমিই আছো।'

'কী?'

'চুল-চেরা বিচার করলে, তোমার অপরাধের তুলনায় আমার অপরাধ কি খুব বেশি ভারি হবে ব'লে বোধ হচ্ছে তোমার?'

'বাতুল।'

'আমিও তোমাকে সে-কথাটাই বলি।'

'তুমি—তুমি আমার সঙ্গে মুখ সামলে কথা বলবে।'

'তুমিও। জানো তো আমি কে?'

'তা আর জানি না? হাজারবার জানি। তুমি একটা নরপিশাচ। একটা কুকুর। শৃগাল শকুনি কৃমিকীটের চেয়ে একটা নিকৃষ্ট প্রাণী তুমি।'

'বাঃ! উপমাগুলো তো বেশ সুন্দর হয়েছে। নেহাৎই রাজনীতি করো, তা নইলে এ-সব সুশ্রাব্য ভাষার জন্য কবি ব'লে একটা শিরোপা দিতাম তোমাকে।'

অসহায় ক্রোধে কাঁপতে লাগলো সুলেখা। ইচ্ছে করলো লোকটার চোখ দুটো খুবলে নেয়।

সুলতান এলাচ চিবুচ্ছেন। ঘর ভ'রে গেছে গন্ধে। শুধু এলাচের গন্ধই নয়, আতরের গন্ধও মিশে আছে তার সঙ্গে। উদাসভাবে একবার বাইরে তাকাচ্ছেন জানালা দিয়ে, একবার সুলেখাকে দেখছেন। কোলের মধ্যে তাকিয়াটা টেনে নিয়ে দুমড়োতে-দুমড়োতে হাসলেন, 'অতো রাগ কোরো না, রাগলে কি মেয়েদের ভালো দেখায়? লাবণ্য ক'মে যায়। অবিশ্যি রাগের একটা অন্য মানেও আছে। রাগ মানে রং, সে-রং রাগের প্রচ্ছদপটে অনুরাগের নামান্তরও হ'তে পারে। কী বলো?'

আবার ছুটে এসে উন্মাদ আবেগে ঠাশ ক'রে একটা চড় মারলো সুলেখা।

হাতে ধ'রে টেনে তাকে জাজিমের উপর বসিয়ে দিলেন সুলতান, 'মিথ্যা আস্ফালনে শক্তি ক্ষয় ক'রে লাভ নেই, পিয়ারি। জানো তো, এই মুহূর্তে তোমাকে নিয়ে আমি যা খুশি তাই করতে পারি!'

'স্ত্রীলোক নিয়ে ছিনিমিনি খেলাই তো তোমার পেশা।'

'যা বলেছো। ভালো হ'য়ে থাকো তো আদরও পেতে পারো।'

'থুথু!'

'অবিশ্যি গর্ত খুঁড়ে পাথরচাপা দেওয়াটাও এ-কালের পক্ষে মন্দ আইডিয়া নয়। আমার দুটো বাঘের মতো হাউণ্ড আছে, তাদের দিয়েও খাওয়াতে পারি।'

'করো, করো, তাই করো তুমি। তোমার মুখের গ্রাস হবার চাইতে কুকুরে ছিঁড়ে খাওয়া অনেক, অনেক ভালো।'

'সাহস ক'রে দাঁড়িয়ে মরতে পারবে?'

'পারবো না!'

'বেশ।' নরম পুরু হাতে আস্তে দুটি তালি দিলেন সুলতান-সাহেব। যেন দরজা ফুঁড়ে দু-দিক থেকে দুটো লোক বেরিয়ে এলো, নিচু হ'য়ে কুর্নিশ করতে-করতে পিছু হ'ঠে দাঁড়ালো।

'বাস্টার আর মাস্টার।'

লোক দুটো তৎক্ষণাৎ অদৃশ্য হ'য়ে গেলো, আর তার পরমুহূর্তেই দুই বাঘের মতো দুই বিশাল কুকুর এসে হাজির হ'লো ঘরে। সুলতানকে ঘিরে আদর করলো তারা, চাটলো, ল্যাজ নাড়লো। সুলতান হাসলেন, 'দেখেছো?'

'দেখেছি।'

'শুধু একটা ইঙ্গিতের অপেক্ষা। এদের আমি লোহার খাঁচায় অন্ধকার ঘরে বন্ধ ক'রে রাখি, কাঁচা মাংস খেতে দিই। এরা বাঘ-সিংহের চেয়ে ভয়ানক। গায়ে হাত দাও না, স্যাখো না সাহসটা পরীক্ষা ক'রে।'

হঠাৎ দু-হাতে দুটো বুক-সমান কুকুরকে জাপটে ধরলো সুলেখা, উত্তেজিত গলায় বললো, 'খা, খা, খেয়ে ফেল আমাকে।'

কুকুর দুটো গোঁ-গোঁ ক'রে উঠলো। সুলতান গ'র্জে উঠে থামালেন

তাদের। ছটো মোটা চেন দিয়ে বেঁধে লোক ছটো টেনে নিয়ে গেলো। বড়ো-বড়ো ঢেউয়ের মতো একমাথা চুলে একটা ঝাঁকানি দিয়ে ন'ড়ে-চ'ড়ে বসলেন স্থলতান, মাথা নেড়ে বললেন, 'না, এ-ভাবে না। হিঁছু মেয়েদের এ-ভাবে মারাটা আমার উচিত হবে না। তাঁরা হলেন সব স্বর্গের দেবী, তাঁদের দেহ কি কুকুরের মুখে দিয়ে অপবিত্র করতে পারি?' চোখে-মুখে একটা অদ্ভুত হাসি চিকচিক ক'রে উঠলো, 'পুড়ে মরতে পারো, সতীসাধ্বী?' পাশের রৌপ্যাধার থেকে দেশলাই তুলে নিলেন, 'যদি জ্যান্ত পুড়িয়ে মারি?'

খপ ক'রে হাত থেকে দেশলাই কেড়ে নিয়েছিলো স্থলেখা, চোখের পলকে জ্বালিয়ে দিয়েছিলো কোমরে গুঁজে-রাখা আঁচলের প্রান্ত।

লাফিয়ে এসে সে-আগুন নেবালেন স্থলতান-সাহেব, একটি চাপা ব্যঙ্গের হাসিতে ফেটে প'ড়ে বললেন, 'না, প্রেয়সী, না। এ-ভাবেও নয়। এ-মৃত্যু নয়। এর নাম তো আত্মহত্যা। আমি নিজে মারবো, নিজে।'

'মারো, মারো, এক্ষুনি আমাকে মেরে ফেলো। আমার আর সহ্য হয় না।'

এর পরে স্থলতান-সাহেব একটি মোমবাতি ধরিয়ে টেনে আনলেন স্থলেখার হাত, 'এই যে, এইরকম ক'রে পুড়তে হবে তোমাকে, ধীরে-ধীরে, তিলে-তিলে। রাখো, হাত রাখো।'

হাত রাখলো স্থলেখা। যেমন ক'রে স্থলতান দেখিয়ে দিলেন ঠিক তেমনি উপুড় ক'রে, যেমন ক'রে প্রদীপের শিষে কাজল-লতায় কাজল পাড়ে। আস্তে-আস্তে সেই হাতের তেলোর ছোটো একটি গোল জায়গা কালো হ'লো, ফ্যাকাশে হ'লো, নরম হ'লো, দগদগে হ'য়ে উঠলো কতোক্ষণ পরে। স্থলেখা তাকিয়ে আছে সেদিকে, নিবিষ্ট হ'য়ে দেখছে, ছই চোখে কৌতুক। কেবল ঘাম দেখা দিয়েছে কপালে আর পিঠের শিরদাঁড়ায়।

স্থলতান অস্থির হ'য়ে ন'ড়ে-চ'ড়ে উঠলেন, কী ভাবলেন, নিজের হাতের মুঠোয় টেনে নিলেন হাতটা, মোমবাতিটা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন দূরে। তাঁর দিঘির মতো কালো চোখ টলটল ক'রে উঠলো, দীর্ঘ পল্লবের ছায়া ঘন হ'লো দাড়ি-কামানো টকটকে-রং নীলচে গালের উপরে। চোখ বন্ধ করলেন তিনি। উঠে দাঁড়িয়ে ঈষৎ উঁচু গলায় বললেন, 'নতুন হল-ঘর।'

আবার দরজা ফুঁড়ে এগিয়ে এলো তুটো লোক, বিনীত গলায় বললো, 'সবুজ-মহল?'

স্থলতান চ'লে যেতে-যেতে একবার চোখের কোণে তাকালেন।

॥ দুই ॥

তারপরই লোক তুটো তাকে সসম্মানে এখানে নিয়ে এসেছিলো, এই নতুন হল-ঘরে, যার নাম সবুজ-মহল। সেই থেকে এই তিন মাস সে বন্দী হ'য়ে আছে এই সোনার কারাগারে। যত্নের অভাব নেই, স্থলতানের দয়ায় চারজন বাঁদি অহোরাত্র এক পায়ে দাঁড়িয়ে আছে দরজায় হুকুমের প্রত্যাশায়। নবাবি আহার্যের প্রস্থ তাকিয়ে দেখবার মতো। ওরা খেতে পীড়াপীড়ি করে। প্রথম দিকে জবেদা তাকে কী চোখে দেখেছিলো কে জানে, আজকাল তার ভঙ্গি মায়ের মতো। তার ব্যবহার স্নেহার্দ্র। তিন মাসে যেন দাবি জন্মেছে তার, অধিকার বেড়েছে। খাওয়া-পরা সব নিয়ে সে আজকাল জোর করে, তিরস্কার করে, প্রবোধ দেয়, হাত বুলোয় গায়ে মাথায়। রুপোর থালা-বাটি সূর্যের চেয়েও চোখ-ঝলসানো, আহার্য পর্বতপ্রমাণ। চুপ ক'রে চেয়ে দেখে স্থলেখা, খেতে পারে না। গলা বুজে আসে। ওদিকে নিত্য নতুন ফ্যাশানের শাড়ি আসছে, ব্লাউজ

আসছে, থরে-থরে সাজিয়ে রাখা হচ্ছে আলমারিতে, আসছে নিত্য নতুন ডিজাইনের সব মূল্যবান গয়না। ঠাসা হচ্ছে দেরাজে, জঞ্জাল বাড়ছে ঘরের। কেন, কার জন্য? শরীর থেকে মনকে বিমুক্ত ক'রে সুলেখা ব'সে থাকে নিস্পন্দ হ'য়ে। মনে-মনে শুধু এই তার মৃত্যুপণ— একদিন এর প্রতিশোধ আমি নেবো, নেবো, নেবো।

সুলতান আসেন সন্ধ্যাবেলা। সুগন্ধের ঢেউ তুলে প্রত্যেকদিন ঠিক এক সময়ে আসেন, এসে ব'সে থাকেন। কখনো কথা বলেন, কখনো বলেন না, চুপচাপ কাটিয়ে দেন সময়। মাঝে-মাঝে নিবন্ত সিগারে আগুনের ফুলকি তোলেন। আসবারও যেমন একটি নির্দিষ্ট সময় আছে, যাবার বেলায়ও তার ব্যতিক্রম হয় না। ঘড়ি দেখে উঠে যান। যেতে গিয়ে শুভরাত্রি জ্ঞাপন ক'রে দাঁড়িয়ে থাকেন একটু, কিসের প্রত্যাশায় কে জানে, সুলেখা ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে থাকে, দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে রক্ত বার করে রুদ্ধ আক্রোশে। প্রথম দিকে বন্য জন্তুর মতো উদ্দাম হ'য়ে সে হাতের কাছে যা পেতো ছুঁড়ে মারতো, আচমকা ঝাঁপিয়ে প'ড়ে কামড়ে ছিঁড়ে নিতো মাংস, অক্ষম রোষে কী যে করতো আর করতো না হিসেব থাকতো না কোনো। আজকাল চুপ ক'রে থাকে, কিছু বললে জবাব দেয় শান্ত গলায়।

সুলতান তাকিয়ে থাকেন, তাকিয়ে-তাকিয়েই সময় কেটে যায়, সুলেখার উদ্দামতা, নিস্তব্ধতা সবই যেন তাঁর কাছে সমান, কিছুতেই রাগ নেই, বাদ-প্রতিবাদ নেই। অদ্ভুত এক অধৈর্যহীন ক্ষমা।

হয়তো এই নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের কাছেই থেমে গেছে সুলেখার সক্রিয় প্রতিবাদ। ভিতরকার সব রক্ত জমাট বেঁধে পাথর হ'য়ে গেছে। অন্ধ একটা বোবা আক্রোশ বুকের ভিতরে হাজার মাথা খুঁড়ে

মরলেও আর কোনো শব্দ বেরোয় না সেখান থেকে। বরং অতীতে নিজের উত্তাল ব্যবহারের কথা ভাবলে এখন লজ্জা করে তার। ওটা তো একরকম হেরে যাওয়ারই চেহারা। সে যদি তাক ক'রে একটা লোককে একটা ফুলদানি ছুঁড়ে মারে, হাত দিয়ে ঠেকাতে গিয়েও না-পেরে তাতে যদি তার দু-ইঞ্চি গভীর হ'য়ে কপাল কেটে অজস্র-ধারে রক্তক্ষরণ হয়, আর তারও পরে লোকটা যদি একটা শব্দ উচ্চারণ না-ক'রে ক্ষতস্থানে রুমাল চেপে তেমনি ব'সে থাকে নিঃশব্দে, নিজেকে কেমন লাগে তখন! তার চেয়ে ঐ ফুলদানি দিয়ে আপন মাথা আপনি ফাটাতে বাধা ছিলো কোথায়? কিন্তু তা-ও পারেনি সুলেখা। ঘর থেকে তেমন বিপজ্জনক টুকিটাকি সব-কিছুই স'রে গিয়েছিলো সেই রাত্রে। পরের দিন সুলতান-সাহেব ঘরের চারদিকে তাকিয়ে নিরুদ্বেগে বলেছিলেন, 'আঘাতটা ভাগ্যে তুমি আমাকে করেছিলে, নিজেকে করবার দুর্বুদ্ধি হ'লে কী উপায় হ'তো? কতো কষ্ট পেতে।'

না, বলার মধ্যে কোনো ইঙ্গিত ছিলো না, পরিহাস ছিলো না, যা হ'লে হ'তে পারতো অথচ হয়নি শুধু তার জন্যেই কৃতজ্ঞতা ছিলো একটা। নিজেকে সেদিন ছোটো মনে হয়েছিলো সুলেখার। মনে-মনে প্রতিজ্ঞা করেছিলো আর হিংসাবৃত্তি নয়। সেনদার কথা মনে হয়েছিলো তার। বুঝেছিলো, অনেক অভিজ্ঞতার পরেই সেনদা বলতে পেরেছিলেন, 'রক্তের পথ পিছল, ও-পথে আর না।'

কিন্তু তবু সুলেখার সংযত হ'তে কতোদিন কেটে গেছে, কঠিন হ'তে কী কঠিন পরিশ্রম করতে হয়েছে মনের সঙ্গে—

'সুলেখা—' অনেকক্ষণ চুপচাপ জানালার বাইরে অন্ধকারে তাকিয়ে সিগার খেতে-খেতে সম্বোধন করলেন সুলতান-সাহেব।

মানুষটার অস্তিত্ব ভুলে গিয়েছিলো সুলেখা। চমকে চোখ তুলে তাকিয়ে জবাব দিলো, 'বলুন।'

'কিছু ভাবছিলে?'

'না।'

'কেমন অন্যমনস্ক—'

'ক্ষমা করুন।'

সুলতান হাসলেন, চুপ ক'রে থেকে বললেন, 'আজ তিন মাস তুমি এখানে আছো—'

'তিন মাস তেরো দিন ন' ঘণ্টা—'

'একেবারে মুখস্থ। বাঃ!'

'দোষ হয়েছে?'

'দোষ কেন। স্মরণশক্তির প্রশংসা করছিলাম।'

'আপনার তো অপরিসীম ক্ষমতা। দেখুন না এই স্মরণশক্তিটুকুও নষ্ট ক'রে দিতে পারেন কিনা।'

'তাতে কি তুমি সুখী হবে?'

'হবো না!'

'কেন?'

'আমি ভুলে যেতে চাই। সব ভুলে যেতে চাই।'

আজ কী জানি কেন ব্যাকুল হয়েছে সুলেখা। তার স্বভাববিরুদ্ধ-ভাবে আজ তার গলায় কান্নার সুর ফুটে উঠছে।

সুলতান সুলেখার রাগ দেখেছেন, বিতৃষ্ণা দেখেছেন, কাঠিন্য দেখেছেন, কান্না দেখেননি। নিষ্পলকে তাকিয়ে রইলেন মুখের দিকে। নরম ক'রে বললেন, 'কী ভুলে যেতে চাও?'

'সব। সব। সব ভুলে যেতে চাই। আমার নাম, আমার পরিচয়,

আমার—' দু-হাতে মুখ ঢাকলো সে। তার নিচু-করা মাথার দু-পাশের দুইগোছা চুল এসে ছড়িয়ে পড়লো মুখে বুকে।

'সুলেখা।' তাকে শান্ত হবার অবকাশ দিয়ে মৃদু গলায় আবার ডাকলেন সুলতান-সাহেব।

'বলুন।' আবার মুখ তুললো সুলেখা।

'তুমি কি জানো, এই তিন মাসে এই দেশের উপর দিয়ে কতো বড়ো-বড়ো ঢেউ গড়িয়ে গেলো?'

'জানি।'

'কতো রক্তগঙ্গা ব'য়ে গেলো, খবর রাখো তার?'

'অনুমান করতে পারি।'

'এটা নিশ্চয়ই স্বীকার করবে মাত্র তিন দিনের আগুনে এই শহরে যতো লোক মরেছে, পুড়েছে, নষ্ট হয়েছে, যতো মেয়ে ধর্মহীন হয়েছে তাদের সংখ্যার অন্তর্গত তুমি নও।'

'আপনার অনেক দয়া।'

'নিশ্চয়ই দয়া।' সুলতানের বিশাল চোখের শাদা অংশ ঈষৎ লাল হ'লো, 'সে-দয়ারই কি তুমি অপব্যবহার করছো না?'

'শাস্তি দিন।'

'শাস্তি! কী শাস্তি দেবো বলো তো?'

'গর্দান। জবরদস্তি। অন্ধকূপ। পাথর চাপা। চামড়া ছুলে নেয়া—আরো কতো কিছু আছে। আপনাদের আইনে তো অন্তহীন বিধান।'

'এর মধ্যে কোনটা তুমি পছন্দ করো।'

'ইতরবিশেষ আছে ব'লে মনে হয় না।'

'হয় না?'

'না।'

'আমার এখানে তোমার সবই সমান ?'

'সব।'

'এতো ঘৃণা ?'

'কতোটা আপনার কল্পনায় আসে ?'

স্থলতান চুপ করলেন। হাতের ফুলটা শুঁকলেন। নখে নখ ঘষলেন। বাইরে তাকালেন। অনেক পরে নিবন্ত চুরুটে আগুন ধরাতে-ধরাতে বললেন, 'মানুষের বুকের তলায় যে হৃদয় নামক অতি অদ্ভুত একটি যন্ত্র বসানো আছে তা কি তুমি জানো স্থলেখা ?'

'হৃদয়।' স্থলেখার সুসংবদ্ধ দাঁতের সারিতে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেলো, হাহা ক'রে হেসে উঠলো জোরে।

গম্ভীর হ'য়ে স্থলতান বললেন, 'একটু যদি সময় দাও, কয়েকটা কথা বলবো তোমাকে।'

'সব সময়ই তো আপনার সময় স্থলতান-সাহেব, আপনি যথেচ্ছাচার করুন না।'

'যথেচ্ছাচার করা আমার স্বভাব নয়।'

'নয় ?'

'তার কোনো প্রমাণ আমি দিইনি।'

'দেননি !' যেন বিস্ময়ের শেষ সীমায় পৌছলো স্থলেখার গলা।

'না। আর সেটা যে কতো সত্য তার প্রধান সাক্ষী তো তুমি নিজে।'

'কে জানে, এটাই হয়তো আপনার যথেচ্ছাচারের নতুন নমুনা।'

'নতুন নয়, পুরোনোও নয়, এটাই আমার স্বভাব।'

'ক্ষমা করুন, জানা ছিলো না।'

'অনেক-কিছুই তোমার জানা ছিলো না। কিছু জেনেছো, আরো কিছু জানানো দরকার, তুমি একটু শান্ত হ'য়ে শুনলে বাধিত হবো।'

'বলুন।'

'প্রথম নম্বর হচ্ছে এ-শহরে যতোগুলো দাঙ্গা এ-পর্যন্ত হয়েছে, তার অধিকাংশের সঙ্গেই আমার কোনো প্রত্যক্ষ যোগ ছিলো না।'

একদিকের ভুরু তুলে চকিতে সুলতানের মুখটা দেখে নিলো সুলেখা। বুঝতে পারলো না, হাসবে না কাঁদবে।

'অবিশ্যি এটাকে তুমি আমার কৈফিয়ৎ ব'লে ভুল কোরো না, কেননা কৈফিয়ৎ আমি দিচ্ছি না তোমাকে, দাঙ্গার সঙ্গে যুক্ত না-থাকলেও স্বীকার করতে লজ্জা নেই যে, এ-ব্যাপারে আমার উৎসাহের কোনো অভাব ছিলো না। হিন্দুদের আমি ঘৃণা করি, তাদের উপর আমার অসামান্য বিতৃষ্ণা।'

'চমৎকার!'

'প্রথম যেবার মারামারির সূত্রপাত হ'লো আমার ভালোই লেগেছিলো। আব্বাজান বললেন, "আমি বেঁচে থাকতে আমার প্রজারা যাতে এই অন্যায় না-করতে পারে, সেটা তুমি দেখবে।" আমি বললুম, "কাউকে বাধাও দেবো না, উত্তেজিতও করবো না।" আব্বাজান রাগ ক'রে বললেন, "তার মানে তুমি চাও এটা হোক।" জবাব দিইনি, কিন্তু মনে-মনে বলেছিলাম, হোক। আসল কথা, মনে করেছিলাম তোমাদের কিছু শিক্ষা হওয়া দরকার।'

'শুনে সুখী হলুম।'

'এ-খবরটা এজন্যেই তোমাকে দিলাম শেষ পর্যন্ত এই বিরোধটাকে আমি থামাতেই চেষ্টা করেছিলাম। বিশেষত পাকিস্তান হ'য়ে যাবার পরে পাকিস্তানের হিন্দুদের সঙ্গে লড়াই করাটা রীতিমতো কলঙ্ক। মারামারি যেখানে একপক্ষের কর্তৃত্বে সেখানে সেই হীনতায় আমার কোনো সায় নেই, বরং পারলে উল্টো পক্ষে যোগ দিতাম।'

'অনেক ধন্যবাদ।'

'জানো বোধ হয় আমার নানাসাহেব নবাব আমিরআলি-সাহেবের সঙ্গে তোমার ঠাকুর্দা ভুবন তালুকদারের একসময়ে বেশ সৌহার্দ্য ছিলো।'

'জানি।'

'আমার বাবার সঙ্গেও তোমার বাবার মন্দ পরিচয় ছিলো না। আর আমি—'

'আপনি! আপনি তো আমাদের পরম বন্ধু।' তির্যক দৃষ্টিতে সুলতানের দিকে তাকালো সুলেখা, 'তা নইলে কি এই উপকার কেউ করে?'

'নেহাৎ মিথ্যে কী।' সুলতান একদিকের চোখটা একটু ছোটো করলেন, 'বন্ধু না-হ'লে নিজের সমাজে নিজের মাথা বন্ধক রেখে কি আর তোমার মাকে আর ভাইদের বোরকা পরিয়ে এরোড্রোমে পৌঁছে দিই?'

'মানে?'

'বাংলা ভাষা নিশ্চয়ই বোঝো।'

হঠাৎ চুপ হ'য়ে গেলো সুলেখা। এই সুদীর্ঘ তিন মাসের মধ্যে এই প্রথম সে তার মা আর ভাইদের খবর শুনলো। এই প্রথম তার নিচু-করা মুখের শুকনো চোখ থেকে সহসা কয়েক ফোঁটা তপ্ত জল ঝ'রে পড়লো গালিচার উপর।

'তুমি অবিশ্যি বলতে পারো—' মস্ত এক ধোঁয়ার রিং পদ্ম-আঁকা সীলিং-এ ছড়িয়ে দিলেন সুলতান-সাহেব, 'তাদের যদি পাঠাতে পারলাম তবে তোমাকেই বা আটকে রাখলাম কেন?'

সুলেখা কথা বললো না। তার এলোমেলো চিন্তার ধারা হাজার জিজ্ঞাসায় আলোড়িত হ'য়ে উঠলো।

অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে সুলতান বললেন, 'কিন্তু তোমাকে যেন আজ বড়োই উত্তেজিত ব'লে মনে হচ্ছে।'

'না।'

'তোমার বেশভূষা—'

'যা বলবেন বলুন।'

'এলোমেলো চুল, ময়লা কাপড়— ও, সেই শাড়ি!' ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটলো, 'একটা শাড়ি অবলম্বন ক'রেই তুমি এই সুলতান-সমুদ্র পাড়ি দেবে স্থির করেছো? হায় রে সুলেখা, ঘরে একটা পেন্সিল-কাটা ছুরিও রাখিনি যে দু-নয়ন সার্থক করবে বুকের রক্ত দেখে। সীলিং-এ একটা কড়িকাঠ পর্যন্ত নেই যে গলায় দড়ি দেবে।'

সুলেখা চুপ।

'মাথাটা আঁচড়াও না।'

'মাথা আঁচড়াবার পরেও তো আমাকে সুন্দরী ব'লে ভুল হবে না আপনার।'

'না, সে-ভয় নেই। তুমি আমার কাছে চেহারার অতীত।' জানালা দিয়ে বাইরে তাকালেন সুলতান-সাহেব। মুখ ফিরিয়ে বললেন, 'তোমার কি মনে আছে সুলেখা, বছর তিনেক আগে কী-একটা উপলক্ষে তোমরা কয়েকটি মেয়ে চাঁদা চাইতে এসেছিলে আমাদের এই আসমান-মঞ্জিলের হাতায়?'

'আছে।'

'তুমি তোমাদের দলবলের সঙ্গে আমাদের সবুজ-মহলে ঢুকেছিলে, আমার নানি, চাচি, এদের গান শুনিয়ে টাকা আদায় করেছিলে মোটা রকম। যিনি তোমাদের নেতৃত্ব ক'রে নিয়ে এসেছিলেন, তিনি তোমাকে পরিচয় করিয়ে দিলেন ভুবন তালুকদারের নাতনি ব'লে, যদি বা সেই সুবাদে কিছু বেশি সুবিধে পাওয়া যায়।'

'সেখানে কেউ আমরা ব্যক্তিগত সুবিধের কথা ভেবে যাইনি।'

'পরার্থেই গিয়েছিলে, অস্বীকার করছি না, তা যা-ই হোক, গানটা গেয়েছিলে চমৎকার। পাখির মতো গলা ছিলো তোমার, প্রায় অবাক হ'য়ে গিয়েছিলাম শুনে। একটি ছোট্টো মেয়েকে মনে পড়ছিলো বারে-বারে, ভালো লাগছিলো। আমি পাশের ঘরে ছিলুম, যখন চ'লে গেলে উঠে গিয়ে জানালায় দাঁড়ালাম। আশ্চর্য, ঐ দলের মধ্যে দেখেও তুমি যে তুমি, সেটা চিনতে একটু কষ্ট হ'লো না আমার। অথচ তোমাকে আমি শেষ দেখেছিলাম—' একটু থামলেন সুলতান-সাহেব, একটু তাকিয়ে রইলেন, 'সকালবেলাকার সমুদ্রের বুক থেকে যেমন লাফ দিয়ে উঠে আসে নতুন সূর্য, ঠিক তেমনি ক'রে তুমি উঠে এসেছিলে আমার স্মৃতিতে।'

'সংক্ষেপে বলুন।'

'তোমাকে আবার দেখতে ইচ্ছে করলো আমার। তুমি তখন রাজনীতি নিয়ে খেপেছো, এখানে মিটিং, ওখানে বক্তৃতা, সেখানে গান, কোথাও চাঁদা তোলার পালা— লেগেই আছে শহরে। আর আমি, যেখানেই তুমি আছো জেনেছি, সেখানেই অকারণে ছুটে গিয়েছি পাগলের মতো। তুমি যে আমার সবচেয়ে বড়ো শত্রু, কয়েকদিনের মধ্যে জানতে পেরেছিলাম সে-কথা, এও জেনেছিলাম সেই সময়ে আমার মৃত্যুই তোমার প্রতি মুহূর্তের কামনা ছিলো, তবু মন ফেরাতে পারিনি, প্রাণের মমতা ভুলে গিয়েছি।'

প্রেম-নিবেদন। ইশ! আড়মোড়া ভাঙলো সুলেখা।

'তারপর সেই আকর্ষণের বেগ আমাকে কতো দূরে টেনে নিয়ে এলো, তা তো দেখতে পাচ্ছো।'

'খুব ভাগ্যের কথা।'

'নেহাৎ মন্দ ভাগ্যই বা কী।' ঈষৎ উষ্ণ শোনালো সুলতান-সাহেবের গলা— 'নবাবজাদার প্রেম কিছু পথে-ঘাটে ছড়ানো থাকে না।'

'থাকে না বুঝি ?'

'আর আমিও কিছু অযোগ্য নই। যদিও হিন্দু-বিদ্বেষী।'

'আমিও হিন্দু, সুলতান-সাহেব।'

'তবু তোমাকে কতো আতিথেয়তা করছি, দেখছো তো ? তোমাদের জাতের চাইতে অন্তত উদার, কী বলো ?' টানা-টানা চোখ আরো টান করলেন, 'আর তোমরা হিন্দুরা ? ঘরে গেলে জল ফেলে দাও, ছায়া মাড়ালে স্নান করো। ওদিকে বুলি কপচাও হিন্দু-মুসলমান ভাই-ভাই। হিপোক্রিট। সুলেখা, তোমাদের নিষ্ক্রিয় নিষ্ঠুরতা, আমাদের ছোরা মারার চাইতে ঢের, ঢের বেশি যন্ত্রণাদায়ক। তোমরা মারো আত্মাকে, আমরা মারি শরীরকে। শরীর তো খোলস মাত্র। অসুখ সেরে গেলেই ভুলে যাই। কিন্তু যে-বেদনা মনকে আহত করে, তার স্মৃতি পর্যন্ত কতো কষ্টের। সন্তান মরলে তাকে কোন মা ভুলে যেতে পারে।'

সুলেখা অতিষ্ঠ বোধ করলো। আজ হ'লো কী লোকটার! এতো কথা কেন বলছে ? কী মৎলব ? কী চায়! আর কতোক্ষণ এই যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে! এখানে থাকবার সময় কি এখনো ওর উত্তীর্ণ হয়নি। আঙুল দিয়ে সে মাথা টিপলো।

'সেইজন্যেই তো আজকের দিনে এই প্রতিশোধের আগুন জ'লে উঠছে প্রত্যেক মুসলমানের মনে।' উত্তেজনায় হাতের জলন্ত সিগারটা টোকা মেরে ছুঁড়ে দিলেন জানালা দিয়ে, বড়ো-বড়ো নিশ্বাস নিয়ে বললেন, 'বলতে পারো, কোন আত্মসম্মানজ্ঞানসম্পন্ন মানুষ এই অন্যায়ের প্রতিবাদ না-ক'রে পারে ? তোমাকে যদি আমি ছুঁতে ঘেন্না করি, আমাকে ছোঁবার প্রবৃত্তি তোমার ক'দিন থাকবে ? যা দেবে তাই পাবে, কৃতকর্মের প্রতিশোধ আছেই একদিন। হ্যাঁ, লোকে যা ভাবে আমি ঠিক তাই, তার চেয়েও বেশি। হিন্দু দেখলেই আমার মাথায় খুন চেপে যায়,

আমার বালক বয়সের সমস্ত বেদনা হিংসার আগুনে জ্ব'লে ওঠে। কাফের, কুত্তা, নিষ্ঠুর।' হলুদ সাটিনের কুশান থেকে এলানো পিঠ খাড়া করলেন স্থলতান-সাহেব, 'তবু যে-মুহূর্তে খবর পেলাম তোমাদের বাড়ি আক্রমণ করেছে, তৎক্ষণাৎ লোক ছুটিয়ে দিলাম তোমার পরিজনদের নিরাপদ জায়গায় পৌছে দেবার জন্য।'

'এতোই যদি দয়া, তা হ'লে আমার পরিজনদের মতো আমাকেও তো নিরাপদ জায়গায় পৌছে দিতে পারতেন স্থলতান-সাহেব।'

'না, ততোটা নির্লোভ আমি নই। আমার এখানে এ-ভাবে নিয়ে আসা ছাড়া তোমাকে পাবার অন্য কোনো রাস্তা আমার জানা ছিলো না।' আর সে-স্থযোগটা তো তুমিই হাতে তুলে দিয়েছো। ফাঁসির ঘরে না-পাঠিয়ে এই যে নিজের ঘরে নিয়ে এসেছি তার জন্য কি তোমার আমার উপর কৃতজ্ঞই থাকা উচিত নয়?'

শয়তান! মনে-মনে আওড়ালো স্থলেখা। মুখে বললো, 'আপনার ইচ্ছের আপনি যতো খুশি মূল্য দিন, কিন্তু পাওয়াটা তো তার উপর নির্ভর করে না।'

'যদি বলি করে?'

'আপনি শহরের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হ'তে পারেন, হাজার বাঁদি এনে আকবরের মতো ঘুঁটি সাজিয়ে দাবার ছক কাটতে পারেন, কিন্তু আমাকে আপনি কখনোই পাবেন না। না, না, না। শরীরটাকে বাঘের মতো চিবিয়ে খেলেও না। আপনাকে আমি ঘৃণা করি।'

স্থলতান তাকিয়ে রইলেন স্থলেখার দিকে।

স্থলেখার চোখে আগুন জ্বললো, 'এ নিয়ে কতো মশা মারলেন জাঁহাপনা, জিজ্ঞেস করতে পারি কি?'

মাথা নিচু করলেন স্থলতান। ঘন চুলে আঙুল ডুবিয়ে শান্ত গলায়

বললেন, 'তোমার উপর আমি রাগও করতে পারি না, আমি এমনিই হতভাগ্য। কিছু মনে কোরো না, অনেক বিরক্ত করলাম আজ তোমাকে। কিন্তু আজই তো শেষ দিন, কতগুলো কথা মন থেকে বেরিয়ে আসছে।'

'শেষ দিন!' তৎক্ষণাৎ গলায় অন্য স্বর বেজে উঠলো সুলেখার, 'কোথায়? কোথায় আমি যাবো?'

'কোথায় যেতে চাও?'

'আমার মা, আমার ভাইয়েরা—' সুলেখা হঠাৎ এগিয়ে এসে হাঁটু ভেঙে ব'সে পড়লো মেঝের উপর, 'সুলতান-সাহেব, অনেক বেয়াদবি করেছি, অনেক অন্যায় করেছি, আমাকে মাপ করুন। আপনি আমাকে পাঠিয়ে দিন তাঁদের কাছে। আর আমি পারি না। পারি না।'

এতো তেজ, এতো জেদ, কোথায় ভেসে গেলো চোখের জলে। দু-হাতে মুখ ঢেকে ছোটো মেয়ের মতো কাঁদতে লাগলো সে।

সুলতান-সাহেব অনেকক্ষণ দেখলেন সেই কান্না। তারপর দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ব'সে রইলেন চুপচাপ। সময় ব'য়ে যেতে লাগলো নিঃশব্দে। অনেক পরে সুলেখা নিজেই মুখ তুললো, বর্ষার সজল ঘাসের মতো কান্না-ভেজা মুখ। এই মুখখানাকেই আজ তিন বছর ধ'রে ভালোবেসে এসেছেন সুলতান-সাহেব। তিন বছর। না কি সারা জীবন? একটি এগারো বছরের বালককে কি স্পষ্ট মনে পড়ছে না আজ? নবাব আমিরআলি-সাহেবের সঙ্গে প্রায়ই যে-বালক টমটমে চ'ড়ে বেড়াতে যেতো আর মাঝে-মাঝেই যে-টমটম গিয়ে কমলাপুরের এক বাড়ির দরজায় থামতো? ঘণ্টা বাজলেই ভিড় জ'মে যেতো সেখানে। বাড়ির পুরুষেরা এগিয়ে এসে সাদর অভ্যর্থনা জানাতেন। হাস্য-বিনিময় হ'তো, কুশল-বিনিময় হ'তো, ভালোবাসার আদান-প্রদান হ'তো। আলি-সাহেব গাড়ি থেকে নামতেন

না। পারিবারিক উকিলের বাড়ি, নিমন্ত্রণ-আমন্ত্রণ হ'লেই যেতেন। গিয়ে নিজে হাতে উপহার দিয়ে আসতেন। কখনো সোনাদানা, কখনো গিনি-মোহর, কখনো বা টাকার তোড়া। ফল ফুল মিষ্টি তো আছেই। সকলের সঙ্গে-সঙ্গে একটি ছোট্টো মেয়েও এসে দাঁড়াতো সেখানে, নবাব-সাহেব ভালোবাসতেন তাকে। দেখলেই হাত বাড়িয়ে গাড়িতে তুলে নিতেন, তার ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া চুলে-ভরা মাথাটা বুকের মধ্যে নিয়ে আদর করতেন। বালকটি পাশে ব'সে একটু-একটু হিংসেও করতো, কিন্তু সুখীও হ'তো। মেয়েটির ফ্রকটা একটু গায়ে লাগতো তার, চুলগুলো অনেক সময় উড়ে-উড়ে এসে সুড়সুড়ি দিতো মুখে, বুকটা কাঁপতো তার। মেয়েটির বাবা বোধ হয় বালকটিকে পছন্দ করতেন, হাতে ধ'রে গাড়ি থেকে নামাতেন, তাঁর মেয়ের সঙ্গে খেলতে বলতেন। ঐটুকু একটা মেয়ের সঙ্গে কী খেলবে সে? তার বয়েস তখন দশ পূর্ণ— এগারো, নিজেকে কি সে হালকা ক'রে ফেলতে পারে? তবু আকর্ষণ বোধ করতো মনে-মনে, আর পিতার আদেশে মেয়েটি যখন লজ্জায় বুকের সঙ্গে থুতনি ঠেকিয়ে হাত বাড়িয়ে বলতো 'এসো', তার তুল্য সুখ আর কোনো-কিছুই ভাবতে পারতো না। সামনেই ওদের বৈঠকখানা ঘর ছিলো, তার কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়ালেই ছেলেটি টের পেতো, সারা বাড়িতে একটা সাড়া প'ড়ে গিয়েছে নবাব-সাহেবের জন্যে, তাঁর অভ্যর্থনার আয়োজনে সবাই ব্যস্ত হ'য়ে উঠেছে। সেই ব্যস্ত হাঁক-ডাকের মধ্যে প্রায়ই কয়েকটা কথা ছেলেটির কানে এসে তীরের মতো বিঁধতো। 'আরে না না, ওটা না, মুসলমানের হুঁকো আলাদা তা-ও জানিস না?' কিংবা: 'রুপোর থালায় পান দে, খাবার দিস না, এঁটো হ'য়ে যাবে। কাচের বাসনে দে, ফেলে দিলেই চলবে।' মুসলমান ব'লে আলাদা বস্তুটা কী, তখন ঠিক জানতো না ছেলেটি, কিন্তু কেন জানি মনটা তার খারাপ হ'য়ে যেতো। ফিরে আসতো সে

গাড়িতে। একদিন মেয়েটি হাত জড়িয়ে ধ'রে বললো, 'আমার মাকে দেখবে? চলো না ভিতরে যাই।' মা শব্দটা ছেলেটির কাছে মোহের মতো। কেননা তার নিজের মা ছিলো না। ভারি মায়ের শখ ছিলো তার। একটুও আপত্তি না-ক'রে পায়ে-পায়ে ভেতর-বাড়িতে এগিয়ে এলো, সঙ্গে-সঙ্গে কে-একজন হাঁ হাঁ ক'রে ছুটে এসে বললো, 'করিস কী, করিস কী, এ-ঘরে কোথায় নিয়ে যাস, খাবার জল আছে না?' বুকটা থেমে গেলো ছেলেটির। একজন মহিলা এগিয়ে এসে রাগ করলেন, 'হাবা মেয়ে। কোনো বোধ যদি থাকতো। তুই জানিস না এ-ঘরে আনতে নেই, এ-ঘরে খাবার-দাবার আছে সব, এইমাত্র ভোগের মিষ্টান্ন এনে রেখেছে, ছুঁয়ে-ছেনে দিলো একাকার ক'রে। এখন ফেলো সব, ধোও, মোছো— যতো ম্লেচ্ছ কাণ্ড—'

ঘরেও ঢোকেনি ছেলেটি, শুধু চৌকাঠে পা রেখেছিলো; কান দুটো ঝাঁ-ঝাঁ করতে লাগলো তার এ-কথা শুনে। লজ্জায় অপমানে সেই চৌকাঠে পা রেখেই যেন ম'রে গেলো সে। বাড়ি ফিরে বুকটা জ্ব'লে গেলো। একটা অস্বাভাবিক ক্রোধ, বেদনা, ঈর্ষা, অপমান ছিন্নভিন্ন ক'রে দিলো তাকে। কয়েকটা দিন যে কেমন ক'রে কাটলো কে জানে। তারপর আস্তে-আস্তে তার পরিবর্তন ঘটলো একটা, তার রাগ বাড়লো, মর্জি বাড়লো, অবাধ্য হ'লো। এ-রকম হবার স্পষ্ট কারণ কেউ বুঝলো না, সে নিজেও হয়তো নয়। গুরুজনের শাসন অবারিত হ'য়ে উঠলো।

একদিন সে এক অদ্ভুত আবদার ধরলো তার নানাসাহেবের কাছে। যে-ইস্কুলে হিন্দু ছেলেরা পড়ে সে-ইস্কুলে সে পড়বে না। হিন্দুরা খারাপ, হিন্দুদের দেখলে তার ঘেন্না করে। নানাসাহেব জিভ কেটে কানে আঙুল দিলেন। আব্বাজান রক্তচক্ষু দেখালেন, কিন্তু ছেলেটি তার গোঁ ছাড়লো না, ইস্কুলে যাওয়া ছেড়ে দিলো। ইস্কুলটি বলতে গেলে নবাবদেরই,

নিজেদের ছেলেপুলের জন্যই এ-ইস্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তাঁরা। কিন্তু নবাবগঞ্জের যাঁরা বিশেষ এবং বিশিষ্ট ব্যক্তি, তাঁদের প্রত্যেকের ছেলেই পড়তো সেখানে। ঐ ইস্কুলের শিক্ষকেরা সকলেই উচ্চশিক্ষিত ছিলেন, উচ্চ মূল্যেই আনা হয়েছিলো তাঁদের। তা ছাড়া ইংরিজি শেখাবার জন্য একজন পাদ্রি-সাহেবও ছিলেন। ঠিক ঐ-ধরনের ইস্কুল খুব কম ছিলো তখন। স্কুলের মাইনে বেশি ছিলো ব'লে জনসাধারণের অধিগম্য ছিলো না। মূলত নবাববাড়ির ছেলেদের জন্য হ'লেও হিন্দু ছাত্রের সংখ্যাও কম ছিলো না। অভদ্রের মতো কী ক'রে সেইসব ছেলে তাড়িয়ে দেওয়া যায়। আর কেনই বা দেবেন। এ-শহরে কি কোনো ভেদ আছে হিন্দু-মুসলমানে? থাকলেও নবাব আমিরআলি-সাহেব কি তার প্রশ্রয় দিয়েছেন কোনোদিন? তিনি নিজেই তো হিন্দুদের কতো আচার-আচরণ পালন করেন। তেমনি কতো হিন্দু দরগায় যায়, পরবের দিনে আলো জ্বালে, মুশকিল-আসানকে পয়সা দেয়। এ-বাড়ির ছেলে হ'য়ে এ কী দুর্মতি হ'লো তাঁর নাতির? নানা কথায়, নানা গল্পে তাকে বোঝালেন তিনি, সব মানুষই যে এক আল্লার তৈরি, সব মানুষের বুকের মধ্যেই যে তাঁর বাস, এ-সব জ্ঞানের কথাও অনেক বললেন, কিন্তু ফল হ'লো না। যুক্তিতর্ক সব ভেসে গেলো বালকের একগুঁয়েমির কাছে। শেষে তার আব্বাজান, নবাব আখতার আমেদ, খুব মারলেন তাকে। মার খেয়ে মার হজম করবে, নবাবি রক্ত এতো শীতল নয়। পরের দিন ইস্কুলে গিয়ে, মুসলমান ছেলেদের সঙ্গে দল পাকিয়ে হিন্দু ছেলেদের সঙ্গে অকারণে ঝগড়া বাধিয়ে তাদের জঘন্য ভাষায় গালাগালি দিলো, থুতু ছিটোলো, কিল চড় ঘুষি লাথি কিছুই বাদ দিলো না, শেষ পর্যন্ত একটা ছোটো ছেলেকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে মাথা ফাটিয়ে দিলো। আর তাই নিয়ে দারুণ গোলমাল হ'লো শহরে। প্রায় একটা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার

চেহারা নিলো ব্যাপারটা। আলি-সাহেব নিজে দাঁড়িয়ে ক্ষমা প্রার্থনা ক'রে সেই বিরোধ মেটালেন।

কবেকার কথা সে-সব, কবেকার মূঢ়তা। মনেও ছিলো না। কিন্তু আবার দু-কূল ছাপিয়ে বন্যা নামলো, আবার স্থলেখা তার জুড়িয়ে-যাওয়া যন্ত্রণায় রক্তক্ষরণ করালো। স্থলেখা। স্থলেখা। স্থলেখা। এই স্থলেখাই তার সকল সর্বনাশের মূল। দশ বছর বয়স থেকে এই মেয়েই তাকে এমন আগুনের বেড়াজালে পুড়িয়ে মারছে। তা নইলে তার এই একা নিঃসঙ্গ জীবন নিয়ে দেশে-বিদেশে ঘুরে বেড়িয়ে মন্দ কাটছিলো কী? আব্বাজান ছেলের বেদুইন মনকে ঠাণ্ডা করবার জন্য বিয়েও ঠিক করেছিলেন, এমনকি আলাদা একটা মহল পর্যন্ত তৈরি হ'য়ে গেলো সেই উপলক্ষে। যদি সেদিন আসমান-মঞ্জিলে স্থলেখা না আসতো, সুলতান তাকে না দেখতো, তার পাখির গলার গান না শুনতো, জীবনের আসল মুহূর্তটা এমনভাবে নষ্ট হ'য়ে যেতো না।

সব গোলমাল হ'য়ে গেলো। আব্বাজানের সব সাধ-আহ্লাদ ব্যর্থ ক'রে দিলো তার ছেলে। কতো দুঃখ নিয়ে তিনি মারা গেলেন, কিন্তু ছেলে যে তাঁর কী চায় সে-কথাটাই শুধু জেনে যেতে পারলেন না। জানলেই কি কিছু হ'তো? কী করতে পারতেন? মৃত ভুবন তালুকদারের বিধবা পুত্রবধূর এই কালো মেয়েটিকে আনতে পারতেন কি নিজের ঘরে? কেন পারতেন না? মুসলমান হ'য়ে জন্মেছেন ব'লেই পারতেন না। যতো যোগ্যতাই থাক, হৃদয়ভরা যতো ভালোবাসাই থাক, অর্থ প্রতিপত্তি স্বাস্থ্য সৌন্দর্য যা-ই থাক না কেন, কিছুতেই তিনি পেতে পারতেন না এই মেয়েকে। শুধু জাত। জাত। একমাত্র জাতের ব্যবধান। আর তাঁর কী অপরাধ? স্বামী হিসেবে এর চেয়ে যোগ্য আর কী আশা

করতে পারে একজন মেয়ে? নিঃস্ব বিধবার এই আটপৌরে মেয়ে, পরের সংসারে অনাদর-অবহেলা ছাড়া আর-কিছুই যে পায়নি, তার পক্ষে এই ধনীপুত্র— এইটুকু বয়সেই যে বাপের গদিতে বসেছে, বছরে যার সতেরো লক্ষ টাকা আয়, যার কোনো অংশীদার পর্যন্ত নেই, সে তো একটা স্বপ্ন। আর শুধু কি বাপেরই অর্থ! কী নেই সুলতান-সাহেবের? দেখতে কি তিনি খারাপ? বিদ্যাবুদ্ধিতেও কি অনন্যসাধারণ নন? কিন্তু মুসলমান। শুধু মুসলমান। এই একমাত্র বাধা। আর সে-বাধা কী ভীষণ! ভীষণ! যে-লোকটা চৌকাঠে দাঁড়ালেও ঘরের জল ফেলে দিতে হয়, বিয়ের প্রস্তাব তো দূরের কথা, তাকে দেখলেও সুলেখার নিষ্ঠাবতী হিন্দু বিধবা মা হয়তো গঙ্গায় ডুব দিয়ে শুদ্ধ হতেন। আর সুলেখা নিজে?

। তিন ।

'সুলতান-সাহেব।'

সুলতানের চিন্তাসূত্র ছিঁড়ে গেলো।

'শোনো, সুলেখা,' ফরাসি সিল্কের ঢোলা লম্বা পোশাকে কম্পন তুলে তিনি উঠে দাঁড়ালেন, 'এই তিন বছর তোমাকে দেখবার পর থেকে সত্যিই আমি একটা শয়তানের পার্ট করেছি, যা নই বা ছিলাম না তাই হয়েছি, হিন্দুবিদ্বেষে প্রতিমুহূর্তে জ্ব'লে-পুড়ে মরেছি আমি। আমার সব ক্ষমতা আমি ঢেলে দিয়েছি একটা দাঙ্গা বাধাবার চেষ্টায়, যতো খারাপ লেগেছে, ততো উদ্দাম হ'য়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছি, কিন্তু টিকতে পারিনি শেষ পর্যন্ত, শেষ পর্যন্ত আমার বিবেক আমার শত্রুতা করেছে। তোমরা নিজে থেকেই যতোটা মন্দ, যতোটা কুৎসিত, আর যতো নিষ্ঠুর, আমি চেষ্টা ক'রেও তা হ'তে পারিনি। মানুষকে আমি মানুষ হিসেবেই ভালোবেসেছি,

জাত হিসেবে নয়। মানুষ হিসেবেই শ্রদ্ধা করেছি, তার নাম-গোত্র জিজ্ঞাসা করিনি। মুসলমানদের বিরোধ করতে প্ররোচনা দিয়েছি বটে, পরমুহূর্তেই আবার হিন্দুদের রক্ষা করেছি বুক দিয়ে। পাশাপাশি দুটো মানুষ কাজ করেছে আমার ভিতরে যাদের কোনোদিকে কোনো মিল নেই। এর আগেও তোমাকে চুরি করবার চেষ্টা করেছিলাম আমি। পারিনি। শেষ পর্যন্ত সুযোগটা তুমিই তুলে দিলে আমার হাতে। জীবন পণ ক'রে আমি গিয়েছিলাম সেদিন। নবাব-বংশের ছেলে, আমার রক্তে কাম প্রবল, জেদ প্রবল, ভালোবাসা প্রবল। চেয়ে পাবো না এ আমি জানি না, ইচ্ছে যেখানে প্রতিহত হয় সমুদ্র সেখানে উত্তাল হ'য়ে ওঠে আমার বুকে। মনে-মনে শেষে এই ভেবেছিলাম, তোমাকে যদি কখনো হাতের মুঠোয় পাই তোমাদের সব হিঁদুয়ানি আমি চেটেপুটে খেয়ে শেষ ক'রে দেবো। অপমানে, অসম্মানে, অত্যাচারে ক্ষতবিক্ষত ক'রে রাস্তায় ছেড়ে দেবো তোমাকে। একটা উল্টো প্রতিক্রিয়ায় আমি পাগলের মতো সব অন্যায় চিন্তা করেছি। ভালোবেসে আমি ব্যর্থতা বহন করবার শিক্ষা নিয়ে বড়ো হইনি। দুঃখ মহান, দুঃখ পবিত্র, এ-ধর্ম আমার নয়। দুঃখ আমার শত্রু এই আমি জানি, জানি ব'লেই এই লড়াই।' সিংহের মহিমায় তিনি হেঁটে গেলেন দরজার কাছে।

পা মুড়ে, মুখ নিচু ক'রে ছবির মতো ব'সে রইলো সুলেখা। কোনো কথাই তার কানে গেলো না।

ধীরে-ধীরে আবার ফিরে এলেন সুলতান-সাহেব, কাছে এসে দাঁড়ালেন, প্রায় রুদ্ধ স্বরে বললেন, 'তুমি কি সত্যিই চ'লে যেতে চাও?'

সুলেখা ছটফট ক'রে উঠলো, 'চাই না!'

'তাই তো! কেনই বা চাইবে না।' একটু চুপ ক'রে থেকে বললেন, 'কিন্তু কোথায় যাবে?'

'মা-র কাছে।'

'তোমার মা কোথায় আমি তো তা জানি না।'

'আপনিই তো তাদের পাঠিয়ে দিয়েছেন।'

'তা দিয়েছি। বাইরের খবর তুমি জানো না, একটা নরক। এ-শহর থেকে যাতে ওঁরা পালাতে পারেন, অতি কষ্টে সেটুকু ব্যবস্থাই করতে পেরেছি শুধু। হিন্দুস্থানের প্লেনে চড়িয়ে দিয়ে এসেছি, আর কিছু আমি জানি না।'

'তা হ'লে আমাকেও সে-ব্যবস্থা ক'রে দিন।'

'তোমাকে!'

'আপনার পায়ে পড়ি—'

'কিন্তু তারপর?'

'তারপরের দায়িত্ব তো আপনার নয়।'

সুলতান মস্ত একটা দীর্ঘশ্বাস ভাসিয়ে দিলেন বাতাসে, একটু হেসে বললেন, 'তোমার বিবেচনায় না-হ'তে পারে, আমার তো একটা কর্তব্য আছে। উদ্বেগটাকেই বা অস্বীকার করি কী ক'রে। না, না, তুমি যেয়ো না, তোমাকে এ-ভাবে আমি ছেড়ে দেবো না, দিতে পারি না।'

'তাই বলুন।' সুলেখার বিনীত ভঙ্গি কঠিন হ'লো, একটা ক্রূর হাসিতে ভ'রে গেলো মুখ।

'সুলেখা!' সুলতানের গলা কোমলতায় ভেজা।

'বলুন।'

'একটা কথা শুনবে?'

'কান যখন বধির নয়, শুনতেই হবে।'

'এদিকে তাকাও।'

'না।'

'একবার তাকাও।'

'না।'

'একবার তাকিয়ে তুমি ছাখো—'

'আপনার দেবতুর্লভ স্থন্দর মুখ তো আমি অনেকবার দেখেছি, স্থলতান-সাহেব।'

স্থলতান স'রে এসে আবার সোফায় বসলেন, স্মিতহাস্তে বললেন, 'আর-একবারও না-হয় ছাখো।'

'স্থন্দর মুখই যে স্থন্দর হৃদয়ের প্রতিবিম্ব নয়, সে-কথা বারবার স্মরণ করিয়ে দিয়ে কী লাভ আপনার ?' তুর্বলতা কাটিয়ে আবার ঋজু শরীরে কঠিন মুখ নিয়ে উঠে দাঁড়ালো স্থলেখা। আবার তার চোখে পুরোনো দিনের প্রতিহিংসার আগুন জ্বলতে লাগলো থরথর ক'রে।

কয়েকটা মুহূর্ত নিথর। নিঃঝুম। নবাববাড়ির দেয়াল-ঘেরা বিশাল মাঠের এক কোণে একটি গোল হল-ঘর যেন জাতুমন্ত্রে শিলীভূত হ'য়ে রইলো। বাইরের জমাট অন্ধকার ভিতরেও জ'মে উঠতে লাগলো। স্থলতান-সাহেব জানালা দিয়ে আকাশভরা তারার দিকে তাকালেন, তারপর স্থলেখার হিংস্র চোখে চোখ রেখে হাসলেন, 'কী ইচ্ছে করছে জানি। কিন্তু স্থলেখা, তোমার কাছে কি আমি কিছুই আশা করতে পারি না ?'

'কিসের আশা ?'

'বিশেষ কিছুই না, শুধু একটুখানি সৌজন্য, তা-ও কি এতোদিনে পাবার যোগ্যতা অর্জন করিনি আমি ?'

এমন একটা মজার কথা কে কবে শুনেছে ? হাসি পেলো স্থলেখার। যে-লোকটার পেশাই হচ্ছে মেয়ে চুরি করা আর মানুষ খুন করা, তার মুখে সৌজন্যের বুলি। স্থলেখা গুম হ'য়ে চুপ ক'রে রইলো, একটু আগে

নিজের দুর্বলতার কথা ভেবে ধিক্কার দিলো নিজেকে। এর কথায়ও বিশ্বাস করেছিলো সে!

'কথা বলছো না!' সুলতানের নরম গলা প্রায় কান্নার মতো সজল, 'আমাকে কি তুমি এখনো ক্ষমা করতে পারোনি?'

বাতুল! শ্যামল মুখ রক্তিম ক'রে সুলেখা বাইরের দরজার দিকে তাকালো। ভারি পরদায় আচ্ছন্ন। না, কোনোদিন আর সে-পরদা সরবে না তার জীবনে। আর সূর্য উঠবে না অন্ধকার ভেদ ক'রে। কেবল আশার ছলনা। মিথ্যাবাদী! নিষ্ঠুর! কপট! হীন! লম্পট! বাজে কথা ব'লে মন ভেজাতে এসেছে আমার। আমি যেন ওকে চিনি না, জানি না। দাঁতে দাঁত ঘ'ষে উদ্যত কোনো কঠিন কথাকে পিষ্ট ক'রে বললো, 'দাসীর সঙ্গে কি রহস্য করছেন নবাবজাদা? দাসী কি আপনার রহস্যের যোগ্য?'

'সুলেখা!'

'মহল তো আপনার একটাই নয়, ক্রীতদাসীর সংখ্যাও অদ্বিতীয় নয়—'

'সুলেখা, তুমি তো একজন মেয়ে—'

'সে-বিষয়ে কি কোনো সন্দেহ উপস্থিত হয়েছে?'

'তোমার কি মনে হয় না, এই যে দিনের পর দিন আমি কেবল অপেক্ষাই করছি, এটাই আমাকে বিশ্বাস করবার পক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ? লোকে যা-ই বলুক, সত্যিই আমি ততোটা অসৎচরিত্র নই, কিন্তু আমারও তো রক্তমাংসের শরীর আছে একটা। প্রত্যেক দিন এই নিঃঝুম রাত্রির নিরালা নিভৃতে একান্ত কাছে ব'সে এক মুহূর্তের ভুলেও যে তোমাকে আমি স্পর্শ করি না সেটা—'

'চুপ করুন। চুপ করুন।' অসহ্যবোধে কানে আঙুল দিলো সুলেখা। তারপর দৌড়ে চ'লে এলো এদিকে, এই দেয়ালের জানালায়। একেবারে

শক্ত হ'য়ে পিছন ফিরে ঘাড় বেঁকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো তেজি ঘোড়ার মতো। ইচ্ছে করলো জানালার লোহাগুলো উপড়ে ফেলে দেয় দৈব-শক্তিতে। হায় রে! মনের সঙ্গে শরীর যদি একটুও সহযোগিতা করতো!

চুপ ক'রে তাকিয়ে থাকতে-থাকতে একসময়ে উঠলেন সুলতান-সাহেব, দুটি হাত পিছনে রেখে একটু ভাবলেন, ব্যাকুল পদক্ষেপে ছুটে এলেন এদিকের দেয়ালে, কিন্তু না, ইচ্ছাকে সংযত করলেন তিনি, অর্ধেক এসেই থামলেন, একটু হাঁপালেন, তারপর আবার ফিরলেন। ধীরে-ধীরে হেঁটে এলেন দরজার কাছে, ধীরে-ধীরে মিলিয়ে গেলেন পরদার ও-পিঠে। দু-হাতে মুখ ঢেকে ব'সে পড়লো সুলেখা, ফুলে-ফুলে কান্না আসতে লাগলো তার। কতোদিন পরে আজ সে তার মায়ের কথা শুনেছে, ভাইদের কথা শুনেছে, দুঃখের পাষাণ গ'লে গেছে। আজ আর ধৈর্য বাঁধ মানে না।

এর পরে পর-পর তিন দিন সুলতান-সাহেব সুলেখার মহলে এলেন না। তাতে অবিশ্যি ইতরবিশেষ হ'লো না কিছু। সুলেখার দিন তেমনিই কাটতে লাগলো। তেমনিই বিস্বাদ। তেমনিই বিরস। তেমনিই রাতের পর দিন আর দিনের পর রাত। একই তারে বাঁধা। সকালের লাল সূর্য কমলা-রং রোদ হ'য়ে ধীরে-ধীরে দুপুরের আকাশে বিলীন হয়, দুপুরের খাঁখাঁ আকাশ গড়িয়ে-গড়িয়ে সন্ধ্যার ধূসরে মিশে যায়। রাত্রির নিঃসঙ্গতা তেমনি ঘন, তেমনি গাঢ়। তবু থেকে-থেকে সুলেখার বুকের ভিতরে একটা আশার বিদ্যুৎ চমকে ওঠে। বারে-বারে মনে হয় এই বুঝি দেখা দিলো আলো, বুঝি বা এজন্যেই ব্যস্ত আছেন সুলতান-সাহেব। হঠাৎ এসে খবর দেবেন সব ব্যবস্থা ঠিক।

ঘর মুছতে-মুছতে ছোটো বাঁদি বললো, বড়ো মহলে নাকি ভীষণ

বিপদ। সাহেরবানু বাঁকা ঠোঁটে হাসলো, 'কর্তার কি অখন পরানের ডর আছে! রাংতার চশমা চোখে দিছে যে। গোটা দুনিয়াটাই অখন তেনার কাছে বিলকুল রঙিন। পরশু রাইত তিনটার সময় কী কাণ্ড। আমি ত দেইখা-শুইনা ডরে মরি। প্রথমে কি বুজজি নাকি? খ্যাযে দেখি শতে-শতে মাথা। বাইরের থন সব আনাইছে যে দাঙ্গা করনের লেইগা, সেইগুলির কি আর নবাব-সুবাব জ্ঞান আছে? আইয়া কয় যে বাড়ির মইধ্যে কাফের লুকাইয়া থুইছ, আমরা দেখুম। শহরে গুজব রটছে হুজুর নাকি কবে বোরকা পরাইয়া নিজে মটর চালাইয়া কোন-এক হিন্দু পরিবারকে হাওয়াই জাহাজে তুইলা দিয়া আইছে—'

চকিত হ'লো সুলেখা, 'কী! কী গুজব রটেছে?'

কানের কাছে মুখ আনলো সাহেরবানু, 'গুজবটা বৈন উড়াইয়া দেওয়নের কথা না। এই সাহেরবানুর বুদ্ধি বড়ো ধার, চক্ষু মেকুরের মতো অন্দকারে জলে। লুকাইলে কী অইব, দুই চক্ষের কিরা আমি যদি সাচা কথা না কইয়া থাকি। কতো বড়ো ঢেকি-ঢেকি দুইটা ছাওয়ালরে কর্তা মাইয়ালোক সাজাইয়া কেমন বোরকা পরাইয়া দিলেন। যেন দুইটা তক্তা। হাইস্যা আর বাঁচি না। নিজের চক্ষে দেখলাম ঘুলঘুলি দিয়া চুপি মাইরা।'

'আর— আর কী দেখলে সাহেরবানু?'

'সব কি বৈন কওন যায়? খ্যাযে জবেদার কানে উঠুক, তখন মরি আর কি। গোপন খবর ছড়াইতাছি বইলা অমনে গিয়া কান-ফুসকুরি দিবো না! আর আমাগো নবাব-সাহেবও তো সেই পদেরই কান-পাৎলা। শোনন মাত্র আস্তা মাটিতে পুঁইতা থুইবো।'

নাস্তা নিয়ে গম্ভীর মুখে ঘরে ঢুকলো জবেদা, সঙ্গে-সঙ্গে প্রায় কেঁপে উঠে থেমে গেলো সাহেরবানু, ঢোঁক গিলে গলার স্বর বদলে বললো,

'এই তো, কইতে-কইতেই জবেদা-দিদি আমাগো নাস্তা লইয়া আইছে। খাও বৈন খাও, মুখখান এক্কেরে শুকাইয়া গেছে।' তাড়াতাড়ি উঠে এটা-ওটা নাড়তে লাগলো সে। জবেদা ছুটি দিলো তাকে। তারপর নাস্তা রেখে আস্তে দরজাটা ভেজিয়ে দিলো।

খাবার বাসনগুলো ঠেলে দিলো স্থলেখা, 'আমি খাবো না।'

'কেন?'

'আমার খিদে নেই।'

'খিদে তো তোমার বাছা কোনো দিনই থাকে না। তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও—' জবেদার মুখ আজ গম্ভীর, বিষণ্ন, চিন্তিত। চোখের ভারি পাতা দুটি যেন আরো ভারি হয়েছে, টলটলে চোখ আরো সজল।

একটু তাকিয়ে দেখলো স্থলেখা, জবেদা নত-মুখে রুপোর পট থেকে চা ঢেলে দিলো।

'শোনো,' চায়ের পেয়ালাটা স্থলেখার হাতে তুলে দিয়ে বললো, 'ক'দিন সাহেবের শরীর ভালো ছিলো না, তা ছাড়া নানারকম বিপদ-আপদেও উদ্‌ভ্রান্ত ছিলেন, তাই আসতে পারেননি। নিজের মহল থেকে এ-ক'দিন এক পা-ও নড়েননি। আজ এখুনি, আটটা সাড়ে-আটটার মধ্যে উনি একবার তোমার সঙ্গে দেখা করতে চান, তোমার কোনো অস্থবিধে হবে কিনা জিজ্ঞেস করেছেন।'

তিন দিন পরে মাত্র এই খবর! রাগে স্থলেখা টান হ'য়ে বসলো, 'বাধিত হলাম। কিন্তু আমার স্থবিধে-অস্থবিধের প্রতি তোমাদের নবাব-সাহেবের আবার এতো ভক্তি হ'লো কবে থেকে?'

জবেদা কঠিন চোখে তাকালো, 'বেইমানি কোরো না। তিনি তোমার কোনোই ক্ষতি করেননি।'

'ক্ষতি! ক্ষতি বলতে কতোখানি বোঝো? কতোটা ধারণায় আসে?'

'ছাখো, ঐ মানুষটাকে এই দুখানা হাতেই নেড়ে-চেড়ে আমি বড়ো করেছি, আর কিছু না-হোক, এটুকু অন্তত জানি, দিনে-রাত্রে অহরহ তুমি যার জীবননাশের চিন্তা করছো, সে একান্ত মনে তোমার ভালোটুকুই চেয়ে এসেছে। আর এটাও জানি, কারো কোনো মন্দ চিন্তা করবার মতো ছোটো দিল দিয়ে খোদা তাকে দুনিয়ায় পাঠাননি।' চাঁপার কুঁড়ির মতো আঙুল দুটি সে কপালে ছোঁয়ালো— 'নসিব, নসিব— সব নসিবের খেলা। নইলে এই দুর্মতি তার কেন হবে। কেন সে এমন ক'রে আপন সর্বনাশ আপনি ডেকে আনবে। কিসের অভাব ছিলো তার। কোন দিকে সে অযোগ্য। কী তার করতলগত ছিলো না এ-সংসারে।'

জবেদা স্নেহময়ী। জবেদা ধীর স্থির শান্ত। এ তিন মাসে সুলেখা তাকে অশান্ত হ'তে দেখেনি, উত্তেজিত হ'তে দেখেনি, কোনো কারণে এতোটুকু উঁচুতে উঠতে শোনেনি তার গলা। দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে নিয়ম ক'রে-ক'রে আরো চারজন পরিচারিকা থাকে বটে তার জন্য, কিন্তু জবেদা তার দিনরাতের। জবেদা সঙ্গী হ'য়ে থাকে, মা হ'য়ে থাকে, বন্ধু হ'য়ে থাকে। গল্প করে, সেলাই করে, ঘর গুছিয়ে দেয়। মন শান্ত করবার চেষ্টা করে নানা কথা ব'লে। চুল আঁচড়ে দেয়, তেল মাখিয়ে দেয়, স্নানে নিয়ে যায় গোসলখানায়। বলতে গেলে শিশুর মতো তাকে আগলে রাখে জবেদা। হয়তো বা ভালোওবাসে। আজকের এই উষ্ণতা তাই অবাক করলো সুলেখাকে। মুখের দিকে তাকিয়ে চুপ ক'রে রইলো সে।

জবেদাও চুপ করলো। তার সুর্মা-আঁকা বড়ো-বড়ো চোখের দৃষ্টি অপলক হ'লো সুলেখার মুখের উপর। এই বিশাল সবুজ-মহলের মাননীয়া অতিথিটির দিকে তাকিয়ে মনে পড়লো সাহেব ইঞ্জিনিয়র আনিয়ে সুলতানের আব্বাজান নবাব আখতার আমেদ যেদিন এ-বাড়ির নকশা আঁকালেন। উন্মনা ছেলেকে ঘরমুখো করবেন তিনি। শাদি দেবেন

ধুমধড়াক্কা ক'রে। পাঁচ মাইল জোড়া মিছিল বেরোবে। ঘোড়ার মিছিল, গাড়ির মিছিল, পদাতিকের মিছিল। সারা শহর সাজিয়ে দেবেন আলোক-মালায়। কাঙালিভোজন হবে এক মাস ধ'রে, এক মাস ধ'রে চলবে সেই উৎসব। এই নতুন মহলে উঠবে এসে নতুন মানুষ।

নবাববাড়িতে বহুদিন তেমন কোনো জৌলুসের উৎসব ঘটেনি, এবার তা পরিপূর্ণ মাত্রায় উসুল করতে হবে। আমির-ওমরাওর ঘরের সব গোলাপ-সুন্দরীদের সেরা সুন্দরীটিকে আনবেন ঘরে। অনেক বছর বিলেতে কাটিয়েছেন সুলতান, বিদেশিনীদের হার মানাতে পারে এমন রং না-আনলে চলবে কেন। দেশে-বিদেশে খোঁজ-খোঁজ রব উঠলো। শেষে ঘরের কোণে উত্তর-বাংলার নবাবের ঘরে পাওয়া গেলো উপযুক্ত পাত্রী। রূপগুণে সমতুল্য। নামেও জাহানারা, কাজেও জাহানারা। সুলতানের পাশে দাঁড়াবার যোগ্য বেগম। এ-বাড়ির বেগমরা কে-ই বা সুন্দরী নয়। সুলতানের মাকে অবিশ্যি জবেদা দেখেনি, কিন্তু শুনেছে, তিনি অলোক-সামান্যা রূপসী ছিলেন। সুলতানের নানি তো এই সেদিন মারা গেলেন, কী তাঁর রং ছিলো, তাকালে ঝলসে যায় চোখ। সুলতানের জন্যও যে তাই আসবে তা আর এমন বিচিত্র কী? কিন্তু একটু বিচিত্র হ'লো সকলকে হার মানাবার মতো রূপ নিয়ে হঠাৎ একদিন সশরীরে এসে হাজির হ'লো এই মেয়ে। উত্তর-বাংলার নবাব সপরিবারে বেড়াতে এসেছিলেন এ-শহরে, পূর্ব-বাংলার নবাবের নবাবোচিত আতিথেয়তার ত্রুটি হ'লো না, সেই সঙ্গে ছেলের বউও পছন্দ হ'য়ে গেলো। কে না পছন্দ করবে এই মেয়েকে? এতো রূপ কে কবে দেখেছে? আলোর মতো মানুষ। এলিয়ে বসেছিলো বাগানে, মাথায় স্বচ্ছ ওড়নার আবরণ, তার তলায় মুখখানা যেন এক টুকরো চাঁদ। জাফরান রঙের ঢোলা পাজামার উপরে চুমকিদার জামা, নিচের দিকে জরির চটি-পরা ছোট্টো দুখানা

খোলা পা। পাশে পাথরের বাসনে আপেল, নাশপাতি, নারেঙ্গি। সুলতানের আব্বাজান দেখে এসে এই বর্ণনা দিয়েছিলেন জবেদার কাছে। বলেছিলেন, 'ছেলে এবার আর না বলতে পারবে না।'

তখনই জবেদা বলেছিলো, 'বিয়ে ক'রে ছেলে তার সুন্দরী স্ত্রী নিয়ে মধুবাসর কোথায় যাপন করবে? সব কর্তাদেরই তো আলাদা মহল আছে, ওর জন্যেও হোক। নতুন মানুষ এসে নতুন বাড়িতে উঠুক।'

আমেদ-সাহেব একটু হেসেছিলেন, জবেদার দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে নরম গলায় বলেছিলেন, 'আমি জানি সুলতানের আম্মা বেঁচে থাকলেও ছেলের জন্য ঠিক এই আবদারই তুলতেন।'

এ-কথায় বড়ো শরম লেগেছিলো জবেদার। এ-কথা বলবার সময় সুলতানের বাবার গলায় আবেগ ছিলো, স্নেহ ছিলো, মমতা ছিলো। আর ছিলো এই অযোগ্য হতভাগিনী জবেদাকে একটা মর্যাদা দেবার বিশেষ ভঙ্গি। মুখ নিচু ক'রে দাঁড়িয়ে ছিলো জবেদা।

একটু পরে আমেদ-সাহেব আবার বললেন, 'জবেদা, ছেলেকে তুমিই মানুষ করেছো, তোমারই সকলের চেয়ে বড়ো অধিকার। তোমার সাধ-আহ্লাদ আমি সবই মেটাতে চেষ্টা করবো। যা তুমি চাও, যে-রকম তোমার শখ, সব তেমন ক'রেই হবে।'

আর তারপরেই নবাববাড়ির বিশাল মাঠের এই ঝাউ আর ইয়ু-কেলিপটাসের লম্বা-লম্বা ছায়া-ঘেরা কোণটিতে গ'ড়ে উঠলো এই মর্মর-প্রাসাদ। সুলতানের বাসরঘর।

কিন্তু হ'লো না। কিছুই হ'লো না। রাজি হ'য়েও বিগড়ে গেলো ছেলে। মাঝখান থেকে অকারণে রঙিন কাচে ঘেরা এই দামি মহলটি তৈরি করার খাতে বৃষ্টির মতো ঝ'রে গেলো হাজার-হাজার টাকা। নবাবরা ব্যয়সংকোচ করতে জানেন না, বিলাসিতায় কার্পণ্য করা

তাঁদের বংশের ধারা নয়। দরাজ হাতে খরচ করেছিলেন আখতার আমেদ। নানা দেশ থেকে নানারকম জিনিস সংগ্রহ করেছিলেন মহলটিকে সর্বাঙ্গসুন্দর ক'রে তুলতে। কাঠের কাজ করবার জন্য সব চীনে মিস্ত্রিরা এসেছিলো, মারবেল এসেছিলো ইটালি থেকে, আয়না এসেছিলো বেলজিয়ম থেকে ; ঢাকাই ওস্তাগররা কতো মাথা খাটিয়ে তৈরি করেছিলো এর ছাতার মতো ছাদ আর তলায় আধতলা-সমান সব কলসি-পিলার বসিয়ে এর উঁচু ভিত। বাগান সাজাতে জাপানি বিশারদ পর্যন্ত আনানো হয়েছিলো। বাড়ি তো নয়, একখানা আঁকা ছবি। আর তার ভেতরে আসবাবপত্রেরই বা কী বাহার।

ঐ পর্যন্তই। দিনের পর দিন শুধু সেজে-গুজে নিঃসঙ্গ শূন্যকক্ষ হ'য়েই দাঁড়িয়ে রইলো সবুজ-মহল। দাঁড়ে আর পাখি বসলো না। কারো স্পর্শে ধন্য হ'লো না তার মারবেল পাথরের মসৃণ মেঝে। কারো সুমিষ্ট হাস্য-ধ্বনিতে মুখর হ'লো না ফ্রেসকো-আঁকা রঙিন দেয়াল। অতি যত্নে তৈরি স্নানশালার পরি-মুখী ফোয়ারা থেকে এতোদিন বৃথাই গোলাপগন্ধ জল উৎক্ষিপ্ত হ'লো। তার মর্মরখচিত শিলাসনে ব'সে কেউ তার ননীর মতো পা দুখানি ছড়িয়ে দিলো না উদাস আলস্যে, স্নানের আগে আঙুরগুচ্ছের মতো চুল খুলে দিয়ে কেউ আপন মনে আপন সুখে গজল গেয়ে উঠলো না।

সুলতান বললেন, 'ঘর চাবি-বন্ধ ক'রে রাখো।'

জবেদা বলেছিলো, 'তুমি নিজে থাকো না এখানে।'

সুলতান হেসেছিলেন। বলেছিলেন, 'থাকবার মতো সঙ্গী কই।'

'সে তো তোমার ইচ্ছার অধীন বাপজান।'

'ইচ্ছা! আমার ইচ্ছার কি ততো শক্তি? তুমি ভেবো না, উপযুক্ত মানুষ এলে নিজেই আমি তালা খুলে দেবো।'

এই কি তার উপযুক্ত মানুষ ? এরই জন্য শেষে তালা খুললো সে ? আর শেষে এরই জন্যে আজ প্রত্যেক মুহূর্তে তার জীবন-সংশয় ?

দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো জবেদা। টেবিল থেকে খাবার বাসনগুলো সরিয়ে রাখলো, টুকটাক গুছিয়ে দিলো একটু, টান বিছানাটা আরো একটু টান করলো। সুলতান আসবেন, তারই জন্য সামান্য প্রস্তুতি। সুলেখার বাসি চুলে চিরুনি বুলোতে-বুলোতে বললো, 'তোমার বাবাকে আমি দেখেছি।' হঠাৎ বললো কথাটা, মনে প'ড়ে গেলো হঠাৎ।

'আমার বাবাকে ?' সাগ্রহে ঘুরে বসলো সুলেখা।

'খুব কম এসেছেন। তোমার দাদুর কোনো চিঠি কি খবর, এই ধরনের কোনো কাজেই হয়তো একবার কি দু-বার এসেছিলেন, কিন্তু তাঁকে মনে আছে আমার। বুড়ো নবাব আদর ক'রে নিজের অন্দরে নিয়ে এসেছিলেন, বুড়ি নানি তাঁকে বাপজান ব'লে সম্বোধন করেছিলেন, আর আমি ফল সাজিয়ে দিয়েছিলাম।'

'তারপর ?'

'সুলতানকে বোধ হয় ভালোবাসতেন খুব। এসেই তাঁর খোঁজ করলেন, কাছে ডেকে বসালেন, আদর করলেন—'

'তাঁর চেহারা মনে আছে তোমার ?'

'স্পষ্ট। এই তো সেদিনের কথা। তারপর হঠাৎ একদিন খবর পেলাম মারা গেছেন। নানির কোলে মুখ গুঁজে কেঁদেছিলো সুলতান। আলি-সাহেবও মারা গেছেন তার আগে, হয়তো সে-দুঃখটাই মনে প'ড়ে গিয়েছিলো। সুলতানের আব্বাজান তৎক্ষণাৎ দু-শো টাকার ভেট পাঠিয়ে দিলেন তোমাদের বাড়ি, পরের দিন নিজে গিয়ে নগদ টাকাও দিয়ে এলেন তোমার জ্যাঠামশায়ের কাছে।'

'টাকা!'

'তোমার জানবার কথা নয়, তুমি তখন ছোটো। তোমার মা নিশ্চয়ই জানেন। তাঁর জন্যেই দিয়েছিলেন। আমেদ-সাহেব সেদিন স্থলতানকেও সঙ্গে ক'রে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন, গেলো না সে। আমি জানতাম সে যাবে না। আমি জানতাম তার বালক বয়সের এমন কোনো দুঃস্বপ্ন আছে তোমাদের হিন্দু-বাড়ি সম্বন্ধে— ভবিষ্যৎ জীবনে যে-স্মৃতি তাকে অনেক যন্ত্রণার পাথরে নিয়ে গেছে। তাকে তোমরা অপমান করেছিলে। তার সেই বেদনা-ভরা মুখ আমি কোনোদিন ভুলবো না।'

'অপমান!'

'মনে ক'রে ত্মাখো তো, এমন কী ঘটনা ঘটেছিলো যার জন্য বাড়ি ফিরে এসে সে অমন পাগলের মতো লুটিয়ে প'ড়ে কেঁদেছিলো। আমি গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "কাঁদো কেন বাপ?" কিচ্ছু বললো না, মুখ তুললো না, খেলো না সেদিন। রাত্তিরে তখনো তার ঘরে, তার পাশের খাটে শুতাম আমি। নইলে সে ঘুমুতে পারতো না, ভয় পেতো। অনেক রাত্তিরে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে বললো, "আমি কি কুত্তা, আমি ঘরে গেলেই সব নোংরা হ'য়ে যাবে, সব ফেলে দিতে হবে?" আর কেউ না-বুঝুক মায়ের কলিজা দিয়ে আমি তার দুঃখ বুঝেছিলাম। ঘটনাটাও আন্দাজ করতে পেরেছিলাম।'

স্থলেখা চোখ নামালো, হয়তো ঝাপসা ছবিটা মনে পড়লো তার।

'তা হ'লে ভেবে ত্মাখো তো, সেই দশ বছরের বালকের মনে যে-যন্ত্রণার আগুন তোমরা জালিয়েছিলে, তার ফল তুমি কতোটুকু ভোগ করছো? সেই বাড়ির মেয়ে তুমি, আশ্চর্য! তোমার জন্যই আবার পাগল হ'লো সে। শাদি করলো না, সংসার পাতলো না, সকলের মনে দাগা দিয়ে কিভাবে সে নষ্ট করলো জীবনটা। তার বাপ কতো দুঃখ নিয়ে মারা

গেলেন, সকলের মনের সব আশা-আনন্দ ভেঙে দিলো সে। আর এই বাড়ি— থাক সে-সব।'

একটু থামলো জবেদা। 'ওর বাপকে নিশ্চয়ই দেখেছো, সেবার কী না করলেন তিনি দাঙ্গা থামাবার জন্য। ইংরেজরা তলায়-তলায় বিষ ঢালে আর আমেদ-সাহেব রুখে-রুখে সভা ডাকেন। বুড়ো নবাবও ছিলেন তখন, পীস-কমিটি করলেন তিনি। সবই তো দেখেছি, সবই তো জানি। আর আজকের নবাব, কাজি স্থলতান আমেদ—'

পরদা সরিয়ে মমতাজ ঘরে এলো অসময়ে, ব্যস্ত গলায় বললো, 'নবাব আসছেন, তুমি বাইরে এসো জবেদাদিদি।'

'অ্যাঁ।' ফিরে তাকালো জবেদা, তারপর হঠাৎ আতঙ্কগ্রস্তের মতো স্থলেখার হাত দুটো চেপে ধ'রে ব্যাকুল হ'য়ে বললো, 'তুমি দয়া করো, তুমি তাকে বাঁচাও এই বিপদ থেকে, তার জ্ঞান নেই, বুদ্ধি নেই, ভালো-বাসায় উন্মাদ হ'য়ে গেছে সে। নিজের জীবনের উপর আর এতোটুকু মমতা নেই তার— আমি বলছি তার জীবন আজ বড়ো বিপন্ন—'

হাত ছাড়িয়ে নিলো স্থলেখা, প্রস্তুত হ'য়ে দাঁড়ালো।

সংযত হ'য়ে জবেদাও পিছিয়ে দাঁড়ালো কয়েক পা, দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে চাপা উত্তেজিত গলায় ফিশফিশ করলো, 'এর জন্যে কাঁদতে হবে তোমাকে। আমি বলছি কাঁদতে হবে।'

॥ চার ॥

স্বভাবোচিত বিশিষ্ট ভঙ্গিতে ধীরে-ধীরে ঘরে ঢুকলেন স্থলতান। দিনের আলোয় দু-জনই দু-জনের কাছে এই প্রথম মুখোমুখি হ'লো। বেশভূষায় আজ দু-জনেই অপ্রস্তুত, অগোছালো। কয়েকটা মুহূর্ত নিঃশব্দে গড়িয়ে

গেলো। সুলেখার দিকে তাকিয়ে সুলতান-সাহেব আস্তে বললেন, 'বিরক্ত করলাম ?'

'না।'

'কী করছিলে ?'

'কিছু না।'

'সারা দিন তুমি কী করো, সুলেখা ?'

'হিসেব রাখিনি, বলেন তো লিখে রাখবো।'

সুলতান হাসলেন। 'আজকের সকালটা খুব সুন্দর, না ?'

'বোধ হয়।'

'তোমার ঘরটা আলোয় ভ'রে গেছে, চমৎকার রোদ এসেছে।'

'আমার ঘর নয়, আপনার।'

'আমি তো কোনোদিন থাকিনি এ-ঘরে, এ-ঘরে আমার এই প্রথম সকাল।'

'আর-কোনো জরুরি কথা আছে কি ?'

'ছিলো, কিন্তু এই মুহূর্তে বলতে ইচ্ছে করছে না।'

'আপনার মর্জি।'

'সুলেখা।'

'বলুন।'

'এ তিন দিন তুমি খুব শান্তিতে ছিলে, না ?'

সুলেখা জবাব দিলো না।

'আশা করি ভালো আছো ?'

সুলেখা চুপ।

'বসতে পারি ?'

'নিশ্চয়ই।'

'যে-কথা বলতে এসেছিলাম, তা হ'লে সে-কথাটাই শোনো।'

'বলুন।'

'দাঁড়িয়েই থাকবে?'

'ঠিক আছি।'

'যদি বলি আজ সমস্ত দিন আমি এখানে থাকবো, কী করবে?'

'আপনি যা বলবেন।'

'তা হ'লে বোসো। দাঁড়িয়ে থাকার একটা বিশেষ অর্থ আছে জানো তো? ওটা অতিথিকে বিদায় দেবার একটা ভঙ্গি।'

'আপনি তো অতিথি নন।'

'কী তবে?'

'আপনি গৃহস্বামী। আপনিই এ-বাড়ির প্রভু।'

'বাড়ি তো তোমার।'

'আমার?'

'তোমার আগে এই নতুন মহলে আর কেউ বাস করেনি, আমিও না। তোমার পরেও নিশ্চয় কেউ করবে না।'

'আপনার বিনয় আপনারই যোগ্য।'

'বিনয় নয় সুলেখা, বিনয় নয়। এ আমার একান্ত সত্য। কেন তুমি কোনো কথা বোঝো না।' বলতে-বলতে ঈষৎ উত্তেজিত হ'য়ে পড়লেন সুলতান-সাহেব, তক্ষুনি শান্ত হলেন। সহাস্যে বললেন, 'সব সময়েই আমার উপর তুমি রেগে থাকো। কেন?'

'না, রাগ কিসের।'

'ভেবো না, আর মাত্র কয়েকটা ঘণ্টা, তারপরেই তোমার সকল দুঃখের অবসান হবে।'

সুলেখা চকিতে তাকালো একবার।

'সব খবরই সংগ্রহ ক'রে এনেছি, আর সে-খবর দেবার জন্যেই অসময়ে বিরক্ত করতে এলাম তোমাকে।'

'খবর! কী খবর?'

'তোমার মায়ের খবর।'

'মা!'

'তুমি কি সত্যিই সুখী হও, যদি আজই তোমাকে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করি।'

'আজ?' সুলেখার দুই চোখে তারা ফুটে উঠলো।

সোফার উপর ন'ড়ে-চ'ড়ে বসলেন সুলতান-সাহেব, বাইরের দিকে তাকিয়ে নিজের মধ্যেই নিজে নিমগ্ন হ'য়ে রইলেন। চড়া রোদের একটা মোটা অংশ জানালা দিয়ে ঘরে এসে লুটিয়েছে, মাথায় মুখে কাঁধে এলিয়ে আছে তার তাপ। কপালটা ঘেমে উঠলো। অন্যমনস্কভাবে হাতটা বাড়ালেন তিনি, জানালার দিকে পৌঁছলো না। কী ভেবে সুলেখা এগিয়ে এসে বন্ধ ক'রে দিলো পাট দুটো।

'অনেক ধন্যবাদ।' মস্ত রুমাল দিয়ে মুখ মুছলেন সুলতান-সাহেব। হাসলেন একটু, 'এতো দয়া আমি আশা করিনি। যাক গে, শোনো, কলকাতা লোক পাঠিয়েছিলাম।'

আশায় উদ্গ্রীব হ'য়ে সুলেখা বললো, 'কেন?'

'তোমার মায়ের খোঁজ আনবার জন্য।'

'পাওয়া গেলো?'

'হ্যাঁ। ওঁরা বেশ ভালোভাবেই পৌঁছেছিলেন, ভালোও আছেন। তোমার কোনো আত্মীয়, কী যেন নাম—' সুলতান-সাহেব পকেটে হাত দিয়ে এক টুকরো কাগজ বার করলেন, 'ত্যাখো তো চেনো নাকি। এই ভদ্রলোকের বাড়িতে ওঁরা আছেন।'

থরোথরো আঙুলে হাত বাড়িয়ে কাগজের টুকরোটা নিয়ে চোখের কাছে ধ'রে রইলো স্থলেখা, কতোক্ষণ পর্যন্ত একটা কথা বেরুলো না গলা দিয়ে, রুদ্ধস্বরে বললো, 'হ্যাঁ, চিনি। খুব চিনি। আমার দাদামশাই। আমার মায়ের কাকা—'

একটু চুপচাপ।

'তা হ'লে যাবে ?'

'দয়া ক'রে—'

'উহ্—' বাঁ হাতের সঞ্চালনে স্থলতান-সাহেব থামিয়ে দিলেন স্থলেখাকে, 'ও-শব্দটা আর উচ্চারণ কোরো না, বড়ো মেকি শোনায়।'

চুপ করলো স্থলেখা।

'আসলে যাবার অনেক অস্থবিধে আছে।'

'কী অস্থবিধে ?'

'এই মুহূর্তে আমার পক্ষে যাওয়াটা হয়তো—'

'আপনি কি আমার সঙ্গে যাবার কথা ভাবছেন ?'

'তুমি কি একা যাবার কথা ভাবছো ?'

'তা ছাড়া কী ?'

'পাগল !'

'আমার কোনো ভয় নেই, আমি ঠিক চ'লে যেতে পারবো।'

'আমি যেতে দিতে পারবো না স্থলেখা।'

'তাই বলুন।'

'আমার সব তুমি কেড়ে নিতে পারো, ভাবনাটা তো পারো না।'

'ওটা ছল।'

'হয়তো।'

'আমি মূঢ়ের মতো আপনার কথায় বিশ্বাস করেছিলাম।'

'হয়তো।'

হনহন ক'রে স্থলেখা ঘরের এই প্রান্ত থেকে ঐ প্রান্তে চ'লে গেলো।

'শোনো।'

'বলবার কথা আপনার কখনোই শেষ হবে না; কিন্তু শোনবার ধৈর্যটা আমার অসীম নয়।'

'রাগ কোরো না, এটা রাগের সময় নয়। তুমি জানো না—'

'থাক, থাক—'

'আমি সত্যি বলছি এখন আমার যাওয়াটা যদি নেহাৎই—'

স্থলেখা দু-হাতে কান চেপে ধ'রে মাথা ঝাঁকালো।

সেদিকে তাকিয়ে মেঘ ছেয়ে এলো স্থলতানের চোখে। চুপ ক'রে থেকে বললেন, 'ঠিক আছে, আমি আজই নিয়ে যাবো তোমাকে। পারলে এই মুহূর্তেই রওনা হতাম কিন্তু দিনের বেলা কোনোরকমেই সম্ভব নয়। আর কয়েকটা ঘণ্টা তুমি ধৈর্য ধ'রে থাকো স্থলেখা।' স্থলতান-সাহেব দীর্ঘশ্বাস চাপলেন।

স্থলেখার চোখ দুটো বড়ো-বড়ো হ'য়ে উঠলো, 'আজ! আজ রাত্তিরে? সত্যি?'

'সত্যি। সত্যিই এতোদিনে তোমার দুঃখের অবসান হবে।'

'স্থলতান-সাহেব, কী ব'লে আপনাকে কৃতজ্ঞতা জানাবো।'

'কৃতজ্ঞতা? বটে!'

'আমি অনেক সময় অনেক কঠিন কথা বলেছি—'

'আল্লার মর্জি, যার যা পাওনা থাকে—' স্থলতান-সাহেব উঠে দাঁড়ালেন, 'আর কয়েক ঘণ্টা মাত্র আমার সবুজ-মহল আলো ক'রে আছো তুমি। অনেক কষ্ট পেলে। যতো রাগই থাক, হয়তো কোনো-একদিন

ক্ষমা করতে পারবে। যাক গে, অসময়ে আর তোমাকে বিরক্ত করবো না—' এক পা এগুলেন তিনি।

স্থলেখাও এক পা এগুলো, 'তা হ'লে—'

'প্রস্তুত থেকো সন্ধ্যাবেলা, যে-কোনো সময়ে ডেকে নেবো।'

'এখুনি যাচ্ছেন?'

'আর কী, কথা তো ফুরিয়ে গেলো।'

'কেন, বসুন না।' একটুখানি হাসলো স্থলেখা।

তার হাসিমুখের দিকে তাকিয়ে স্থলতান-সাহেব অভিভূত হলেন। চোখ নামিয়ে নিয়ে চুপ ক'রে দাঁড়ালেন একটু।

এই মুহূর্তে মেজাজ বদলে গেছে স্থলেখার। স্থলতানের উসকোখুসকো উদ্‌ভ্রান্ত চেহারার দিকে তাকিয়ে কেমন একটু মমতাই বোধ করলো মনে-মনে। নরম গলায় আলাপ করলো একটু, 'শুনলাম, কী সব গোলমাল হচ্ছে—'

'তা হচ্ছে।'

'আশা করি এবার মিটে যাবে সব।'

'আশা করি।'

'আমি গেলে আপনার সব বিপদ কেটে যাবে।'

'আমার বিপদ কাটুক এটা তুমি কখন থেকে চাইছো?'

'আমি আপনার অমঙ্গল চাই না।'

'এতো বড়ো মিথ্যেটা এতো অনায়াসে উচ্চারণ করলে?'

'মিথ্যে নয়।'

'নয়?'

'যখন মিথ্যে ছিলো তখন উচ্চারণ করিনি। আজ আমি কৃতজ্ঞ।'

'আবার কৃতজ্ঞতা! ভালো।' স্থলতান-সাহেবের চোখের কোলটা

হাসির আভায় টোল খেলো, হেঁটে চ'লে গেলেন দরজার কাছে, শাদা পরিপুষ্ট আঙুল ক'টি গভীর নীল পরদার উপর আলতোভাবে ছুঁইয়ে রেখে ফিরে দাঁড়ালেন, 'তোমার জগৎটা দেখছি ধন্যবাদে আর কৃতজ্ঞতায় ঠাসা। ও-সব জঞ্জাল একটু সরিয়ে ফেলো না, আর-একটু গভীরে ছাখো না তাকিয়ে।'

'তা হ'লে সন্ধ্যাবেলা—' অস্থির গলা সুলেখার।

বেদনার্দ্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে সুলতান-সাহেব যেন সস্নেহে লেহন করলেন সুলেখার মাথা, মুখ, চোখের বড়ো-বড়ো পল্লব। তারপর বেরিয়ে যেতে-যেতে অস্ফুটে বললেন, 'হ্যাঁ, সন্ধ্যাবেলা।'

মোটা পরদাটা অল্প একটু নড়লো। আবার ঝুলে রইলো স্থির হ'য়ে। সুলতানের পায়ের মৃদু শব্দ মিলিয়ে গেলো ধীরে-ধীরে। ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে রইলো সুলেখা। অনুমান করতে চেষ্টা করলো সুলতান-সাহেব এখনো আধতলা-সমান-উঁচু সিঁড়িগুলো নামছেন অথবা নেমে লাল-সুরকি-ঢালা রাস্তায় পড়েছেন। এখন কোথায় যাবেন? আসান মঞ্জিলে! সেই ফরাশ-ঢালা নিজের বৈঠকখানায়! এখানকার এই বিস্তীর্ণ মাঠে সবসুদ্ধ ওঁদের ক'টা বাড়ি? কোন বাড়িটায় ইনি থাকেন? কোন ঘরে? সে-ঘর কেমন? লোকটি তো বিয়ে করেননি, মা-ও নেই, কে আছে? জবেদা? জবেদা-দাসী? জবেদা-দাসীই কি ওঁর একমাত্র ভাববার জন? তাই তো মনে হয়। দাসী কে বলে তাকে, মায়ের চেয়েও বাড়া। এখন গিয়ে কী করবেন সুলতান-সাহেব? তার যাওয়া বিষয়ে পরামর্শ করবেন কারো সঙ্গে? কার সঙ্গে? সে-ও কি ঐ জবেদা? স্ত্রী না-হয় না-ই রইলো, তা ব'লে কি আর স্ত্রীলোকও নেই? নেই আবার! নিশ্চয়ই আছে। কোথায় আছে? তাকে কোথায়

রেখেছেন? এইরকম আরো একটি সবুজ-মহল আছে হয়তো, হয়তো তাকেও বলেছেন সেই মহলে সে-ই প্রথম, সে-ই শেষ। একই কথা এঁরা কতোবার কতোজনকে বলেন নিজেরাই কি জানেন? তা হোক, আজ আর সুলতানকে কোনো কারণেই কোনো দোষ দেবে না স্বলেখা। তার এতোদিনের বসবাসে সত্যিই তো মানুষটি তার কোনো ক্ষতি করেননি, তার জন্য ভালো ছাড়া মন্দ ভাবেননি, এমনকি তার মাকে আর ভাইদের—

এক তোড়া টকটকে গোলাপ নিয়ে ছোটো বাঁদি ঘরে ঢুকলো। সেদিকে তাকিয়ে খুশি হ'য়ে উঠলো স্বলেখা। কী স্বন্দর ফুল! আর কতো! এতো গোলাপ একসঙ্গে শুধু নবাববাড়ির বাগানেই সম্ভব। তার খুশি দেখে ছোটো বাঁদি অবাক হ'লো।

জবেদাও অবাক হ'লো বৈকি। আজ স্বলেখা স্নান করলো ভালো ক'রে, খেলো ভালো ক'রে, খেয়ে উঠে গল্প করলো পর্যন্ত। রোজকার মতো শক্ত হ'য়ে মেঝেতে ব'সেই দিন কাটালো না, প্রসন্ন চিত্তে আরাম ক'রে গড়িয়ে নিলো বিছানায়। একটুখানি ঘুমিয়েও নিলো। যখন উঠলো, অপরাহ্ণ নেমেছে। বেলাটা অনুভব করবার জন্য মাথার কাছের জানালাটা দিয়ে তাকালো বাইরে, তাকিয়েই আর চোখ ফিরলো না তার। বাগান-ভরা অজস্র ফুলের সম্ভার, অজস্র রঙের ধাঁধা। তার সঙ্গে প্রজাপতির রং মিলেছে। লাল নীল বেগনি সবুজ হলুদ গোলাপি— রং, রং আর রং। যতোদূর চোখ চলে শুধু রঙের বাহার, রঙের ঢেউ। কী আশ্চর্য! এই বাগান এতোদিন সে দেখেনি? বাগান-ঘেরা এই বাড়ির শোভা এতো-দিন চোখে পড়েনি তার? অথচ এই বাগানের কতো নাম শহরে। রাস্তা দিয়ে যেতে-যেতে দেয়ালের ফোকরে চোখ ঢুকিয়ে লোকেরা এই বাগান দেখতে চেষ্টা করে। জানালার আধ-ভেজানো পাট দুটো ভালো

ক'রে খুলে দিয়ে তাকালো স্থলেখা। ঘোরানো গোল বারান্দার কোণে-কোণে পাতাবাহারের ঝাড়। এমন বাহারের পাতাই কি কোনোদিন দেখেছে কেউ ? জল দেয়া শুরু হয়েছে, সোঁদা-সোঁদা গন্ধ উঠছে সারা দিনের তাতানো মাটির বুক থেকে। ফুল-পাতা ভিজে টুপটুপ। আড়মোড়া ভেঙে খাট থেকে নামলো সে। এক-বিঘৎ-উঁচু পারস্য-গালিচার নরমে ডুবে গেলো পা। কী কোমল! কী সুখস্পর্শ! দেখতেই বা কী সুন্দর! গালিচাটাও কি আজ সে নতুন দেখলো নাকি ? ধীরে-ধীরে ঘরের সমস্ত কিছুর দিকেই নজর পড়লো তার। চিরদিন শুনে এসেছে নবাবগঞ্জের নবাবরা নবাবই বটে। বিলাসিতায় তাদের জুড়ি নেই। তারা সভ্য, শিক্ষিত, রুচিবান। দেশবিদেশের সব মূল্যবান সংগ্রহ আছে তাদের প্রাসাদে। তাদের থাকা-খাওয়া রীতিনীতির মধ্যে সব দেশের সংমিশ্রণ। যেখানকার যা ভালো, সব তারা নিয়েছে। হয়তো সত্য কথাই। সত্যই হয়তো নবাবগঞ্জের নবাববাড়ি একটা দেখবার মতো ব্যাপার। কতো বিদেশী ভ্রমণকারী আসে এখানে, শুধু এই বাড়িটা দেখতেই আসে। কতো প্রশংসা করে, কাগজে ছবি বেরোয়। কিন্তু নবাবগঞ্জবাসীরা বোধ হয় কোনোদিন কোনো কৌতূহল বোধ করে না। এতো কাছে ব'লেই কি করে না ? আপন মনে হয় ব'লেই কি করে না ? কে জানে। এ-বাড়িতে ঢুকতে গেলে অনুমতি লাগে, পরিচয়পত্র লাগে। ঠিক জনসাধারণের অধিগম্য নয় এ-বাড়ি। তাই জনসাধারণের হয়তো উৎসাহ নেই। কেবল বাইরের দিকের ছোট্টো চিড়িয়াখানাটায়, যেখানে অবাধ স্বাধীনতা সেখানেই ভিড় করে। তার নিজের কি কোনোদিন কৌতূহল ছিলো ? খুব ছোটোবেলায়, যখন সে এই স্থলেখা ছিলো না, যখন বালক সুলতান এই সুলতান আমেদে পরিণত হয়নি, হয়তো তখন ছিলো। তারপর সেই কৌতূহলই একমাত্র সুলতান আমেদের বুকের রক্ত দেখার ইচ্ছায়

সন্নিবিষ্ট হয়েছিলো। ঠোঁটের কোণ আপনা থেকেই হাসিতে বেঁকলো সুলেখার। মনে হ'লো সব যেন পূর্বজন্মের কথা। এ-জন্মের কথা শুধু আজ সন্ধ্যাবেলা কলকাতা যাওয়া।

দাদু বেঁচে থাকতে ঠাকুমা কিন্তু অনেকবার বলেছেন, 'নবাববাড়ি দেখাবে না ? শুনেছি ওদের ওখানে গজদন্তের পাটি আছে, শীতলপাটির দোতলা বাড়ি আছে, খড়ে-ছাওয়া ময়ূর-বেড়ানো কুটির আছে, কৃত্রিম হ্রদ, ঝরনা, ইন্দ্রপুরীতুল্য সব মহল, মণিমুক্তাখচিত সিংহাসন, আরো কতো কী।'

সুলেখাকে যেটা সবচেয়ে বেশি আকর্ষণ করতো সেটা ওদের ঝিনুকে-ভরা এগারো হাত শাড়ি।

দাদু বলতেন, 'কিসের। যতো সব বাজে কথা।'

ঠাকুমা বলতেন, 'তোমার তো কেবল না নিয়ে যাবার অছিলা। এই নেই, ওই নেই, সেই নেই। যদি কিছুই নেই তবে দেশ-দেশান্তর থেকে লোকগুলো কি ভেরেণ্ডা ভাজতে আসে ?'

দাদু হাসতেন, মাথা নাড়তেন, খ্যাপাতেন। শেষে বলতেন, 'দেখাবো, দেখাবো, সবই দেখাবো। আমিও পালিয়ে যাচ্ছি না, নবাববাড়িও পালিয়ে যাচ্ছে না। গজদন্তের পাটি, শীতলপাটির দোতলা, ঝিনুকে-ভরা এগারো হাত কাপড় কিছুই বাকি রাখবো না দেখাতে।'

মুখ বেঁকিয়েছেন ঠাকুমা, 'এ তো সেই সত্যিকাল থেকেই শুনছি।'

'আমরা কি টুরিস্ট ?' দাদুর চোখে অবজ্ঞা ঝ'রে পড়েছে, 'আমরা এই শহরেরই মানুষ, আমাদেরই জিনিস, দেখলেই হ'লো একদিন। অতো আদেখলেপনায় আমাদের দরকার কী ?'

সেই কথাটাই কায়েমি হ'য়ে থেকেছে দিনের পর দিন, বছরের পর

বছর। যেহেতু আমরা একই শহরের মানুষ, যেহেতু এই নবাববাড়িকে আমরা একাত্ম বোধ করি, আর যেহেতু যখন খুশি তখন যেতে পারি সেজন্যেই আর কোনোদিন দেখা হ'য়ে ওঠেনি। ঠাকুমাও দেখেননি, জ্যাঠাইমাও দেখেননি, মা-ও দেখেননি, সে-ও দেখেনি। দাদুই কি দেখেছেন? শত-সহস্রবার কতো কারণে তাঁকে ঢুকতে হয়েছে নবাব-বাড়ির ফটকের মধ্যে, ঐ পর্যন্তই, দেখেননি কিছু।

তারপর এই নতুন হল-ঘর। কারুকার্যখচিত এই ঘরটিরও অনেক খ্যাতি শুনেছে সুলেখা। এই শহরের সবাই শুনেছে। সবাই জানতো বড়ো ধুমধড়াক্কা ক'রে আমেদ-সাহেব শাদি দিচ্ছেন তার বংশের একমাত্র প্রদীপটিকে। দেশবিদেশ থেকে কারিগর আনিয়েছেন নতুন বেগমের জন্য নতুন মহল গড়াতে। যখন তৈরি হচ্ছিলো, তার শোরগোলও বড়ো কম ছিলো না। তখন আর-একবার কথা উঠেছিলো নবাববাড়ি দেখার। জ্যাঠামশায় ঠিক দাদুর মতো সুরেই বলেছিলেন, 'হবে, হবে, ব্যস্ত কী অতো।' কিন্তু হয়নি।

হেঁটে সুলেখা ঘরটার এ-মাথা থেকে ও-মাথায় গেলো। এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে অপর প্রান্তে তাকিয়ে আয়তনটা অনুমান করবার চেষ্টা করলো। ফ্রেসকো-আঁকা দেয়ালটা দেখলো। মহম্মদের কোনো উপদেশমূলক গল্পের ইশারা। গালিচার প্রান্ত ঘিরে গাঢ় লাল রঙের বর্ডারের পরেই দুধের মতো শাদা শ্বেতপাথরের মেঝে। ঠাণ্ডা। শীতল। শান্ত। দূরে দাঁড়িয়ে বুক-সমান-উঁচু খাট, খাটের তিন ধাপ লাক্ষার লাল প্রলেপ-লাগানো সিঁড়ি, সিঁড়ি দিয়ে উঠে একরাশ জুঁই ফুলের মতো বিছানাটা দেখলো। এইমাত্র ঐ বিছানা থেকে উঠে এসেছে সে। তারই বিছানা, তারই জন্য এই আয়োজন। নবাববাড়ি, নবাবের মতোই আতিথেয়তা। খুঁত নেই, ত্রুটি নেই, আলস্য অমনোযোগ কিছু নেই। কিন্তু কার ঘরে

কে অতিথি। বেচারা স্থলতান। ভদ্রলোক বিয়ে করলেন না কেন? বেগম-সাহেবাকে নিয়ে দিব্যি স্থখে থাকতে পারতেন এই ঘরে। যা-ই হোক, ভদ্র আছেন। আচার ব্যবহার সভ্যতা— আর— আর— এইখানে এসে ভাবনাটা থামলো স্থলেখার। সততা কথাটা মুখে এসে গিয়েছিলো, কিন্তু সেটা কি সত্যি? ততোটা বলা চলে কি? আজ বিদায়ের দিনে মনটা নরম আছে ব'লে কি এতো বেশি ক'রে ভাবা উচিত?

টেবিলের কাছটায় এগিয়ে এসে চেয়ারে বসলো। কয়েকখানা বই। একা থাকার সঙ্গী হিসেবে স্থলতান-সাহেব নিজেই সাজিয়ে রেখে গেছেন টেবিলে। স্থলেখা আজ পর্যন্ত ছোঁয়নি। কেন ছোঁয়নি? ঘেন্না করেছে? স্থলতান-সাহেব রেখে গেছেন ব'লে ঘেন্না করেছে? বই তো অন্যের লেখা, তাতে স্থলতানের কী? এটা বড়ো বাড়াবাড়ি। ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বইগুলো পড়লে, তবু তো কতোখানি সময় সে পবিত্র চিত্তে কাটাতে পারতো। বাবা বলতেন বই-ই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ আত্মীয়, যার সঙ্গে কোনোদিন ঝগড়া হয় না, কোনোদিন মনোমালিন্য হয় না। যখন যেভাবে যেখানেই থাকো, কয়েকখানা বই থাকলেই সব দুঃখের অবসান। আর সেই বই স্থলেখা একটা তুচ্ছ কারণে ছুঁয়ে দেখেনি। হাত বাড়িয়ে এতোদিনে বইগুলো খুলে দেখলো সে। গন্ধ নিলো। নতুন বইয়ের গন্ধের মতো আর-কিছু না। টেবিলে আরো আছে। চিঠি লেখার বিলিতি প্যাড আছে একটি, খাম আছে হাতির দাঁতের ছোট্টো র‍্যাক-স্টেশনারিতে। টুকটুকে রঙের একটি ফাউণ্টেন পেনও অপেক্ষা করছে শুয়ে থেকে। ফাউণ্টেন পেনটা খুলে হিজিবিজি কাটলো একটু।

জবেদা এলো এবার, পিছনে সাহেরবানু। দু-জনে চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে এসেছে। একজনের খাবার দু-জনে ব'য়ে এনেছে। ভালো। ক'টা

বাজলো ? চারটে-তিরিশ। এ-বাড়ির সব কাঁটায়-কাঁটায়। চা আনাতেই বোঝা গেছে সময়টা কতো। কিন্তু আজো কি ওরা নিয়মের ব্যতিক্রম করবে না কিছু ? আজকের দিনটিও কি ওরা অন্য দিনগুলোর সঙ্গে মিলিয়ে দিতে চায় ? তাই তো ! এই তো জবেদা ঠিক তেমনি ক'রেই খাবার সাজিয়ে দিচ্ছে, তেমনি ক'রেই চা ঢালছে রুপোর পট থেকে।

সাহেরবান্থর চোখে তেমনি কুটিল হাসি, জবেদার মুখে তেমনি মোলায়েম কথা। একটু কেবল বিষণ্ণ, উদ্বিগ্ন। উদ্বেগটা বিষণ্ণতার চেয়ে বেশি। খুব বেশি। এতো কি ভাবছে জবেদা ? মায়ের চেয়ে মাসির দরদ বেশি নাকি ? প্রবাদটা তা হ'লে মিথ্যে নয় ?

বিকেল নামলো মাঠে। রোজের মতোই কাঁচা রক্ত ছড়িয়ে লাল গোল বলের মতো সূর্যটা নেমে যাচ্ছে দূরে অশথগাছটার আড়ালে। স্থলেখার গা ধোবার সময় হ'লো। সাহেরবান্থ স্নানশালার ফোয়ারামুখ খুলে দিলো, স্থগন্ধ ছড়িয়ে, সাজ-সরঞ্জাম ঠিক ক'রে তাগাদা দিলো তাকে। চুল ভিজিয়ে স্নান ক'রে এলো স্থলেখা, মস্ত হল-ঘরের এই কোণে, মারবেল মেঝেতে লাল টুকটুকে মখমল-মোড়া গোল আর নিচু আসনটিতে বসলো চুল ছড়িয়ে, রুপোর ঝালিতে চুল বাঁধার আয়োজন, বাটিতে গন্ধতেল। সেই তেল জবেদা আস্তে-আস্তে বুলিয়ে দিচ্ছে চুলে, স্থবাসে ঘরের বাতাস মদির হ'য়ে উঠেছে। সোনা-বাঁধানো চিরুনির নরম দাঁতে নরম ক'রে জট ছাড়িয়ে বেণী পাকিয়ে দিচ্ছে চুলে। খাটের উপর মূল্যবান শাড়ি জামা গয়না নিয়ে রুপোর ট্রে চুপচাপ প'ড়ে আছে বিছানায়।

সব রোজকার মতো। একটুও তো তফাৎ নেই। তা কেমন ক'রে হয় ? কে জানে, হয়তো এক্ষুনি ঝাড়গুলোর ফোকরে-ফোকরে মোমের আলো জ্ব'লে উঠবে। জবেদা বলবে, 'একটু হাসো, চুপ ক'রে বোসো,

এক্ষুনি সুলতান আসবেন।' বলবে, 'বুনোপনা কোরো না। এ তো সুলতানের নেকনজর নয়, এর নাম প্রণয়। প্রেমই জীবন, প্রেমই প্রাণ, প্রেমই সত্য। যার হৃদয়ে সেই প্রেম জাগে সে-ও ধন্য, যার জন্য জাগে সে-ও ধন্য। প্রেমের জাত নেই, মান নেই, ধর্ম নেই, বিবেক নেই। প্রেম অবুঝ, অন্ধ। তুমি পেয়েছো, নাও। মন খারাপ ক'রে থেকো না।' বইয়ের মতো এ-কথাগুলো মুখস্থ জবেদার। তিন মাসে তিন তিরিশে অন্তত নব্বুইবার এই বক্তৃতা শুনেছে সুলেখা। জবেদা যেন পাদ্রি-সাহেব! সুলতানের এজেন্ট! সহসা সারা অন্তর তার সংশয়ে আচ্ছন্ন হ'য়ে উঠলো। যদি সবই তেমনি রইলো, রোজকার মতো খেলো, গা ধুলো, সাজতে বসলো তবে আর যাবার প্রশ্ন রইলো কই? আজ যে সে যাবে তা কি এরা জানে না? জানলে কি সব-কিছু অন্যরকম হ'য়ে যেতো না? কিছু কি ওলটপালট হ'তো না? আসলে সব মিথ্যা। সব ফাঁকি।

বেলা চারটের ভালো-লাগা বেলা পাঁচটার প্রান্তে এসে সভয়ে চমকে উঠলো। নিঃসন্দেহে মনে হ'লো, সুলতান-সাহেবের অগণিত কূট চক্রান্তের মধ্যে এটিও আর-একটি। সঙ্গে-সঙ্গে ছিটকে উঠে দাঁড়ালো সে, জবেদাকে ঠেলে দিয়ে খুলে ফেললো চুল, ধাক্কা দিয়ে ছিটিয়ে দিলো সব প্রসাধন-সামগ্রী, বড়ো-বড়ো পা ফেলে চ'লে এলো দরজার কাছে।

অবাক হ'য়ে মুখের দিকে তাকালো জবেদা। তাকিয়েই রইলো। তারপর আবার ধীরে-ধীরে গুছিয়ে নিলো সব। হাত বাড়িয়ে বললো, 'এসো।'

'না।'

'কেন?'

'ভালো লাগে না।'

'সাজতে ভালো লাগে না?'

'না।'

'আমার ভালো লাগে তোমাকে সাজাতে।'

'তোমাদের ভালো লাগা মন্দ লাগার সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক!'

'নেই?'

'কখনোই না।'

'তবে থাক।' জবেদাও উঠে দাঁড়ালো, রেখে দিলো জিনিসপত্র। শাড়িটা হাতে নিয়ে বললো, 'নতুন শাড়ি, সুলতান পাঠিয়ে দিয়েছেন, বিশেষভাবে অনুরোধ করেছেন আজ এটা পরবার জন্য।'

তীব্র দৃষ্টিতে বহুমূল্য ঢাকাই শাড়িখানার দিকে তাকালো সুলেখা। টুকটুক করছে রং, সারা গায়ে রুপোলি জরির ঘেঁষাঘেঁষি তারা-বুটি, লতাপাড়ের ছোটো ফুলগুলো সাচ্চা সোনায় যেন জ্বলছে। তাকালে চোখ ফেরানো যায় না।

নিস্তাপ গলায় জবেদা আবার বললো, 'বাড়িতে তাঁতি বসিয়ে নিজে হাতে এঁকে সুলতান-সাহেব হাজার কাটিমে তৈরি করিয়েছেন এই শাড়ি, এ-শাড়ি এখন আর বোনা হয় না, এ-সব তাঁতিদের বংশ লোপ পেয়েছে, অনেক চেষ্টায় এদের সংগ্রহ করেছেন উনি। তুমি দয়া ক'রে পরলে সুখী হবেন।'

'দুঃখিত।' সুলেখা মুখ ফিরিয়ে দাঁড়ালো, 'তোমাদের সুলতান-সাহেবকে সুখী করার জন্য আপাতত আমি খুব ব্যস্ত নই।'

জবেদা দাঁত দিয়ে তার গোলাপি ঠোঁট কামড়ে লাল ক'রে ফেললো, রুদ্ধস্বরে বললো, 'নিষ্ঠুর।'

পাঁচটার বেলা আস্তে-আস্তে পাঁচটা-পনেরোতে এসে থামলো, তারপর পাঁচটা-তিরিশ, তারপর চল্লিশ, পঞ্চাশ, ষাট। বাজলো ছ'টা, কিন্তু ছ'টার

পরে আর কেন কাঁটা সরে না ? ছ'টার পরে ছ'টা পাঁচ মিনিট হ'তেও কেন এমন পুরো একটা দিন কেটে যায়। তারপর দশ, তারপর পনেরো। মানে সওয়া-ছ'টা। মানে একটা মাস। আর সওয়া-ছ' থেকে সাড়ে-ছ'তে পৌঁছতে একটা বছর। কিন্তু বছরেও কুলোলো না, শেষে যেন ঘড়ির দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে যুগ-যুগান্তর পার হ'য়ে যেতে লাগলো স্থলেখার জীবনের উপর দিয়ে। কী দীর্ঘ আর কী যন্ত্রণাদায়ক সময় ! যে-সন্ধ্যা এই তিন মাস ধ'রে প্রত্যেক দিন স্থলেখার দরজায় একটা দৈত্যের মতো দিনকে ডিঙিয়ে পক্ষিরাজ ঘোড়ায় চ'ড়ে হুড়মুড়িয়ে এসে হাজির হয়েছে, সেই সন্ধ্যা আজ আসতেই ভুলে গেলো ? জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে গ্রীষ্মের লম্বা বেলাকে অভিসম্পাত দিলো স্থলেখা। শেষে একসময়ে সত্যিই সন্ধ্যা হ'লো, সন্ধ্যার নিথরতায় ঝিমঝিম করতে লাগলো সবুজ-মহলের সারা অন্তঃকরণ। স্থলেখার বুকটাও ধকধক করতে লাগলো প্রতীক্ষায়। স্থলতান-সাহেব ডাকতে এলেন ঠিক আটটা বাজতে পাঁচ মিনিটে।

'প্রস্তুত ?'

'যাবো ?' ঝিমিয়ে যেতে-যেতে টগবগিয়ে উঠলো স্থলেখা।

স্থলতান-সাহেবের এক পা ঘরের ভেতরে, এক পা বাইরে। দরজার পরদাটা শরীরের আদ্ধেক ঢেকে রেখেছে। অনেক রোগা দেখাচ্ছে তাঁকে, দুরন্ত বিলিতি পোশাকে চেনা যাচ্ছে না বাঙালি ব'লে। আজ মোম নয়, ইলেকট্রিকের উজ্জ্বল আলোয় ঝকঝক করছে সব। স্থলেখা তার বহুপ্রত্যাশিত সময়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে প্রায় কাঁপতে লাগলো।

'এতোদিনে শান্তি, না ?' একটু হাসলেন স্থলতান-সাহেব।

'দেরি আছে যেতে ?'

'তোমার কী ইচ্ছে ?'

'আমার ?' মাথা নিচু করলো সুলেখা, তখুনি চোখ তুলে বললো, 'প্লেনে যাবো ?'

'যাবে। সত্যি যাবে।'

'ক'টায় ছাড়ে ?'

'সারা দিন, ঘণ্টায়-ঘণ্টায়—'

'তবে আর রাত করা কেন ?'

'তাই তো।' সুলতান-সাহেব হাতের স্টেট এক্সপ্রেসের টিন থেকে সিগারেট বার করলেন একটি, কিন্তু ধরালেন না। ডান হাতের দু-আঙুলে ধ'রে বাঁ হাতের বুড়ো নখে ঠুকতে লাগলেন, 'তা হ'লে প্রস্তুত হ'য়ে নাও।'

'আমি প্রস্তুত হ'য়েই আছি।'

'প্রস্তুত ? কোথায় ?' সুলেখার আপাদমস্তক তাকালেন তিনি, 'এ-ভাবেই যাবে নাকি ?'

'বেশ তো আছি।'

একটু চুপচাপ।

'বিকেলে একটা ঢাকাই শাড়ি পাঠিয়েছিলাম।'

'দেখেছি।'

'ভেবেছিলাম আজ অন্তত একটা প্রার্থনা তুমি পূরণ করবে।'

'প্রার্থনা বলছেন কেন, আদেশ বলুন।'

'সুতোগুলো তুলো থেকে তৈরি আর সেই সুতো থেকেই জামা-কাপড়ের জন্ম, বুনেছে তাঁতিরা, ওর মধ্যে আমি কই ? যাকগে, সে-শাড়িটা না-হয় না-ই পরলে, কিন্তু একটু ভদ্রভাবে রাস্তায় চলাফেরা করাই কি ভালো নয় ?'

'আমাকে তো বোরকাই পরতে হবে।'

'না-ও হ'তে পারে, আমি যে পরদাপ্রথার বিরোধী সেটা অনেকেই জানে।'

ইতস্তত করলো স্থলেখা।

'তা ছাড়া স্থলতানের বেগম সেজে নবাবগঞ্জের নবাববাড়ি থেকে বেরুচ্ছো, যথোপযুক্ত বেশভূষা না-হ'লে সন্দেহ করতে পারে।'

'বেগম!'

'উপায় নেই, ঘণ্টাখানেকের জন্য মিসেস স্থলতান আমেদের পার্টটাই তোমাকে নিতে হবে।'

'সে-কথা আমি জানতাম না।'

'জানলে কী করতে? যেতে না?'

স্থলেখা চুপ ক'রে রইলো।

স্থলতান-সাহেব পরদা ছেড়ে দিয়ে ঘরের ভেতরে এলেন, গাঢ় গলায় বললেন, 'লজ্জা আমারও আছে স্থলেখা, ধিক্কারও আছে। আত্মসম্মানের সঙ্গে সম্প্রতি যতোই বিচ্ছিন্ন হ'য়ে থাকি না কেন, তারও কিছু অবশিষ্ট আছে। কিন্তু এ-অভিনয় তোমারই জন্য, শহর থেকে তোমাকে সরাবার এ ছাড়া আর কোনো কৌশল আমার জানা নেই।'

'শহরের সবাই জানে আপনি অবিবাহিত।'

'শহরের লোকেদের জন্য আমার ভয় নয়, এবারকার দফায় এই শহরের লোক উৎসাহী নয়। বাইরের গুণ্ডা এসেছে সব। তারা কাউকেই রেয়াৎ করে না। আমি বরং অপেক্ষা করছি, দয়া ক'রে একটু পরিচ্ছন্ন হ'য়ে নাও, শাড়িটা বদলাও, কিছু গয়নাও প'রে নিয়ো।'

ঘাড় বাঁকালো স্থলেখা, 'না।' বেগম কথাটা আবার উত্তপ্ত করেছে তাকে।

'বেশ। যা তোমার খুশি।'

সুলতান ক্লান্ত। বিষণ্ণ। কিছু নিয়েই আর জোর করবার মতো তাঁর শক্তি নেই, উৎসাহ নেই। বাইরে বেরিয়ে এলেন তিনি।

কালো কুচকুচে বিশাল রোল্‌স রয়েস দাঁড়িয়ে আছে দরজায়। মাথার উপর সীমাহীন আকাশের বিস্তার। চুলের মধ্যে আঙুল ডুবিয়ে গাড়ির দরজায় হেলান দিলেন। একটু সময় লাগলো স্থলেখার আসতে। কী ভেবে শেষ পর্যন্ত শাড়িটা বদলেছে সে, সামান্য প্রসাধনের প্রলেপও পড়েছে মুখে, চুলের লম্বা বেণীতে সিল্কের ফিতের ফাঁস। সুলতান-সাহেব মুখ ফিরিয়ে তাকালেন, লাল টুকটুকে ঢাকাই শাড়ির জরির চুমকি বুটি শুধু চোখকেই ঝলসে দিলো না, বুকের মধ্যেও তাঁর বিদ্যুৎ ব'য়ে গেলো।

জবেদার কাছে বিদায় নিলো স্থলেখা, চোখে-চোখে তাকিয়ে হৃদয়ে মেঘ ঘনিয়ে এলো। কোমল গলায় বললো, 'তা হ'লে যাই ?'

চোখ নামিয়ে নিয়ে জবেদা বললো, 'আল্লা, আল্লা।'

'অনেক অন্যায় ব্যবহার করেছি, নিজগুণে আমাকে ক্ষমা কোরো।'

জবেদা চোখে আঁচল চাপা দিলো।

॥ পাঁচ ॥

হেডলাইট জ্ব'লে উঠলো গাড়ির। দু-জনে এসে বসলো ভেতরে। জবেদা, সাহেরবানু, মমতাজ, ছোটো বাঁদি সব্বাইকে বুকে নিয়ে ছবির মতো দাঁড়িয়ে রইলো সবুজ-মহল। ড্রাইভার স্টার্ট দিলো। সুলতান-সাহেব জানালার কাচ তুলে সবুজ সাটিনের ঝালর-দেওয়া পরদা টেনে অন্ধকার ক'রে দিলেন। সঙ্গে-সঙ্গে বুকের ভেতরটা দুরদুর ক'রে উঠলো স্থলেখার। ভয়ে এতোটুকু হ'য়ে মিশে রইলো এক কোণে। কে জানে এ আবার কোন নতুন ফাঁদে পা দিলো সে।

গাড়ি চোখের পলকে নবাববাড়ির এলাকা ছাড়ালো। মাঠের মধ্যে-মধ্যে সুরকির লাল রাস্তা। বটতলা দিয়ে রিজার্ভ ট্যাঙ্কের ধারে-ধারে পোড়া ইটের স্তূপ ছাড়িয়ে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের লম্বা টানা পীচের রাস্তায় এসে পড়লো দু-মিনিটে।

'সুলেখা।'

'বলুন।'

'ভালো হ'য়ে বোসো না।'

'ভালোই তো বসেছি।' একটু যেন কাঁপলো গলাটা।

'ভয় করছে ?'

'ন্না তো।'

'গরম লাগছে ?'

'না।'

'কাচটা নামিয়ে দেবো ?'

'না, না—'

থমথম করছে রাস্তাটা। আটটার রাত্তিরে রাত দুটোর নিঃসঙ্গতা। ডাকবাংলো ছাড়িয়ে খানিক দূর আসতেই আধো-অন্ধকারে একদল লোক হেঁকে উঠলো, 'কে যায় ?'

সভয়ে সুলতান ড্রাইভারকে বললেন, 'নবাববাড়ির ফ্ল্যাগ দিয়েছো ?'

'আজ্ঞে দিয়েছি।'

'তোমার ব্রোকেড টুপি পরেছো ?'

'আজ্ঞে পরেছি।'

'ভুল না করে।'

'আজ্ঞে না, নবাববাড়ির সব সাজ লাগানো হয়েছে।'

'হুঁশিয়ার।'

'আজ্ঞে, ভাববেন না।'

গাড়ির গতি আরো দ্রুত করলো ড্রাইভার।

দুই পাশে কৃষ্ণচূড়ার সারি ভূতুড়ে ছায়া ফেলেছে রাস্তায়। মাঝে-মাঝে কালভার্ট। এরোড্রোম এখান থেকে কুড়ি মাইলের রাস্তা। দুই চোখ বন্ধ ক'রে হাত মুঠো করলো সুলেখা।

সাবধান হ'য়ে, সচেতন হ'য়ে কাচের ফাঁকে দু-পাশের রাস্তায় চোখ রেখে ব'সে আছেন সুলতান-সাহেব। তাঁর গাড়ি, তাঁর ড্রাইভারের পোশাক, তাঁর নিজের বহুমূল্য স্যুট বুট টাই, চেহারা সবই তাঁর উপযুক্ত। সন্দেহ করবার অবকাশ নেই। সুলেখার পাঁচশো টাকা মূল্যের সাচ্চা সোনা-রুপোর তারে পাড়-বোনা ঢাকাই শাড়িটিও এই শহরে একমাত্র মিসেস সুলতানই ব্যবহার করতে পারেন। কাজেই গোলমাল হ'লো না কোনো। মাত্র দু-বার দু-দল লোক গাড়িটা থামিয়ে উঁকিঝুঁকি ক'রেই ছেড়ে দিলো। নবাব-সাহেব তাঁর বেগমকে নিয়ে যেখানে খুশি যাবেন, তা নিয়ে তাদের মাথাব্যথা কী? তবু বলা যায় না, ঐ গাড়িতেই হয়তো কতো কাফের চালান হচ্ছে, তাই চোখ বুলিয়ে নেওয়া। নিরাপদেই এরোড্রোমে পৌঁছলো তারা।

হাঁপ ছেড়ে সুলেখা বললো, 'এবার আমি একাই যেতে পারবো।'

সুলতান গাড়িটা বিদায় দিয়ে এসে বললেন, 'তা তো পারবেই, তবু যাই সঙ্গে।'

'কী লাভ?'

'কী জানি কী লাভ।'

'মিছিমিছি কষ্ট।'

'কষ্ট কী?'

'যদি কলকাতাতেও মারামারি আরম্ভ হ'য়ে থাকে?'

'তা তো হচ্ছেই।'

'তবে?'

'কী তবে?'

'এ-রকম অবস্থায় যাওয়া কি উচিত?'

'মন্দ কী। তোমার প্রত্যেক মুহূর্তের একাগ্র ইচ্ছেটা অনায়াসে সফল হ'তে পারবে।'

সুলেখা মাথা নিচু করলো।

'তা ছাড়া—' একটু হাসলেন সুলতান-সাহেব, 'ইচ্ছে করলে তুমি নিজেও খুন করতে পারো।' আজ আর তোমাকে হরণ করবো না আমি।'

সুলেখার চোখের ঘন পক্ষ্ম এক মুহূর্তের জন্য কাঁপলো একটু।

দিনে রাত্রে এখানে এই এরোড্রোমে দাঙ্গার ক'দিন মুহুর্মুহু প্লেন আসা-যাওয়া করছে, পাকিস্তানের হিন্দুরা হিন্দুস্থানে যাচ্ছে। এয়ারপোর্টে গিশগিশ করছে লোক। চারদিকের সাজানো ফুলবাগান পায়ের চাপে পিষ্ট। কেউ বুক চাপড়াচ্ছে, কেউ প'ড়ে আছে মাটিতে, কেউ উদ্‌ভ্রান্ত। কারো মা নেই, কারো সন্তান নেই, কারো স্ত্রী নেই, কারো স্বামী নেই। কেউ-কেউ সব ফেলে শুধু নিজেকে নিয়ে কোনোরকমে আছড়ে এসে পড়েছে এখানে, কিন্তু টিকিটের দাম দিতে পারছে না ব'লে ঠেলে দিচ্ছে তাকে, দুই পা জড়িয়ে কপাল কুটছে সে। সবাই, যে যে-ভাবে পারে ছুটে এসেছে প্রাণ বাঁচাতে। শহর থেকে কুড়ি মাইল রাস্তা ডিঙিয়ে ক'জন আর আসতে পেরেছে বোঁচকা-পুঁটুলি গুছিয়ে। যাদের পয়সা আছে, প্রাণ বাঁচাবার উপায়টা তবু অনেকটা সহজ হয়েছে তাদের পক্ষে, যাদের তা নেই তাদেরই মুশকিল। পুরুষেরা অনেকে বুকের বোতাম, হাতের আংটি জমা দিচ্ছে টিকিটের দাম বাবদ, মেয়েরা হাত খালি ক'রে, গলা

খালি ক'রে হার-চুড়ি খুলে দিয়ে উঠে বসছে প্লেনে। কোনোরকমে যেতে পারলেই হয়। তারপর সেখানে গিয়ে কী হবে, সেটা পরের কথা।

এইমাত্র একটা প্লেন ছেড়ে গেলো। ছোট্টো এয়ারপোর্ট। হলে না-ব'সে অনেকেই অপেক্ষা করছে বাইরে। উপায়ও নেই তা ছাড়া। সেখানে স্থানাভাব। সুলেখাকে নিয়ে সুলতান-সাহেবও বাইরেই দাঁড়িয়ে রইলেন। কতো লোক আসছে-যাচ্ছে, কে কার দিকে তাকাচ্ছে। তবু ভয়-ভয় করতে লাগলো, কাউকে একটু-আধটু চেনা মনে হ'লেই স'রে দাঁড়াতে লাগলো দু-জনে। ধরা পড়লে আর উপায় নেই। যদিও এখানে যথেষ্ট পাহারাদার আছে, কী হিন্দু, কী মুসলমান কারোরই কাউকে কোনো ক্ষতি করবার উপায় নেই, তবুও নিশ্চিন্ত হ'তে পারা যাচ্ছে না।

'দু-একটা কথা বলো সুলেখা।' ফিশফিশ করলেন সুলতান-সাহেব।

'কী বলবো।' সুলেখার গলা শুকিয়ে কাঠ।

'একসঙ্গে দু-জনে এসেছি আর এতো বড়ো একটা সম্পর্ক—' মৃদু হাসলেন তিনি। 'হ'লোই বা মিথ্যা, লোকে তো তা জানে না। অমন অপরিচিতের মতো, শত্রুর মতো দু-দিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলে তারা কী ভাববে ?'

সে তো ঠিক কথাই। কিন্তু তবু কথা আসছে কই সুলেখার।

'তোমার মাকে নিয়ে যেদিন এসেছিলাম, এর চেয়ে বেশি ভিড় ছিলো, কিন্তু এসেই প্লেন পেয়েছিলেন ওঁরা।'

'আপনি নিজে নিয়ে এসেছিলেন ?'

'তাতেই কি লোকের বিশ্বাস আছে, কেমন জানাজানি হ'য়ে গেলো।'

'মা কী বললেন ?'

'বলবার মতো মনের অবস্থা ছিলো না।'

'আপনাকে নিশ্চয়ই চিনতে পেরেছিলেন, অন্তত আমার ভাইয়েরা—'

'বোধ হয়।'

'তারা কিছু বললো না?'

'বললো।'

'কী বললো?'

'বললো, "আপনার কোনো ভয় নেই তো?" '

'আপনি কী বললেন?'

'কী বলবো, ভয় তো আমার প্রতি পদক্ষেপে। আমি এখন হিন্দুস্থান-পাকিস্তান দুই দেশেরই শত্রু।'

'কেন?'

'মুসলমানরা আমাকে বিশ্বাসঘাতক ব'লে জানে, হিন্দুরা জানে— ঐ যে তুমি কী বলো না, নরক-টরক তাই।'

আরক্ত হ'য়ে সুলেখা বললো, 'কিন্তু সত্যিই তো আপনি তা নন।'

'নই?' আধো-আলো আধো-ছায়ায় চোখে-চোখে তাকালেন সুলতান-সাহেব। 'কী ক'রে জানলে?'

সুলেখা অন্যদিকে তাকিয়ে চুপ ক'রে রইলো। জবাব দিলো না।

ন'টা বেজে চল্লিশ মিনিটে সুলেখাদের নিয়ে প্লেন আকাশে উড়লো। কতোটুকু বা রাস্তা। পলক না-ফেলতেই শেষ। একটা মুহূর্তে কেটে গেলো একটা ঘণ্টা। অন্তত সুলতান-সাহেবের তাই মনে হ'লো। সুলেখার দিকে তাকালেন তিনি, মুখ ফিরিয়ে ব'সে আছে, গালের পাশটা দেখা যাচ্ছে, দেখা যাচ্ছে লম্বা বেণীর তলাকার মসৃণ ঘাড়। লাল টুকটুকে শাড়িতে নতুন মানুষ ব'লে মনে হয়।

মাটিতে নামবার জন্য পাক খেলো প্লেনটা। সুলতান-সাহেব ঘড়ি দেখলেন।

সুলেখা জিজ্ঞেস করলো, 'ক'টা ?'

'তোমার নিশ্চয়ই সময় কাটছে না ?'

'এসেই তো পড়লাম।'

'আমি জানি, অপ্রিয় সঙ্গের মতো দুঃসহ আর-কিছু নেই ; তিন মাস ধ'রে তোমাকে সে-যন্ত্রণা দিয়েও সাধ পূরণ হয়নি আমার। কিন্তু বিশ্বাস করো, অন্য কোনো উপায় থাকলে আমি আসতাম না।'

'এ-সব বলছেন কেন ?'

'এখনই দশটা বেজে সাঁইত্রিশ, নামতে-নামতে আরো পঁচিশ মিনিট, এই রাত ক'রে দমদম পৌঁছে, একা-একা কেমন ক'রে যাবে সেজন্যেই সঙ্গে এলাম। তোমাকে পৌঁছে দিয়েই আমি চ'লে যাবো।'

সুলেখা চুপ।

'সুলেখা।'

'বলুন।'

'সমস্ত জীবনেও বোধ হয় আমাকে তুমি ক্ষমা করতে পারবে না, না ?'

'ক্ষমার কথা উঠছে কিসে ?'

'তোমার জীবনের কতোগুলো সুন্দর দিন আমি নষ্ট ক'রে দিলাম।'

'ভালো ছাড়া কখনো তো আপনি আমার মন্দ করেননি।'

আশ্চর্য। সুলেখার গলা যেন ভেজা লাগলো সুলতানের কানে।

'একটা মিথ্যা ক্ষোভে, লোভে আর মিথ্যা আক্রোশে ভারি ভুল রাস্তায় হাঁটলাম এ-ক'বছর। কেবল ক্লান্তিই বাড়লো। আর কী পেলাম ? জোর ক'রে কেড়ে কি কেউ নিতে পারে কিছু ?'

'হয়তো পারে।'

'মিথ্যা। মিথ্যা। সে-পাওয়া একান্ত মিথ্যা। পাবার জন্য অপেক্ষা করতে হয়, সমর্পণ করতে হয়, নিরহংকার হ'তে হয়। মহাত্মাজি ঠিকই বলেছেন, প্রতিহিংসা জিনিসটা আগুনের মতো। কেবলই পোড়ায়, কেবলই ছড়ায়। অন্যের ঘর জ্বালালে নিজের ঘরও পুড়ে যায় সেই আগুনে। আমাকে ক্ষমা করো তুমি।'

এয়ার-হস্টেস এসে সামনে দাঁড়ালো। প্লেন নামছে, বেল্ট বাঁধার অনুরোধ জানালো সে।

উন্মত্ত শোকার্ত জনতার সঙ্গে আর-একটি ঢেউ হ'য়ে সুলেখাকে নিয়ে সুলতানও নামলেন মাটিতে। সকলের সঙ্গে ঠেলাঠেলি ধাক্কাধাক্কি ক'রে ঢেউয়ের মতোই গড়িয়ে-গড়িয়ে কখন সামনের বারান্দায় এসে থামলেন। সুলেখা চারদিকে তাকালো। পরিষ্কার ঝকঝকে আকাশ, একফালি বড়ো কুমড়োর মতো বাঁকা চাঁদ হেলে রয়েছে দক্ষিণে, ফুরফুর ক'রে হাওয়া ছেড়েছে, বিশাল মাঠের সাজানো গাছের মাথায় পাতার শিরশিরানি। সবই সুলেখার অপরিচিত। ছ' বছর বয়স থেকে তার বারো বছর বয়সের কলকাতার ক্ষণিক জীবনে এরোপ্লেনে চড়বারও যেমন সুযোগ হয়নি, এই দমদমের এরোড্রোমে আসবারও অবকাশ হয়নি। কলকাতারই বা কতোটুকু জানে সে। ভবানীপুরের এক অখ্যাত গলির এক অখ্যাত দোতলা ফ্ল্যাটের বাসিন্দা ছিলো। বাড়িটিতে একটি ছোট্টো বারান্দা ছিলো রাস্তার দিকে। সে-বারান্দাটা ভালো লাগতো সুলেখার, সে-বারান্দায় দাঁড়িয়ে দু-পাশে যতোটুকু দৃষ্টি চলে, ততোটুকু কলকাতাই দেখতে পেয়েছে সে। মা বাগান করেছিলেন সেখানে। কোণে ইট দিয়ে ঘিরিয়ে মাটি ফেলে মাধবীলতার ঝোপ হয়েছিলো, থোবা-থোবা লাল ফুল ফুটতো সন্ধ্যাবেলা। টবের গাছে বেলফুল, চন্দ্রমল্লিকা আর জিনিয়া। বাবা বলতেন, বোটানিক্যাল গার্ডেন। মাকে খ্যাপাতেন। বিকেলবেলা

সেই বোটানিক্যাল গার্ডেনেই ছোট্টো চায়ের আসর বসতো। একটি এলানো চেয়ারে বাবা, মোড়ার উপরে মা, সামনে টিপয়। আর তারা তিন ভাই-বোন মা-বাবাকে ঘিরে শাড়ির জমিতে উজ্জ্বল পাড়ের মতো সীমারেখা হ'য়ে শোভা বাড়াতো। এটাও বাবার উপমা। মা সুন্দর পেয়ালায় চা ঢেলে দিতেন, চায়ের সঙ্গে নিত্য নতুন খাবার। নিত্য নতুন সারপ্রাইজ।

বাবা কৃত্রিম ক্ষোভে বলতেন, 'আবার তুমি এই গরমের মধ্যে রান্না-ঘরে ব'সে-ব'সে এ-সব করেছো?'

মা তাঁর স্বভাবসুলভ লাজুক ভঙ্গিতে চোখ চায়ের বাসনে নিবদ্ধ রেখে ঈষৎ আরক্ত হ'য়ে বলতেন, 'আহা।'

ঐ 'আহা' শব্দটি বোধ হয় বাবার কানে মধুবর্ষণ করতো, উদ্ভাসিত মুখে মা-র সযত্ন-পরিবেশিত স্বাদু সুখাদ্যের সদ্ব্যবহার করতে-করতে কী একরকম ক'রে যে তাকাতেন, সে-দৃষ্টি এখনো মনে আছে সুলেখার। তারপর তারিফ করার পালা।

ছ' বছর ঐ একটি বাড়িতেই ছিলো। বাড়ির কাছে একটি ইস্কুল ছিলো, ঐ ইস্কুলেই পড়েছে। ছুটির দিনে মাঝে-মাঝে মা-বাবার সঙ্গে বেড়ানো। তা-ও বেশির ভাগ বালিগঞ্জের এই দাদামশায়ের বাড়ি। মায়ের কাকা। এই মুহূর্তে মা তাঁর দুই ছেলে নিয়ে যে-বাড়িতে বাস করছেন। হেঁটে-চ'লে বেড়াচ্ছেন। ভাবছেন তার কথা। বারে-বারে ব্যাকুল হৃদয়ে জানালায় এসে দাঁড়াচ্ছেন। কিন্তু তিনি কি কল্পনা করতে পারছেন, আজই— আর-একটু বাদেই তাঁর সব উৎকণ্ঠার অবসান হবে, আর-একটু বাদেই মা-র বুকে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে সুলেখা তাঁর সব জ্বালা জুড়িয়ে দেবে। আর তার নিজের দুঃখ? এই সুদীর্ঘ তিন মাসের আক্রোশ-ভরা, কান্না-ভেজা অপমানিত অসম্মানিত দিনগুলোর বেদনা? তা-ও কি ধুয়ে যাবে না সেই সঙ্গে? আজ তার কতো আনন্দের দিন, কতো সাধের দিন।

এই দিনটির কথা ভাবতে পর্যন্ত একসময়ে বুকের শিরা-উপশিরা তার ছিঁড়ে গিয়েছে।

শিরা-উপশিরা না-ছিঁড়ুক, সহসা কেন জানি বুকটা তার ব্যথা ক'রে উঠলো। সুলতান-সাহেবের দিকে মুখ তুলে তাকালো সে।

'কী ভাবছো?' সুলতান-সাহেব তাঁর ছ' ফুট দু-ইঞ্চি লম্বা শরীরে দাঁড়িয়ে আছেন টান হ'য়ে, ঠোঁটের ফাঁকে সিগারেটের আলো। গম্ভীর বিষণ্ণ চোখে এক ফোঁটা হাসি।

অসম্ভব ভিড়। দলে-দলে লোক আসছে-যাচ্ছে, দাঁড়িয়ে থাকছে, ঘুরছে, আলাপ করছে, কাঁদছে, হাসছে, ঘাম, দুর্গন্ধ, থুতু, শিশুর নোংরা—উৎকর্ণ হ'য়ে সুলেখা বললো, 'আপনি শুনতে পাচ্ছেন?'

'কী!'

'এরা দাঙ্গার কথা বলছে।'

'হ্যাঁ।'

'কাল বস্তি জ্বালিয়েছে? সত্যি!'

'পরশু চন্দননগর নিশ্চিহ্ন করেছে, তার আগে মমিনপুরের শোধ নিয়েছে চারগুণ হত্যা ক'রে। পাকিস্তানের প্রতিশোধ হিন্দুস্থানে এবার খুব সমারোহের সঙ্গেই সম্পন্ন হচ্ছে।'

'তবে?'

'কী তবে?'

'আপনি।'

'আমার নাম তো ওদের তালিকায় সবচেয়ে প্রথমে।'

'আসবার আগে জানতেন না এ-সব?'

'জানতাম না!' চোখের কোণে কৌতুক জমলো সুলতান-সাহেবের, 'এ-ও জানি, এই মুহূর্তে আমি-নামক যে-মানুষটা বিলিতি পোশাকের

আড়ালে জাত লুকিয়ে আকাশ-বাতাস দেখছে, পাশের মানুষটির সান্নিধ্য-সুখে সব ভুলে সদর্পে দাঁড়িয়ে আছে সিগারেট মুখে দিয়ে, একটা সামান্য পলকপাতের অবকাশও আর তার না-হ'তে পারে।'

'সুলতান-সাহেব।'

'বলো।'

'ফিরে যান।'

'যাবোই তো।'

'এখুনি, এই ফিরতি প্লেনেই চ'লে যান আপনি।'

'তা কখনো হয়?'

'হয়। একশো-বার হয়।'

'হয় না।'

ভিড় ছাড়িয়ে একটু নিরালায় এসে দাঁড়ালেন।

'আমার ভয় করছে।'

'কিসের ভয়?'

'শেষে কি একটা সর্বনাশ হবে।'

সুলতান-সাহেব হাসলেন। হাতের সিগারেট পায়ে পিষে বললেন, 'খুব ভালো লাগছে তোমার, না? আর-একটু পরেই মায়ের সঙ্গে দেখা হবে। তোমার ভালো-লাগার কথা ভেবে আমারও ভালো লাগছে।'

'আপনি তো জানেন মানুষের আক্রোশ জন্তুর চেয়েও ভয়ানক। কেমন দলে-দলে সব ঘুরে বেড়াচ্ছে, কে কতো খুন করেছে কী ভীষণ ফলাও ক'রে তালিকা দিচ্ছে তার। এরা কি মানুষ আছে এখন?'

'তা নেই বটে।'

'হিন্দু-মুসলমান দুয়ের মধ্যেই এমন কেউ-কেউ আছে, যারা এ-সবই চায়, এ-সবই ভালোবাসে। তারা যদি—'

'তুমিও তো তাই চাও স্থলেখা।'

স্থলেখা চুপ হ'লো।

'চলো, একটা গাড়ির চেষ্টা দেখা যাক।' স্থলতান-সাহেব পা বাড়ালেন।

স্থলেখা নড়লো না।

'মিছিমিছি রাত বাড়িয়ে লাভ নেই।'

'আপনাকে আমি প্লেনে তুলে দিয়ে যাবো।'

'পাগলামি কোরো না। এই অন্ধকারে একা কোথায় আমি তোমাকে ছেড়ে দিয়ে যাবো বলো তো?'

হঠাৎ জল দেখা দিলো স্থলেখার চোখে, আবছা-আবছা জ্যোৎস্নায় চকচকে চোখ তুলে তাকালো সে, 'কেবল আমাকে কষ্ট দেওয়া, যন্ত্রণা দেওয়া।'

'তার মেয়াদ আর খুব বেশি তো নেই স্থলেখা।'

'আপনি আমাকে আর কতো ঋণী করবেন স্থলতান-সাহেব। আমি কী দিয়ে শোধ করবো?'

'শুধু ঋণ!'

সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে একদল লোক তাকাতে-তাকাতে চ'লে গেলো। স্থলেখা অস্থির হ'য়ে উঠলো, 'যান, শিগগির যান। কী-রকম চোখ ওদের। আপনাকে অনেকেই চেনে, কতো কাগজে ছবি বেরিয়েছে তার ঠিক নেই। লোকের মনে কতো ভুল ধারণা আছে।'

'আর তোমার?'

স্থলেখা স্থলতানের হাত চেপে ধরলো, 'আর একটুও দেরি না, আপনি যান।'

নিজের উষ্ণ হাতের মুঠোয় হঠাৎ সুলেখার ঠাণ্ডা-হ'য়ে-যাওয়া ভীত কম্পিত হাতের স্পর্শ বিচলিত করলো সুলতানকে। চুপ ক'রে থেকে বললেন, 'এজন্যেই কি এতোদূর সঙ্গে ক'রে নিয়ে এসেছি ?'

'এসেছেন, ভালো করেছেন, কিন্তু আর এক পা-ও শহরের দিকে নয়।'

'চলো।'

'আপনাকে তুলে না-দিয়ে আমি কিছুতেই যাবো না।'

'দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে যদি এই করো তা হ'লে স্বভাবতই ওদের সন্দেহ হবে।'

'আমার ভয় করছে।'

'বাইরে গেলেই ভয় থাকবে না।'

'কেন এমন বারে-বারে তাকাচ্ছে ওরা ? কী চায় ?'

'আমাকেই বোধ হয়।' দু-পা এগিয়ে সুলতান হাসলেন।

'আজ না-হয় রাতটা এখানেই থাকি।' হাঁটতে গিয়ে পায়ে পা জড়িয়ে যাচ্ছে সুলেখার।

'খেপেছো ?'

একটা ট্যাক্সি দেখে দৌড়ে গিয়ে তাকে থামালেন সুলতান-সাহেব, দরজা খুলে সুলেখাকে ভিতরে তুলে দিয়ে বললেন, 'নাও, এবার শান্ত হ'য়ে বোসো তো।'

যা হোক, গাড়িতে উঠে অনেকটা যেন আরাম পেলো সুলেখা। অনেকটা নিরাপদ লাগলো।

'গাড়ির মধ্যে কোনো ভয় নেই, না ?'

'ভয় কী ?'

'কাচগুলো তুলে দিন।'

'থাক না, গরম লাগবে তোমার।'

'না, না, তুলে দিন।'

তুলে দিলেন।

'আপনার গাড়িতে পরদা ছিলো, তাই ভালো ছিলো। গাড়িটাও সুন্দর।'

'যদি ফিরে যেতে পারি, পাঠিয়ে দেবো গাড়িটা।'

'কেন?'

'তুমি ব্যবহার করবে।'

'অতো বড়ো গাড়ি! আমি ব্যবহার করবো?'

'দোষ কী।'

'তা কখনো হয়?'

'হয় না, না?'

'আপনি আমার সব কথায় দুঃখ পান কেন, বলুন তো।'

'আমার স্বভাব।'

'আমি কিন্তু তা চাই না।'

'চাও না?'

'না।'

'আমার ভাগ্য।'

এর পরে হঠাৎ দু-জনেই চুপ হ'য়ে গেলো, জানালার দু-পাশে তাকিয়ে রইলো মুখ ফিরিয়ে। দমদমের লম্বা-লম্বা রাস্তা বেয়ে চলতে লাগলো গাড়ি। এক মোড় থেকে আর-এক মোড়, এক রাস্তা থেকে আর-এক রাস্তা। এ-পাড়া আর সে-পাড়া। এখানকার সব পাড়াই সমান। মফস্বলের মেয়ে স্বলেখার কাছে সব রাস্তাই এক রাস্তা, সব রাস্তাই আলাদা। দু-চোখ মেলে দেখছে সে। শহর ঝিমিয়ে আছে,

নিঃসঙ্গ আলোগুলো একা-একা দাঁড়িয়ে জ্বলছে অবান্তর হ'য়ে। পথিক কই? কাকে পথ দেখাবে? সমস্তটা আবহাওয়ার মধ্যে যেন কী একটা আতঙ্ক লেখা হ'য়ে আছে দিকে-দিকে। সমস্ত অনুভূতি দিয়ে এটাই অনুভব করলো সুলেখা। যতোটুকু স্মৃতি আছে, আলোকিত কলকাতার জনবহুল মুখর রাস্তাগুলোর সঙ্গে আজকের রাস্তাগুলোর যেন মিল পেলো না কোনো। তবু এস্‌প্ল্যানেডে এসে একটু প্রাণের আভাস পাওয়া গেলো, বিজ্ঞাপনের আলোগুলো তেমনই জ্বলছে নিবছে, লোকজনও চলছে কিছু-কিছু, এ-পাড়ার সিনেমাগুলোও সচল।

'বালিগঞ্জ এখান থেকে আরো অনেক দূর, না?' মুখ না-ফিরিয়েই কথা বললো সুলেখা।

'তা তো একটু দূরই।' একটার পর একটা সিগারেট খাচ্ছেন সুলতান-সাহেব। টানছেন কম, ধরাচ্ছেন বেশি, ফেলে দিচ্ছেন আধখানার উপরে।

'বালিগঞ্জও খুব নির্জন, না?'

'এখনো কি তোমার ভয় কাটেনি?'

'না, কিসের ভয়?'

'সময় বড়ো দীর্ঘ লাগছে?'

'না।'

'মায়ের কথা ভাবছো?'

'না।'

'তবে কী?'

'অনেক রাত হয়েছে।'

'খুব আর কি।'

'আজ আর ফিরে যাওয়া হবে না।'

'কার ?'

'আপনার।'

'একেবারে বেহেস্তে যাবার ব্যবস্থা করবে বুঝি ?' আস্তে হাসলেন সুলতান-সাহেব। মুখ ঘুরিয়ে সুলতানের চোখের উপর চোখ রাখলো সুলেখা, সুলতান গড়ের মাঠের দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলেন।

অনেকক্ষণ আবার চুপচাপ। আবার দু-জনে দু-দিকে তাকিয়ে দেখছে।

গড়ের মাঠের অন্ধকার হারিয়ে গেলো, সেণ্টপল্স্ ক্যাথিড্রেলের চুড়ো ছাড়ালো, এলগিন রোড, জগুবাজার সব পেরিয়ে তীরবেগে দক্ষিণে ছুটে চললো গাড়ি। সুলতান-সাহেব তেমনি নিঃশব্দে মুখ ফিরিয়ে আছেন বাইরে।

সুলেখা উশখুশ করলো, অপেক্ষা করলো, তারপর আস্তে ডাকলো, 'সুলতান-সাহেব।'

'উঁ।'

'কী দেখছেন ?'

'দেখছি না।'

'কথা বলছেন না।'

'কী আর বলবার আছে।'

'কিচ্ছু নেই ?'

মুখ ফেরালেন, 'শোনো সুলেখা, আমি ভাবছি কী—'

'বলুন—'

'তোমরা হয়তো আর ফিরে যাবে না ওখানে, আমি গিয়ে তোমাদের বাড়িটা যাতে বিক্রি হয় তার চেষ্টা করবো।'

'সুলতান-সাহেব—'

'কিন্তু তার আগে নিশ্চয়ই খুব অসুবিধে হবে তোমাদের। যে-ভাবে

সব ছেড়ে চ'লে এসেছো—' কোটের পকেটে হাত ঢোকালেন, 'আমি অনুরোধ করছি—' হাসলেন, 'তার চেয়ে ভেবে নাও না যে, আজ তোমার কাছে একটা ভিক্ষাই চাইছি আমি—' ছোটো একটি মখমল বটুয়ার স্পর্শ লাগলো সুলেখার হাতে— 'দয়া ক'রে এটা রাখো, কিছুদিন তো চলুক। বাড়ি বিক্রি হ'লে সুদে আসলে সব শোধ ক'রে দিয়ো।' নিস্তব্ধ সুলেখার মুখের দিকে আবছা অন্ধকারে তিনি তাকালেন, 'রাগ করলে?'

সুলেখা চুপ।

'রাগ কোরো না, এই তো আমার শেষ আবদার।'

সুলেখা চুপ।

'প্রতিজ্ঞা করছি সমস্ত জীবনে আর আমি তোমাকে বিরক্ত করবো না। আর কোনোদিন দেখা করবার চেষ্টা করবো না।'

'বাড়িটা তো আমরা বিক্রি করবো না।' সুলেখার গলা গম্ভীর।

'ও।'

'সুতরাং ঋণ শোধ করাও সম্ভব হবে না।'

'ও।'

বটুয়াটি হাতের মুঠোয় তুলে নিলো সুলেখা, 'তা ব'লে ফিরিয়ে নিতেও দেবো না। আপনার আবদার থাকতে পারে, ভিক্ষা থাকতে পারে, আর আমার বুঝি কোনো অধিকার থাকতে পারে না?'

সুলতান-সাহেব হাসলেন, 'সবই তোমার রানীর মতো। এমন সুন্দর ক'রে কে নিতে পারতো আর। তোমার এই দয়া আমি ভুলবো না। কিন্তু বাড়িটা বিক্রি করবে না কেন? ফেলে রেখে লাভ কী? মিছিমিছি বেদখল হ'য়ে যাবে।'

'ফেলে রাখবো কে বললো।'

'ভাড়া দেবে ?'

'না।'

'তবে ?'

'নিজেরাই থাকবো।'

'নিজেরা ?'

'দাঙ্গা তো থেমেই গেছে, চ'লে যাবো আবার।'

'যাবে ?'

'কেন যাবো না।'

'ওখানে ? পাকিস্তানে ?'

'নিজের দেশ কেউ কি ছাড়ে ? ছাড়তে পারে ?'

সুলেখার চোখের উপর চোখ রাখলেন সুলতান।

'আর যে-দেশে এই মানুষ আছে।' সুলেখার গলা গাঢ় হ'য়ে এলো।

সুলতান তেমনি চুপচাপ তাকিয়ে রইলেন।

সুলেখা মৃদু হাসলো। একটু লঘু করলো আবহাওয়াটা, 'দরকারি কথা শুনুন, আমার দাদামশায়, মানে মায়ের কাকা অতিশয় সদাশয় সজ্জন মানুষ। তাঁর স্ত্রীও সে-রকমই। তাঁর বাড়িতে দু-চারদিন যা হয় ঘুরে-ফিরে স্বাধীনভাবে থেকে তারপর আপনার সঙ্গেই আমরা ফিরে যাবো ওখানে।'

'আমার সঙ্গে ?'

'তবে আর কার সঙ্গে।'

'পরিহাসপটুতা মস্ত গুণ সুলেখা। স্বীকার করছি তোমার সে-গুণ আছে।'

'পরিহাস ব'লে মনে হচ্ছে ?'

'তা ছাড়া আর কী ব্যাখ্যা আছে এ-কথার।'

'আশা করি প্রমাণটাই বড়ো ব্যাখ্যা হবে।'

গাড়ি রসা রোড ছাড়িয়ে মোড় ফিরে রাসবিহারী অ্যাভিনিউতে পড়লো।

'শুনুন।'

'বলো।'

'আজ কিন্তু আপনার ফেরা হবে না।' গলাটা ভারি শোনালো।

সুলতানের গলাও একটু ভার মনে হ'লো বৈকি, 'শুধু আজ কেন, হয়তো কোনোদিনই আর হবে না।'

'আমি ঠাট্টা করছি না।'

'আমিই কি ঠাট্টা ভাবছি?'

'এ-রকম বললে কারো ভালো লাগে?'

'না-লাগার কারণ নেই। শত্রুনিধন কে না ভালোবাসে? আমি নিজেও এবার বিশ্রাম চাই, বিরাম চাই, অবসান চাই।'

'নিজের ইচ্ছের উপর তো অনেকদিনই আসক্ত রইলেন, অন্যের ইচ্ছেরও যে কিছু মূল্য আছে সেটা ভাবলে দোষ কী?'

'অন্যের ইচ্ছেটাই এখন নিজের ইচ্ছে ব'লে মনে হচ্ছে। আমার তো কোনো নিজস্ব ইচ্ছে নেই।'

'তাই কি?'

'আমার কথা তুমি কোনোদিনই বুঝবে না সুলেখা। ও-সব থাক।' সুলতান রাস্তায় মুখ বার করলেন। নম্বর লক্ষ্য করতে লাগলেন প্রতি বাড়ির দরজায়। একটু পরেই পাওয়া গেলো বাড়ি, গাড়িটা কঁ্যাচ ক'রে থেমে গেলো।

একতলা ছোট্টো বাড়ি। একটু বারান্দা আছে রাস্তার উপরে। ঘরের জানালাগুলো বন্ধ, ফাঁকে-ফাঁকে আলোর রেখা। বোঝা গেলো,

অধিবাসীরা এখনো জেগে আছে। গাড়ির দরজাটা খুলে দিলেন সুলতান-সাহেব। আশ্চর্য! উদ্দাম আনন্দে হুড়মুড়িয়ে নেমে গেলো না সুলেখা। চুপ ক'রে থেকে বললো, 'আপনি!'

'আমি আর নামবো না, তুমি দরজায় নক করো, ওঁরা খুলে দিলেই আমি নিশ্চিন্ত মনে যেতে পারবো।'

'গাড়ি ছেড়ে দিন, নামুন।'

'বুঝতে পারছো না, গাড়িটা ছেড়ে দিলে এতো রাতে আবার পাওয়া কঠিন হবে। আমি ওকে আসা-যাওয়ার চুক্তি ক'রেই নিয়ে এসেছি।' ঘড়ি দেখছেন সুলতান-সাহেব, 'খুব তাড়াতাড়ি ছোটালে নেকস্ট্ প্লেনটা পেয়ে যাবো।'

'আজ আপনার যাওয়া হবে না।'

'তা কখনো হয়?'

'আমি আপনাকে আজ কিছুতেই ফিরে যেতে দেবো না।'

'পাগল।'

'যা খুশি বলতে পারেন।'

'আমার না-ফিরলেই নয় সুলেখা।'

'আপনি এখন আমার অতিথি, আমার অধীন, এতোদিন কি আমার ইচ্ছেমতো আমি আসতে পেরেছি আপনার ওখান থেকে?'

'তোমার কি ধারণা, আমার ইচ্ছেয় তুমি এসেছো?'

'নিশ্চয়ই।'

'আমার কাছ থেকে তুমি চ'লে যাবে, সে-ইচ্ছে কি আমার মৃত্যুতেও সম্ভব?'

'তবে নিয়ে এলেন কেন?'

'তোমার সুখের জন্য।'

'আমার সুখটাই সব?'

'সব।'

'তা হ'লে এটাই বা নয় কেন?'

'কী?'

'চ'লে গেলে আমি যদি কষ্ট পাই—' থেমে গেলো সুলেখা।

মুহূর্তকাল সুলতান-সাহেবও চুপ ক'রে রইলেন, মৃদু হেসে বললেন, 'এ-কষ্ট তোমার আমার জন্য নয় সুলেখা, এটা একজন মানুষের প্রাণের জন্য আর-একজন মানুষের একটা স্বাভাবিক মমতা। তুমি নিশ্চয়ই বুঝেছো, বিপদ আমাকে চারদিক থেকে বেড়াজালের মতো ঘিরে ধরেছে, তার জন্য তোমার এই সতর্কতা নেহাৎ নৈর্ব্যক্তিক। আমি না-হ'য়ে অন্য যে-কেউ হ'লেও মন তোমার এ-রকমই ব্যাকুল হ'তো।'

এ-কথার কোনো জবাব দিলো না সুলেখা, মুখ ফিরিয়ে ব'সে রইলো চুপ ক'রে।

সুলতান বললেন, 'নামো।'

'না।'

'কী মুশকিল।' একটু থেমে, 'তুমি কি সত্যিই আমার জন্য উদ্বিগ্ন হচ্ছো?'

'সাক্ষীসাবুদ যখন নেই, তখন আর—'

সস্নেহে হাসলেন সুলতান-সাহেব, 'একেবারে মিছিমিছি। এই ট্যাক্সির মধ্যে কে আমাকে দেখছে? আর দেখলেও কে চিনছে হিন্দু না মুসলমান? তা ছাড়া, রাস্তায়-রাস্তায় কী-রকম পুলিশের গাড়ি পাহারা দিচ্ছে তা তো আসতে-আসতে নিজের চোখেই দেখে এলে।'

'যুক্তিতর্ক থাক না—'

আস্তে দরজা খুলে গেলো একতলার। ঢোলা পাজামা আর পাঞ্জাবি

পরা একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। ট্যাক্সি দেখে অনুসন্ধিৎসু হ'য়ে নামলেন দু-সিঁড়ি।

গাড়ির ভেতরে অবুঝ হ'য়ে উঠলো সুলেখা, 'আর আমি বেশি বলতে পারছি না, আজ না, আজ যাওয়া হবে না আপনার, আজ আমি যেতে দেবো না, কিছুতেই না—'

অগত্যা নামলেন সুলতান-সাহেব। তাঁর সুদীর্ঘ সুন্দর চেহারার দিকে মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকালেন ভদ্রলোক। গম্ভীর গলায় বললেন, 'কাকে চান?'

দ্রুতপায়ে এগিয়ে এলো সুলেখা, রুদ্ধস্বরে বললো, 'আমি। আমি, দাদামশায়।'

নিয়মের চারগুণ ভাড়া নিয়ে পবনবেগে গাড়ি ছোটালো শিখ ড্রাইভার। একটু দূরে এসেই থামলো। হাঁপাতে-হাঁপাতে ঊর্ধ্বশ্বাসে গাড়ি থেকে নেমে একটা আলোর থামের উপর ছোটো একটি পেতলের ডাণ্ডা দিয়ে নিয়মিত ছন্দপাতে কয়েকটি আঘাত করলো। খুব জোরেও না, খুব আস্তেও না। কিন্তু সেই শব্দের অনুরণন ছড়িয়ে গেলো অনেক দূরে। দূর থেকে দূরান্তরে। সাংকেতিক শব্দ।

অপেক্ষা করতে হ'লো না, কয়েক মিনিটের মধ্যেই এ-গলি ও-গলি থেকে নিঃশব্দে বেরিয়ে এলো কতগুলি লোক, এ-বাড়ি ও-বাড়ির বারান্দায় ঝুঁকে পড়লো কতগুলো মুখ। ড্রাইভার ফিশফিশ করলো, 'মুসলমান, মুসলমান।'

'কোথায়, কোথায়?' রক্তলোলুপ বাঘের মতো হিংস্র হ'য়ে উঠলো লোকগুলোর চোখ-মুখ।

'হিন্দু-বাড়িতে ঢুকেছে। জলদি চলো।'

যে-ক'জন ধরে ঠেসে ভ'রে নিলো গাড়িতে। একটু আগে যেখানে স্থলেখা আর স্থলতানকে নামিয়ে দিয়েছিলো, গাড়ি নিয়ে ড্রাইভার আবার ফিরে এলো সেখানে। ঝপাঝপ নেমে পড়লো সব, তারপর ধাক্কা দিলো দরজায়। ভেতর থেকে মোটা গলায় প্রশ্ন এলো, 'কে!'

'খুলুন।'

দরজাটা কিন্তু খুললো না, একটা জানালা খুলে পরদা সরিয়ে বাইরে তাকালেন স্থলেখার দাদামশায়। জানালা দিয়ে লোকগুলো ঘরের ভেতরে তাকালো, উজ্জ্বল আলোর তলায় তার চেয়েও উদ্ভাসিত কয়েকখানা মুখ। স্থলেখা, তার মা, তার ভাইয়েরা আর একখানা আনন্দিত মুখ বাইরের জনতার দিকে তাকিয়ে যেন ঈষৎ নিষ্প্রভ হ'লো। স্থলতান-সাহেব চমকে উঠলেন। স্থলেখার দাদামশায়ের পাশে তাঁর স্ত্রী এসে দাঁড়ালেন, তীক্ষ্ণ গলায় বললেন, 'কী চান আপনারা?'

স্থলেখার মা বললেন, 'কে কাকিমা?'

চকিতে ঘরের ভিতরকার কয়েক জোড়া চোখই জানালার ও-পিঠে পিছলে গেলো। একটা লোক একটা পা রাস্তায় রেখে আর-একটা পা উঁচু বারান্দায় তুলে দিয়ে অশ্লীল ভঙ্গিতে বললো, 'দরজাটা কাইণ্ডলি খুলুন না, যা চাই তখুনি তা বুঝে যাবেন।'

দাদামশায় ভুরু কুঁচকোলেন, 'আপনাদের কথা আমি কিছু বুঝতে পারছি না।'

'পারবেন, পারবেন, ঠিক পারবেন। দরজাটা খুললেই পারবেন।'

'কারণ না-জেনে আমি এতো রাত ক'রে দরজা খুলে দেবো না।'

'দিতেই হবে, আমরা যখন এসেছি তখন কি আর আপনি ফিরিয়ে দিতে পারবেন।'

'আপনারা কি আমার সঙ্গে ইয়ার্কি করছেন ?'

জিভ কেটে দুই হাত কপালে ঠেকালো একটা লোক বিনীত ভঙ্গিতে, একটু এগিয়ে এসে বললো, 'লজ্জা দেবেন না স্যর। আপনারা হলেন সব নমস্য ব্যক্তি, আপনাদের সঙ্গে কি কখনো ইয়ার্কি চলে ? তবে রাত ক'রে যখন এসেই পড়েছি তখন ফয়সালা একটা ক'রেই যাবো। গুরুদেবের আশীর্বাদে এস্‌পার-ওস্‌পার না-দেখে এই অধীন কখনো পিছু হটেনি।'

'আপনার নাম কী ?'

'সেটা শুনলে কি আপনার ভালো লাগবে ?'

'বলুন না।'

'এককালে বাপ-মা আদর ক'রে মণিলাল রেখেছিলো, এখন সবাই খুনিলাল ব'লেই জানে।'

চমকে উঠলেন দাদামশায়, 'খুনিলাল!' গলাটা কেঁপে গেলো, 'আপনি— আপনি এখানে কী চান ?'

'আলাপ করতে আসিনি, কাজ করতে এসেছি।'

'কাজ! এখানে কী কাজ ?'

'তা দেখতেই পাবেন। দেরি ক'রে লাভ নেই, শিকারের গন্ধ পেলে বাঘ কি কখনো স্থির থাকতে পারে দাদা ? বাকবিতণ্ডা না-ক'রে দরজা খুলে দিন।'

'যদি না খুলি ?'

'ভেঙে ঢুকবো।'

'যতো বড়ো নাম-করা গুণ্ডাই তুমি হও,' রাগে হাত মুঠো করলেন দাদামশায়, 'আমি তোমাকে ভয় পাই না, আমার বাড়ির দরজা আমি তোমাকে কখনোই খুলে দেবো না।'

'দিতেই হবে।'

'ভয় দেখাচ্ছো? তুমি কি মনে করো, তোমাদের মতো কতগুলো পশুর হুংকারে আমি এতটুকু ভ্রূক্ষেপ করি?'

'করেন কি করেন না, এখুনি দেখতে পাবেন। বাদলা—'

সাতদিনের বাসি দাড়ি নিয়ে একটা অল্পবয়সি ছোকরা এগিয়ে এলো কাছে।

'না, না, না!' গর্জন ক'রে উঠলেন দাদামশায়, 'কিছুতেই না, কিছুতেই না, কিছুতেই আমি দরজা খুলে দেবো না। কী করতে পারো, করো।'

'আমরা সব করতে পারি। কতো যে পারি, পাড়ায় থাকেন, জানেন না?'

'খুব ভালো ক'রে জানি। হল্লা ক'রে তাকে আর বেশি ফলাও কোরো না। দেশে আইন আছে, পুলিশ আছে—'

'আছে নাকি?'

'হ্যাঁ, আছে। আমি পুলিশ ডাকবো।'

'ডাকুন না। বুক ফুলিয়েই বলছি, কোনো ব্যাটা পুলিশের বাপেরও সাধ্যি হয়নি খুনিলাল পোদ্দারের গায়ে হাত ছোঁয়ায়।'

'আজ হবে। আজ তুমি দেখবে পাপের কী ফল।'

'দরজাটা খুলে দিন, ভেঙে ফেললে লাভ হবে কী?'

'হবে কি হবে না তা আমি দেখাচ্ছি তোমাকে। বদমায়েস, গুণ্ডা—' দাদামশায় হন্তদন্ত হ'য়ে যেন কী না কী করবেন এইভাবে ঠাশ ক'রে বন্ধ ক'রে দিলেন জানালাটা। চুল টানতে-টানতে চ'লে এলেন ঘরের মাঝখানে, রুদ্ধশ্বাসে চাপা গলায় বললেন, 'সর্বনাশ! সর্বনাশ হয়েছে!'

সে-কথা কি আর বুঝতে বাকি আছে কারো?

নীল হ'য়ে আছে সব। সবাই নিথর হ'য়ে আছে।

'তবে ? তবে কী হবে ?' অস্থির বেগে উঠে দাঁড়ালেন সুলেখার মা। দরজায় ধাক্কা শোনা অবধি প্রাণ তাঁর ধুকপুক করছিলো। কাল বিকেলে, এই তো এখানে, এই রাস্তাতেই তো কী কাণ্ড! জজবাবুর বাড়ির এতো-দিনের পুরোনো খানসামাটা অল্প বয়স থেকে এ-পাড়ার দাদা-চাচা হ'তে-হ'তে যে-লোকটা বুড়ো হ'লো, এমন কেউ ছিলো না যে তাকে না চেনে, না জানে, না ভালোবাসে ; কিভাবে তাকে টেনে নিয়ে এলো! এই তো, এই লোকটাই তো। শাদাসিধে লিকলিকে চেহারা, মুখভর্তি পান। হাসছিলো দাঁত বার ক'রে। বাতে বৃদ্ধ জজবাবু নেমে এলেন কাঁপতে-কাঁপতে, চীৎকার, চ্যাচামেচি, গালিগালাজ, হাতে পায়ে ধরা কিছুই বাদ দিলেন না ভদ্রলোক। তাঁর স্ত্রী এলেন, ছেলেমেয়েরা এলো, দুই জামাই এলো, আর সকলের সামনে— ইশ। রক্তে ভেসে গেলো রাস্তাটা, মরণান্ত আর্তনাদটা ভাসতে লাগলো বাতাসে, জজবাবু অজ্ঞান হ'য়ে প'ড়ে গেলেন, বাড়িসুদ্ধু সব লোক— ভাবতে-ভাবতে দাঁত লেগে এলো সুষমা দেবীর।

'যা, যা, ওঁকে নিয়ে ভিতরের ঘরে চ'লে যা তোরা। দেরি করিসনে। তারপর আমি দেখছি। লেখা, ওঠ, উঠে দাঁড়া—' দাদামশায়ের গলা যতো দ্রুত ততো উত্তেজিত, স্ত্রীর দিকে তাকালেন তিনি, 'হাঁ ক'রে দেখছো কী, শিগগির যাও। যা, সুষমা—'

'না, আমি যাবো না, যেতে পারবো না,' কেঁদে ফেললেন সুলেখার মা, 'তুমি যে ক'রে পারো ঠেকাও, আমি দাঁড়িয়ে থাকি এখানে, আগে আমাকে মারুক—' দৌড়ে এলেন সুলতানের কাছে, দৌড়ে দরজার কাছে গেলেন।

সুলেখা ব'সে আছে ; স্তব্ধ, স্থির। চোখের পলক তার নড়ছে না, কেবল ঠোঁটটা কাঁপছে।

সুলতান-সাহেব তাকিয়ে দেখলেন তাকে, তারপর তার মায়ের দিকে

তাকালেন। সুলেখার নিষ্ঠাবতী হিন্দু বিধবা মা। এই? তাকিয়েই রইলেন। মনে পড়লো এই মাকে দেখাবার জন্যই একদিন বালিকা সুলেখা তাঁকে হাতে ধ'রে বাড়ির ভিতরে নিয়ে যেতে চেয়েছিলো। এই মাকে উপলক্ষ ক'রেই একদিন তাঁর হৃদয়ে সমস্ত হিন্দু জাতটার উপর দাবানল জ্ব'লে উঠেছিলো, কতো দুঃখ বেদনা অপমান অসম্মানে খণ্ডবিখণ্ড হ'য়ে গিয়েছিলো। আর আজ এই মায়ের কাছেই ঘুরে-ফিরে সে চিরদিনের জন্য বিশ্রাম নিতে এসেছে। তাঁর চোখের তলায় ঘুমিয়ে পড়তে এসেছে। দেখতে এসেছে সন্তানের মৃত্যুতে মায়ের কতোখানি শোক। মা, মা, আম্মা, আম্মু— মনে-মনে ডেকে উঠলেন তিনি। মনে-মনে ক্ষমা চেয়ে বললেন, আমি ভুল করেছিলাম, ভুল বুঝেছিলাম, আধখানা দেখে আমি সবটার উপর অবিচার করেছিলাম, আজ বুঝতে পারলাম সেই ভুলের দাম দিতেই খোদা আমাকে পাঠিয়েছেন এখানে।

দরজায় বড়ো-বড়ো আঘাত পড়লো। সহসা সব ঝেড়ে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালো সুলেখা, এক হ্যাঁচকা টানে সুলতানকে নিয়ে দৌড়ে চ'লে এলো ভিতরের ঘরে। দাদামশায় মুহূর্তকাল নিস্তব্ধ থেকে আবার জানালাটা খুলে সামনে এসে দাঁড়ালেন। 'তবু ধাক্কাধাক্কি করছো তোমরা?' কপালের শিরা মোটা হ'য়ে ফুলে উঠেছে, পিঠের গেঞ্জিটা জবজব করছে, পাঞ্জাবির হাতটা গুটোতে-গুটোতে বললেন, 'আমি তো বলেছি, তোমাদের আমি কিছুতেই ভিতরে ঢুকতে দেবো না।'

'কেন দেবেন না, দিতেই হবে।'

'বাড়ি কি আমার, না তোমাদের?'

'যারই হোক, এ-বাড়িতে যখন মুসলমান লুকিয়েছে, তখন আমরা ঢুকবোই, শালার বাচ্চাকে দেখে নেবো একবার।'

'বাজে কথা বোলো না। তোমাদের মতো কতোগুলো লোফারকে

কোনো কারণেই আমি দরজা খুলে ভিতরে আসতে দেবো না। আমি মনে করি তাতে বাড়ির মহিলাদের অসুবিধে হবে।'

'ও, মুসলমান পুরুষ নিয়ে শোবার ঘরে লুকিয়ে থাকলে বুঝি তাদের কোনো অসুবিধে হয় না?'

'খবর্দার! দাঁত ভেঙে দেবো কোনো কুৎসিত কথা উচ্চারণ করলে।'

'ঘরে আমরা ঢুকবোই।'

'জুলুম পেয়েছো?'

'জোর বলুন, জুলুম বলুন ঢুকতে আমাদের দিতেই হবে। আমরা জানি আপনি ঘরের মধ্যে মুসলমান লুকিয়ে রেখেছেন।'

'কী বলছো তোমরা?' আকাশ থেকে পড়লেন তিনি— 'এখানে কোথা থেকে মুসলমান আসবে? মানুষ খুন ক'রে-ক'রে কি উন্মাদ হ'য়ে গেছো সবাই?'

'মাথা আমাদের খুবই ঠাণ্ডা আছে, দরজাটা খুলুন, দেখিয়ে দিই আছে কি নেই।'

'আমি বলছি, নেই।'

'আছে, আছে—'

'অসম্ভব।'

'সেই অসম্ভবটাই আপনি সম্ভব করেছেন।'

গলা নরম করলেন দাদামশায়, 'ছাখো, আজ দশ বছর আমি এ-পাড়ায়, এই একই বাড়িতে আছি। হয়তো তোমাদের মধ্যে কেউ-কেউ আমাকে চেনোও, তোমরাই বলো আমি কেন ঘরের মধ্যে একজন মুসলমান লুকিয়ে রেখে অনর্থক মিথ্যে কথা বলবো।'

'কেন বলবেন তার আমরা কী জানি। হিন্দুদের রক্ত কি রক্ত? না কি তাদের কোনো মেরুদণ্ড আছে?'

'থাকলেই কি মানুষ খুন করতে হবে ?'

'মানুষ কাকে বলছেন ? মুসলমানেরা মানুষ ? মানুষ হ'লে এ-রকম করে ?'

'তারা অমানুষ হ'য়ে যা করছে, তোমরা মানুষ হ'য়ে তা করছো কেন ?'

'বক্তৃতা রাখুন। প্রতিশোধ আমরা নেবোই।'

'কার উপর নেবে ? আসল দোষীকে পাবে কোথায় ?'

'তর্ক করতে আসিনি, এই শালার জাত আমরা নির্বংশ করবো।'

'আমার একটা কথা শোনো—'

'দরজা খুলুন।'

'আমি বলছি শোনো—'

'দরজা খুলবেন কিনা বলুন।'

'না, খুলবো না, য্‌ যাও !'

'খুলতেই হবে।'

'না।'

'দরজা ভেঙে ফেলবো।'

'ভাঙো, দেখা যাক তোমাদের কতো শক্তি।'

সঙ্গে-সঙ্গে প্রায় দশ জোড়া পায়ের লাথিতে থরথর ক'রে কেঁপে উঠলো দরজা। ধাক্কার বেগে উপর থেকে ছিটকিনিটা খ'সে পড়লো। দাদামশায় দৌড়ে এসে কপাটের দুই পাটে দুই হাত রেখে দাঁড়ালেন, অবিচলিত গলায় বললেন, 'এ-খবর তোমাদের কে দিয়েছে ?'

'যে-ই দিক, আমরা জানতে পেরেছি।'

'ভুল জেনেছো।'

'বেশ তো, সেই ভুলটা আপনি ভেঙে দিন না।'

'কেমন ক'রে ?'

'ঘরে ঢুকতে দিয়ে, দেখতে দিয়ে।'

'যদি তোমাদের অনুমান অসত্য ব'লে প্রমাণিত হয়?'

'সেটা পরের কথা—'

'না, সেটাই আগের কথা। তোমরা জানো, রাত বারোটায় একটা উড়ো খবর নিয়ে এসে কোনো ভদ্র গৃহস্থের বাড়িতে ঢুকে হামলা করা আইনবিরুদ্ধ।'

'রেখে দিন আপনার আইন।'

'কেন রেখে দেবো? এ-অপরাধ খুব সোজা নয়।'

'সহজ হোক কঠিন হোক আমরা দেখবোই।'

'না।'

'হ্যাঁ।'

'না।'

'হ্যাঁ।'

'কক্ষনো আমি তোমাদের ঢুকতে দেবো না।'

'দিতেই হবে।'

'না।'

'হ্যাঁ।'

'আমি বলছি না।'

'আমরা বলছি হ্যাঁ।'

'এতোগুলো লোক আমরা বাড়িতে আছি, চেহারা দেখেই তোমরা বুঝে নেবে, কে হিন্দু আর কে মুসলমান? এতো ওস্তাদ তোমরা?'

'আজ্ঞে, হ্যাঁ। আমরা এতোই ওস্তাদ।'

দাদামশায় দিশাহারা চোখে চারদিকে তাকালেন। ঘণ্টায়-ঘণ্টায় পুলিশের গাড়ি টহল দেয়, এখন কি একটা এসে পড়তে পারে না? ফোন

করতে পারলে কাজ হ'তো। নিজের ফোন নেই, আশেপাশেও কারো নেই। মারামারির হিড়িকে শহরটা সন্ধে থেকেই ম'রে থাকে, এখন তো মধ্যরাত। কোনো দোকানে-টোকানে খোঁজ করলে হয়তো মিলতো। কোথায় দোকান! কতো লোকের বাড়িতে পিস্তল থাকে, তাঁর তা-ও নেই। কী দিয়ে ঠেকাবেন এঁদের? এই উত্তেজিত লোকগুলোকে কী দিয়ে ঠাণ্ডা করবেন? এই নেকড়েগুলো তবে সত্যিই কি টেনে নিয়ে যাবে মানুষটাকে? নবাবগঞ্জের নবাব কাজি সুলতান আমেদকে? কাজি আখতার আমেদের ছেলেকে? ঋষিতুল্য আমিরআলি-সাহেবের নাতিকে তাঁর বাড়ি থেকে? কী-রকম যে লাগলো, কী যে তিনি করবেন বা করতে পারেন কিছুই ভেবে পেলেন না।

একটু পিছনে সুলেখার মা দাঁড়িয়ে আছেন নিস্পন্দ ছবির মতো। চোখে তাঁর পলক নেই, দেহে সাড় নেই। হয়তো ঈশ্বরকে ডাকছেন। হয়তো সন্তানতুল্য মানুষটির জন্য, কিংবা সন্তানের চেয়েও এই মুহূর্তে যাকে বেশি মনে হচ্ছে তার জন্য নিজের প্রাণ পণ করছেন বিধাতার পায়ে। আর তার পিছনে দাদামশায়ের স্ত্রী।

•

'সুলেখা।' ভিতরের ঘরে ব'সে সুলতান অস্পষ্ট হাসলেন।

সুলেখা অস্থির হায়েনার মতো এদিক থেকে ওদিক হেঁটে বেড়াচ্ছে ঘরের খাঁচায়। বিন্দু-বিন্দু ঘাম দেখা দিয়েছে কপালে, গাল দুটো লাল, চোখের দৃষ্টি বড়ো-বড়ো। কাছে এসে দাঁড়ালো।

'সত্যি-সত্যি তা হ'লে আর আমাকে ফিরে যেতে দিলে না, কী বলো?'

সুলেখা দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ালো, রক্ত জ'মে গেলো।

'শান্ত হ'য়ে বোসো, এইমাত্র এসে একটু ঠাণ্ডাও হ'তে পারলে না।'

সুলেখার নিশ্বাস ক্রমেই দ্রুত হচ্ছে।

'হাজার ভালোবেসেও তোমাকে সুখ দেবো, শান্তি দেবো এমন ভাগ্য আমার নয়। যতোদিন ওখানে ছিলে শুধুই কষ্ট পেয়েছো, আজ আমার কলজে উপড়ে আমি আমার কাছ থেকে তোমাকে বিচ্ছিন্ন ক'রে এনেও সেই কষ্টই দিচ্ছি। আমার অস্তিত্বটাই তোমার পক্ষে অমঙ্গলের।'

সুলেখা তাকিয়ে আছে স্থির দৃষ্টিতে।

'কী দেখছো ?'

'আপনাকে।'

'আমাকে !' সুলতান হাসলেন, 'হঠাৎ ?'

'যা-কিছু সুন্দর, যা-কিছু মূল্যবান তা তো মানুষ হঠাৎই দেখতে পায়।'

'সুন্দর ? মূল্যবান ?'

'কিন্তু এখন আমি কী করি বলুন তো ?'

'বিচলিত হচ্ছো কেন ? ব্যাপারটা তো ভালোই।' সুলতানের মখমল-গভীর গলা আরো গভীর হ'লো, 'মৃত্যুকে আর কে কবে ঠেকাতে পেরেছে। কোনো-না-কোনো রন্ধ্র দিয়ে সে তো আসবেই একদিন। আমি জানতাম দরজাগুলো খুলে গেছে, শুধু কোন দরজা দিয়ে ঢুকবে সেটুকু জানতেই বাকি ছিলো।'

'সুলতান-সাহেব, এ-সব— এ-সব আপনি কী বলছেন ? শত হ'লেও আমি তো একটা মানুষই, আমি তো পাথর নই—' সুলেখা একেবারে ভেঙে পড়লো সুলতান-সাহেবের পায়ের কাছে।

ততোক্ষণে দাদামশায়কে ঠেলে জোর ক'রে জনকয়েক লোক ঢুকে পড়লো ঘরের মধ্যে— 'কোথায় ? কোথায় রেখেছেন ? দিন, বার ক'রে দিন !'

দাদামশায় তাঁর পঞ্চাশ বছরের আধপাকা চুলে-ভরা মাথাটা ঝেঁকে বয়সের তুলনায় বলিষ্ঠ শরীরে সোজা হ'য়ে দাঁড়ালেন, বজ্রের মতো গলায় বললেন, 'আর এক পা এগোবে না।'

কোথা থেকে কয়লা-ভাঙা হাতুড়ি আর বঁটি নিয়ে ছুটে এলো বাবু-ছোটু, 'শেষ ক'রে ফেলবো, একেবারে শেষ ক'রে ফেলবো।'

'কোথায় ? কোথায় রেখেছেন বলুন ?' তারা কতোটুকু পরোয়া করে এইসব ছেলেমানুষি হুমকিকে !

ভগ্নকণ্ঠে দাদামশায় বললেন, 'হাজারবার বলছি এখানে কেউ নেই। তবু তোমরা বিশ্বাস করবে না ?'

সুলেখার মা কেঁদে উঠলেন, 'তোমরা বলছো কী বাবা ? কেন অমন করছো ? তোমরা তো মানুষ, তোমাদের তো একটা হৃদয়-মন ব'লে পদার্থ আছে। এ-সব কী ?'

'রেখে দিন হৃদয়-মন। ঐ দোহাই অনেককাল শুনেছি, অনেকদিন মেনেছি, আর নয়।'

'আপনি সরুন।' একটা অল্পবয়সি ছেলে ঠেলে সরিয়ে দিলো সুলেখার মাকে।

'দিন, বার ক'রে দিন।'

'কী বার ক'রে দেবো ?'

'বেশি চালাকি করবেন না।'

'চালাকির কী দেখছো ?'

'কী দেখছি সবই বুঝতে পারবেন। হিন্দু হ'য়ে অন্দরে মোছলমান লুকিয়ে রাখেন, আবার লম্বা-লম্বা কথা !'

'তোমরা কি জোর ক'রে ঘরে ঢুকবে ?'

'নিশ্চয়ই।'

'কক্ষনো না।'

'শক্তি থাকে তো ঠেকান না।'

'ঠেকাবোই তো।'

'এই বিশে, যা তো, ঢুকে পড় তো ভেতরে, টেনে আন তো সেই মোছলমানের বাচ্চাকে, একবার দেখে নিই।'

দু-হাত বিস্ফারিত ক'রে ভিতরে দরজায় পিঠ রেখে সমস্ত শক্তি নিয়ে রুখে দাঁড়ালেন দাদামশায়। কিন্তু কে কার কথা শোনে। লোকগুলো চ্যাঁচামেচি ক'রে, জিনিসপত্র উল্টিয়ে, লাথি মেরে, ভেঙে-চুরে মুহূর্তে একেবারে তছনছ ক'রে দিলো সাজানো ঘরখানা। বাবু-ছোটু উদ্‌ভ্রান্ত হ'য়ে আঘাত করলো একটা লোককে, এক চড় খেয়ে ঘুরে প'ড়ে গেলো। ক্ষিপ্ত কুকুরের মতো রক্তক্ষুধিত মানুষ নামক কয়েকটি জীব এর পরে সুলেখার দাদামশায়কে আক্রমণ করলো। একটা ধস্তাধস্তির শব্দ আর মাঝে-মাঝে দু-জন স্ত্রীলোকের আতঙ্কিত আর্তনাদ ছাড়া কয়েকটা মিনিট আর-কিছু শোনা গেলো না।

বড়ো-বড়ো নিশ্বাস টানতে-টানতে টলতে-টলতে উঠে দাঁড়ালেন সুলতান। তৎক্ষণাৎ তাঁকে টেনে বিছানার উপর বসিয়ে দিলো সুলেখা।

'আমি একবার যাবো ও-ঘরে।'

'না।'

'কী আশ্চর্য!'

'না।'

'তুমি শুনতে পাচ্ছো না, কী-রকম গোলমাল হচ্ছে।'

'না।'

তবু আবার উঠে দাঁড়ালেন, 'সে হয় না। কিছুতেই না। আমাকে যেতেই হবে।'

'না, না, না।' ঝড়ের বেগে নিজেই বেরিয়ে গেলো সুলেখা। চৌকাঠ পার হ'য়ে, বারান্দা পার হ'য়ে, তীক্ষ্ণ তলোয়ারের মতো এ-ঘরে এসে দাঁড়ালো, 'কী, কী চাই তোমাদের? ঘরের মধ্যে কী চাইছো তোমরা? কুকুরের দল, শুয়োরের পাল! বদমায়েস, ইতর, গুণ্ডা, ভদ্রলোকের বাড়িতে তোমরা কিসের জন্য বিনা অনুমতিতে ঢুকে এ-রকম হল্লা লাগিয়েছো?'

গলা চিরে অদ্ভুত চীৎকার বেরুলো তার, দুই চোখে আগুন ফিনকি দিয়ে উঠলো, নাসারন্ধ্র একবার ফুলতে লাগলো, একবার নিবতে লাগলো। রুক্ষ চুলে, লুটিয়ে-পড়া খোলা বেণীতে, লাল টুকটুকে দামি শাড়ির বিস্রস্ত আঁচলে, উদ্‌ভ্রান্ত চেহারায় ভীষণ দেখালো তাকে। একাই অতোগুলো লোকের মধ্যে রুষে ফুঁসে সহস্র নাগিনীর ফণা বিস্তার ক'রে থমকে দিলো সকলকে। গুণ্ডার দল তাকিয়ে থেকে একটু যেন হঠলো। সুলেখা গোরুর পালের মতো তাদের তাড়িয়ে নিয়ে গেলো বাইরের দরজার কাছে, 'লোফার, স্কাউণ্ড্রেল, ভেড়ার ঝাড় সব, শেয়াল-কুত্তার অধম, বীরত্ব ক'রে মুসলমান খুঁজতে এসেছো ভদ্রলোকের বাড়িতে? ছোটোলোক!'

দরজার ধারে গিয়ে একটা লোক তেরিয়া হ'য়ে দাঁড়ালো, 'যা-তা বলবেন না!'

'আবার কথা!' শাবকরক্ষী বাঘিনীর মতো গর্জন উঠলো গলায়, 'জুতিয়ে মুখ ছিঁড়ে দেবো।' রাস্তায় আঙুল দেখালো, 'বেরোও, বেরোও বলছি, ঐ যে ঐখানে, ঐখানে গিয়ে যতো খুশি ঘেউ-ঘেউ করো।'

'যদি না যাই কী করতে পারেন?' সকলের পিছন থেকে এগিয়ে এলো বাবরিচুল, ডোরাকাটা শার্ট গায়ে একটি ছেলে। মুখের বিড়িতে

শেষ টান দিয়ে একেবারে সুলেখার মুখোমুখি দাঁড়ালো আস্তিন গুটিয়ে। সঙ্গে-সঙ্গে উন্মত্ত বেগে তার গালে ঠাশ ক'রে একটা চড় কষিয়ে দিলো সুলেখা, দাড়িভরা বসা গালে পরিষ্কার ফুটে উঠলো তার দাগ। ঠেলে এক ধাক্কায় তাকে চৌকাঠ থেকে বারান্দায় ফেলে দিলো। কিন্তু মাত্রই তো একজন নয়, তৎক্ষণাৎ আর-একজন রক্তচক্ষু এগিয়ে বুক ঠুকে দাঁড়ালো। এর পর লাথিতে ঘুষিতে, আঁচড়ে কামড়ে সুলেখা কাকে যে ক্ষতবিক্ষত করলো আর করলো না, হিসেব রইলো না কোনো। ঘরের মধ্যে হাতের কাছে যা পেলো, যতোটা পারলো একটার পর একটা ছুঁড়ে মারতে লাগলো। তারপর হঠাৎ হাঁটু ভেঙে ব'সে পড়লো মেঝেতে, বুকের উপর দুই হাত জড়ো ক'রে কেঁদে উঠলো অসহায়ের মতো, 'আমাকে ক্ষমা করুন, ক্ষমা করুন আপনারা। আমার মাথার ঠিক নেই, আমার মনের ঠিক নেই। আমি জানি না এতোক্ষণ আমি কী বলতে কী বলেছি, কী করতে কী করেছি। আপনারা তো মানুষ। আপনাদেরও তো মায়া আছে, মমতা আছে, স্নেহ-ভালোবাসার জন আছে বাড়িতে। হয়তো আপনারা কারো বাবা, কারো ভাই, কারো স্বামী। শুধু একটু দরদ দিয়ে চেয়ে দেখুন আমার দিকে, আমার চেহারা দেখুন, আমার কাপড়-জামা দেখুন, শুধু এই দামি শাড়িটি আমি কোনোরকমে নিয়ে আসতে পেরেছি, আর-কিছু আনতে পারিনি, কতো কষ্টে, কতো দুঃখে সব ছেড়ে এইমাত্র এসে পৌঁছেছি এখানে, আর তারপরেও আপনারা এ-রকম অন্যায় সন্দেহে, এই রাত ক'রে বাড়ি ব'য়ে এ-রকম যন্ত্রণা দিতে এসেছেন। আপনাদের হাতে ধরছি, পায়ে ধরছি—' চোখের জলে কথার খেই হারিয়ে গেলো। আর তার সেই মর্মান্তিক ব্যাকুল কান্নার দিকে তাকিয়ে মুহূর্তে থেমে গেলো কলরব। বরং লোকগুলো লজ্জা পেয়ে, সংকুচিত হ'য়ে স'রে এলো রাস্তার দিকে।

সুলতান-সাহেব তাঁর সুদীর্ঘ বলিষ্ঠ কন্দর্পকান্তি দেহসুষমা নিয়ে এবার ধীরে-ধীরে বেরিয়ে এলেন ভিতরের ঘর থেকে। চুপচাপ সুলেখার সামনে এসে দাঁড়ালেন। খোলা দরজা দিয়ে তাকালেন রাস্তায়, তাকালেন যুদ্ধ-ক্লান্ত বিধ্বস্ত ঘরের দিকে, ঘরের মধ্যে চুপচাপ ছবির মতো দাঁড়িয়ে-থাকা কয়েকটি বিপর্যস্ত মানুষের দিকে। তিনি কাজি সুলতান আমেদ, নবাব-বাড়ির শেষ প্রদীপ, একটি জেলার সর্বময় প্রভু, তিনি কি পারেন এই সময়ে শোবার ঘরে লুকিয়ে থেকে আত্মগোপন করতে? সুলেখাকে সদরে পাঠিয়ে অন্দরে ব'সে প্রাণ বাঁচাতে? তাঁর পৌরুষ তাঁকে ধিক্কার দেবে না? বিবেককে তিনি কী দিয়ে প্রবোধ মানাবেন?

সুলেখা মুখ ঢেকে ব'সে আছে দু-হাতে। আঙুলের ফাঁকে অজস্র ধারে গড়িয়ে পড়ছে তার চোখের জল। কান্নার দমকে ফুলে-ফুলে উঠছে শরীরটা। পিঠটা বেঁকে-বেঁকে যাচ্ছে ধনুকের মতো। একটা কবিতা মনে পড়লো। ভেনাসের জন্ম। সমুদ্র থেকে জন্ম নিচ্ছে ভেনাস। পদ্মের বোঁটার মতো নমনীয় কমনীয় শরীর নিয়ে উঠে আসছে ঢেউয়ে-ঢেউয়ে। সমুদ্র সেদিন ভীষণ ছিলো, তার উত্তাল চীৎকারের শেষে, ভাঁটার টানে যখন সে শান্ত হ'য়ে এলো, ম্লান দিনের উন্মেষে স্তব্ধ হ'লো উতরোল, তখন ঠিক সুলেখার কান্নার মতো ক'রেই প্রথমে কয়েকটি রেখা কেঁপে-কেঁপে উঠেছিলো, সেই কন্যাও এইরকমই শুভ্র স্নিগ্ধ আর সিক্ত ছিলো। তারপর ধীরে-ধীরে উন্মোচিত হ'লো। সুলেখার অতল গহন কুমারী-হৃদয়ের মতোই উন্মোচিত হ'লো তার দেহলতা।

এই মুহূর্তে সুলেখার দিকে তাকিয়ে সেই ছবিটাই তাঁর মনে পড়লো বারে-বারে। এই একই ছবি তিনি তন্ময় হ'য়ে ভাবতে লাগলেন। লোভ। জীবনের উপর লোভ। বাঁচবার জন্য লোভ। এই চোখের জলে ভেসে-যাওয়া মেয়েটিকে ভালোবাসার লোভ। সুলেখার ঘন চুলে-ভরা নিচু-

করা কালো মাথাটির আনত ভঙ্গির দিকে তাকিয়ে, সরু শাদা কুমারী-সিঁথির দিকে তাকিয়ে, প্রাণের উপর ভীষণ মমতা হ'লো তাঁর। পা আটকে গেলো, গলা বন্ধ হ'য়ে এলো। আশ্চর্য! এই মেয়েই কি একদিন লাথি মেরেছিলো তাঁর মুখে! এই মেয়েই কি একদিন প্রত্যেক মুহূর্তে আজকের এই মুহূর্তটিরই স্বপ্ন দেখছিলো নবাববাড়ির আসান মঞ্জিলের নতুন হল-ঘরে ব'সে? রাত্রিবেলার পাঁচশো মোমের নরম আলোয় এই মেয়েকেই কি তিনি তিন মাস ধ'রে প্রত্যহ প্রত্যক্ষ করেছেন?

'স্থলেখা!' হাহাকার ক'রে উঠলো স্থলতানের গলা।

চকিতে মুখ তুললো স্থলেখা, তারপরেই এক ঝাপটায় উঠে দাঁড়ালো, 'তুমি! তুমি কেন উঠে এসেছো? তুমি অসুস্থ, তুমি রুগ্ন, তুমি যাও, ঘরে যাও।' তুই হাতের সমস্ত শক্তিতে ঠেলে দিলো তাঁকে ভিতরের দিকে।

'ইনি কে?' প্রশ্নটি তীরের মতো ছুটে এলো রাস্তা থেকে।

দাদামশায় যুক্তকর হলেন, 'আমার— আমার আত্মীয়।'

'আমি কাজি স্থলতান আমেদ।'

গির্জার ঘণ্টার মতো স্থলতানের গম্ভীর গলা পরিচয় ঘোষণা করলো নিজের। মন থেকে সমস্ত মোহ তিনি ঝেড়ে ফেললেন আজ। এই পবিত্র দিনে, জীবনের পরম শুভ মুহূর্তে, যে-মুহূর্তে স্থলেখা তাঁকে ভালোবেসেছে সে-মুহূর্তে কেমন ক'রে তিনি মিথ্যার আশ্রয় নিতে পারেন? অসম্ভব। অসম্ভব মনে হ'লো তাঁর কাছে।

'এ কী! এ কী করলে তুমি?'

'শান্ত হও।' স্থলেখার মাথায় হাত রাখলেন স্থলতান-সাহেব। 'আমি মুসলমান।' পরিষ্কার নিষ্কম্প গলায় আবার তিনি উচ্চারণ করলেন।

চীৎকার ক'রে উঠলো স্থলেখা, 'না, না, না! মিথ্যে কথা! মিথ্যে

কথা ! ইনি আমার স্বামী। আমার স্বামী !' দুটি ব্যাকুল হাতের গাঢ় আলিঙ্গনে সে জড়িয়ে ধরলো সুলতানকে।

গোধূলিবেলার রঙিন আলোর মতো নরম একটি সুন্দর হাসি ছড়িয়ে পড়লো সুলতান-সাহেবের মুখে। এটুকুই বাকি ছিলো। জানতেন না, পেয়ে জানলেন। বুকটা ভ'রে গেলো। এই তো, এই তো তিনি চেয়েছিলেন, এই তো পেলেন। খোদা তাঁকে চাওয়ার অনেক, অনেক বেশি তো দিয়ে দিলেন আজ। শূন্য মুঠি উপচে গেলো। তবে ? তবে কেন আর বেঁচে থাকা। এই অসম্ভব ক্লান্তি নিয়ে, অখ্যাতির বোঝা ব'য়ে কিসের আশায় তবে ব'সে থাকা ? মনটা কেমন এলোমেলো হ'য়ে গেলো।

'আপনারা — আপনারা আমাকে যা খুশি তাই করুন। যদিও আমি নিরস্ত্র নই, কিন্তু অস্ত্র আমি আর স্পর্শ করবো না।' পকেট থেকে ছোট্টো রিভলভারটি বার ক'রে আবেগবশত ঝোঁকের মাথায় কোথায় তিনি অন্ধকারে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন।

'সুলতান !'

'কাজি সুলতান আমেদ।'

'আমেদ-সাহেব !'

'এই, এই সেই শয়তান।'

'মারো শালাকে—'

'মেরে ফেলো, কেটে ফেলো, জলদি, এখুনি পুলিশের গাড়ি এসে যাবে—'

গলা থেকে গলায় চাপা-চাপা আওয়াজ শিলাবর্ষণের মতো টুপটুপ ছড়িয়ে পড়তে লাগলো।

একটা ঝলক। চমকে উঠলেন সুলতান-সাহেব। মৃত্যুর সীমানায়

এসে জীবনের আকাজ্ক্ষায় অধীর হ'য়ে সংবিৎ ফিরে এলো তাঁর। 'বাঁচাও, আমাকে বাঁচাও,' সভয়ে আর্তনাদ ক'রে উঠলেন। ডুবে যেতে-যেতে সুলেখার দিকে হাত দুটো বাড়িয়ে দিলেন, 'সুলেখা, তুমি— তুমি—'

চকিত হরিণের ক্ষিপ্রগতিতে কোথা থেকে লাফিয়ে উঠে এলো শিখ ড্রাইভার— কোমরের কৃপাণ বিদ্যুতের মতো ঝলক দিলো একবার— তারপর সব নিস্তব্ধ।

দেখতে না-দেখতে কে যে কোথা দিয়ে অক্টোপাসের দাঁড়ার মতো কিলবিলে সহস্র বাহু হ'য়ে ছিনিয়ে নিয়ে গেলো অতো বড়ো মানুষটাকে বোঝাই গেলো না। চলন্ত ট্যাক্সির জানালা দিয়ে একটি ক্ষীণ আর্তস্বর ভেসে গেলো বাতাসে। আটাশ বছরের সুস্থ সবল খানিকটা টাটকা রক্ত ছিটিয়ে রইলো বারান্দার শানে, শাদা-চুনকাম-করা দেয়ালে, আর সুলেখার মাথার কালো চুলে। দাদামশায় পাঁজাকোলা ক'রে অচৈতন্য নাতনিকে বারান্দা থেকে ঘরে তুলে এনে দরজায় ছিটকিনি বন্ধ ক'রে দিলেন।